প্রথম প্রকাশ : পয়লা বৈশাখ, ১৩৬৭
এপ্রিল, ১৯৬০

প্রকাশিকা : রেবা গঙ্গোপাধ্যায়
তিন সঙ্গী
৫৭ সি, কলেজ স্ট্রীট.
কলকাতা-৭৩

মুদ্রক : শ্রীমতি কৃষ্ণা রায়
তারা মুদ্রণ
১৫০।এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলকাতা—৬

প্রচ্ছদ : প্রবীব সেন

প্রেমচন্দ কে ও কী—এ কথা এখন বাঙালী পাঠককে বলতে যাওয়া বাতুলতা। যে সামান্য কজন লেখকের নাম বাঙালী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে, বই কিনে সংগ্রহ করে নিজেকে ধন্য মনে করে—প্রেমচন্দ তাঁদেরই একজন। আমরাও প্রকাশক হিসেবে তাঁর এই গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করছি।

এই বইয়ের নাম হতে পারতো—ভিন্ন প্রেমচন্দ। কেননা, এখানে যে-কটি গল্প এবং ছোট উপন্যাস সংকলিত হয়েছে তার মূল রস এবং স্বাদের সঙ্গে বাঙালী পাঠক সম্পূর্ণ অপরিচিত। এই লেখাগুলি ইতিপূর্বে অনূদিত হয়ে কখনো গ্রন্থভুক্ত হয়নি বলে নয়, যে সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং মানবমনের রহস্যের উপর ভিত্তি করে আমাদের বেঁচে থাকা, উৎসাহী হওয়া, স্খলন-পতন, মোহমুক্ত হওয়া, জীবন সম্পর্কে বাস্তব দিব্যজ্ঞান লাভ করা, জটিলতা, ক্ষুদ্র স্বার্থবোধ, আবার নিগূঢ় দ্বন্দ্বের বিস্তার—এ গ্রন্থের পাতায় পাতায় তাইই লিপিবদ্ধ। শ্রেণীসংগ্রামের কথাকার—এই আরোপিত পরিচিতির বাইরেও তিনি যে আসলে কতো বড়ো সূক্ষ্ম রসের কারবারী, এই গ্রন্থ তারই প্রমাণ। "দুই সখী" এই ছোট উপন্যাস ছাড়াও এতে সংকলিত ছোট বড়ো মিলিয়ে আরো সাতটি গল্প—যা পড়ে যে কোনো পাঠক সহজেই আবিষ্কার করবেন আরেক প্রেমচন্দকে। ভিন্ন প্রেমচন্দকে।

ইতিপূর্বে যে কটি গ্রন্থ প্রেমচন্দের বিভিন্ন রচনা সহ বঙ্গভাষায় অনূদিত হয়েছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুধাবন করেই আমরা এই গ্রন্থে এমন সব লেখা অনুবাদ করে পাঠকদের উপহার দিচ্ছি যা নতুন এবং অভিনব। এই গ্রন্থের অনুবাদক সুবিমল বসাক। মৌলিক রচনা ছাড়াও একজন সার্থক অনুবাদক হিসেবেও তিনি আজ সুপরিচিত। মূল রচনা থেকে সরাসরি অনুবাদের জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

এ গ্রন্থ বাঙালী পাঠকের কাছে আদরণীয় হলে প্রেমচন্দ সম্পর্কে আমরা আমাদের কিছুটা দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করতে পেরেছি, মনে করবো।

দুই সখী

লক্ষ্ণৌ

১-৭-২৫

প্রিয়,

এখানে আসার পর থেকে তোমার স্মৃতি বারবার আঘাত হানছে। আহা, তুমি যদি দিন কয়েকের জন্য এখানে আসতে, তাহলে কি আনন্দই না হতো। বিনোদের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিতাম। আসা কি সম্ভব নয়? তোমার মা-বাবা কি এতটুকু স্বাধীনতা দেবেন না? আমার আশ্চর্য বোধ হয়, এই শৃঙ্খলিত অবস্থায় তুমি থাকো কি করে! আমি হলে এভাবে ঘণ্টাখানিকের বেশীও থাকতে পারতাম না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার বাবা প্রাচীনপন্থী নন। উনি নবীন আদর্শের পূজারী, তাঁর কাছে নারীজীবন স্বর্গসমান। নইলে আমার যে কি হতো!

বিনোদ সবে ইংল্যাণ্ড থেকে ডি. ফিল. করে ফিরেছে। জীবনযাত্রা শুরু করার আগে একবার পৃথিবী ভ্রমণ করার ইচ্ছে। য়ুরোপের অধিকাংশ দেশ তার দেখা। এখন আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং এশিয়া ভ্রমণ ছাড়া সে কিছুতেই সুস্থির থাকতে পারছে না। মধ্য-এশিয়া এবং চীন—এই দুটি মহাদেশ সে বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করতে চায়। য়ুরোপীয়ান যাত্রীরা যে-সব বিষয়ে মীমাংসা করতে পারে না, সে-সব বিষয়ে আলোকপাত করাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য। সত্যি বলতে কি চন্দ্রা, এমন সাহসী, এমন নির্ভীক, এমন আদর্শবাদী পুরুষ আমি কখনও দেখি নি। তার কথা শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে পড়ি। এমন কোন বিষয় নেই যে সম্পর্কে তার পরিপূর্ণ জ্ঞান নেই, যার আলোচনা সে করতে পারে না; শুধু যে বইয়ের আলোচনা তা নয়, বরং তার আলোচনায় মৌলিকত্ব এবং নবীনত্ব থাকে। স্বাধীনতার ব্যাপারে বলা চলে, সে অনন্য উপাসক। এমন পুরুষের ঘরণী হয়ে কোন্ সে রমণী আছে—যে নিজের সৌভাগ্যে গর্ববোধ না করে। বোন, তোমায় কি করে বোঝাই, সকালে তাকে আমাদের বাংলোয় আসতে দেখে আমার হৃদয়ের যে কি অবস্থা হয় আমার সম্পূর্ণ হৃদয় তাকে উৎসর্গ করার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। বস্তুতঃ সে আমার আত্মায় মিশে গেছে। আপন পুরুষ সম্পর্কে মনে মনে যে কল্পনা করেছিলাম, তার সঙ্গে এবং এর সঙ্গে সামান্যতম প্রভেদ নেই। তাইতো রাতদিন আমার কেবলি

ভয় হয়, পাছে আমার মাঝে কোন ত্রুটি সে দেখে। যে-সব বিষয়ে তার রুচি, সেই সব বিষয় নিয়ে আমি মাঝরাত ওব্দি বসে বসে পড়াশুনা করি। এমন পরিশ্রম আমি আগে কখনও করিনি। চিরুণি-আয়নার প্রতি আমার কখনও তেমন টান ছিল না, সেণ্ট-আতর আমি কখনও এত আগ্রহে কাছে টেনে নিই নি। এত সব করেও যদি আমি তার হৃদয় জয় করতে না পারি, তাহলে বোন, আমার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে ; আমার হৃদয় ভেঙ্গে যাবে। এবং এই সংসার আমার কাছে শূন্য হয়ে দাঁড়াবে।

মাঝে মাঝে প্রেমের সঙ্গে ঈর্ষার ভাবনাও মনে জেগে ওঠে। বিনোদকে আমাদের বাংলোয় আসতে দেখে, পাশের বাড়ীর মেয়ে কুসুম বারান্দায় এসে দাঁড়ায়, তখন আমার ইচ্ছে করে তার চোখ দুটো যেন অন্ধ হয়ে যায়। গতকাল একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেছে। বিনোদ ওকে দেখে মাথার হ্যাট তুলে দিয়ে মৃদু হাসে। ঐ অসভ্য মেয়েটাও প্রতিবাদন জানায়। ঈশ্বর আমায় যাবতীয় বিপত্তি দিক, কিন্তু মিথ্যাভিমান যেন না দেন। শাঁকচুন্নির মত চেহারা, অথচ নিজেকে না জানি কি অপ্সরা-সুন্দরী মনে করে। শুনেছি কবিতা টবিতা লিখে থাকে, কয়েকটা পত্রিকায়ও নাকি কবিতা ছাপা হয়েছে। ফলে, ধরাকে সরা জ্ঞান করে। সত্যি বলছি, কিছুক্ষণের জন্য বিনোদের ওপর শ্রদ্ধা থাকে না। ইচ্ছে করছিল, গিয়ে কুসুমের মুখটা খামচে দিয়ে আসি। ভাগ্য বলতে হবে, দুজনের মধ্যে কোন কথাবার্তা হয় নি, কিন্তু বিনোদ ঘরে এসে বসার পর আধ ঘণ্টা অব্দি তার সঙ্গে কোন কথা বলতে পারি নি—তার কথায় সেই যাদু নেই, বলার ভঙ্গিমায় সেই রস নেই। তারপর থেকে আমার হৃদয়ের ব্যগ্রতা এখনও শান্ত হয় নি। সারা রাত আমাব চোখে ঘুম আসে নি, বার বার সেই দৃশ্য চোখের ওপর নাচানাচি করেছে। কুসুমকে অপ্রস্তুতে ফেলার জন্য মনে মনে কতই না পরিকল্পনা এঁটেছি। চন্দ্রা, জানা ছিল না আমার মন এতখানি দুর্বল। বিনোদ আমায় ওঁচা ও হাল্কা টাইপ মনে করে—এই ভয় যদি না থাকতো, তাহলে আমি স্পষ্ট আমার মনোভাবনা তাকে ব্যক্ত করতাম। আমি সম্পূর্ণভাবে তার হয়ে তাকেও সম্পূর্ণভাবে পেতে চাই। আমার স্থির বিশ্বাস, বিশ্বের সুন্দরতম রূপবান যুবক যদি আমার সামনে এসে দাঁড়ায়, তবুও আমি চোখ তুলে তার দিকে চাইবো না। বিনোদের মনে আমার প্রতি এ ধরনের ভাবনা নেই কেন, বলতে পারো ?

চন্দ্রা, প্রিয় বোন, অন্ততঃ এক সপ্তাহের জন্য চলে এসো। তোমাকে দেখার জন্য মন একেবারে অধীর হয়ে উঠেছে। এসময় তোমার পরামর্শ এবং সহানুভূতির বড় প্রয়োজন। এটা আমার জীবনের সবচেয়ে সঙ্কটময় কাল। হয়তো, এই দশ-

বারো দিনেই আমি পরশপাথর হয়ে পড়বো, নয় মাটিতে মিশে যাবো। এই যাঃ, সাতটা বেজে গেছে, এখনও চুল বাঁধা হয়নি। বিনোদের আসার সময় হয়েছে এখন বিদায় নিচ্ছি, বন্ধু। কে জানে আজ আবার হতভাগী কুসুম বারান্দায় না এসে দাঁড়ায়। এখন থেকে বুক কাঁপতে শুরু করেছে। গতকাল, মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছি, হয়তো সে সরলভাবে হেসে উঠেছিল। আজও যদি সেই দৃশ্য চোখে দেখি, তাহলে অত সহজে মনকে বোঝাতে পারবো না।

তোমার

পদ্মা

॥ ২ ॥

গোরক্ষপুর

৫-৭-২৫

প্রিয় পদ্মা,

প্রায় এক যুগ বাদে আমার কথা তোমার মনে পড়েছে। আমি ভেবেছিলাম, তুমি হয়তো ইহলোক ত্যাগ করেছ। এসব কিন্তু নিষ্ঠুরতার সাজা—যা কুসুম তোমায় দিচ্ছে। ১৩ এপ্রিলে আমাদের কলেজে ছুটি হয়েছে, আর তুমি চিঠি লিখেছো পয়লা জুলাই—প্রায় আড়াই মাস বাদে, তাও কুসুমের দয়ায়। কুসুমকে যতই তুমি দোষ দাও না কেন, আমি তাকে আশীর্বাদ করছি। সে যদি এই নিদারুণ দুঃখপ্রেরণাদাত্রীর মত তোমার মাঝে হাজির না হতো, তাহলে কি আমায় তুমি মনে করতে? যাক্‌গে, বিনোদের যে ছবিটা তুলেছো, তা সত্যি আকর্ষণীয় হয়েছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, যাতে শীগগির তার সঙ্গে ভগ্নিপতি সম্পর্কে আলাপ পরিচয় করতে পারি। কিন্তু সাবধান, সিভিল ম্যারেজ আবার করে বসো না। বিয়েটা যেন হিন্দু পদ্ধতি অনুসারেই হয়! তবে হ্যাঁ, তোমার অবশ্য এই অধিকার আছে অসংখ্য বোকা, বাজে লোককে ঢুকতে না দেয়া একজন সত্যিকার, বিদ্বান পণ্ডিতকে অবশ্যই ডেকো, কথায় কথায় তোমার কাছ থেকে টাকা বার করার জন্য নয়, বরং সে যেন লক্ষ্য রাখে—সমস্ত আয়োজন শাস্ত্রবিধি অনুসারে সুসম্পন্ন হয় কিনা।

আচ্ছা, এবার জানতে চাও এতদিন আমি কেন চুপ করে বসে আছি। এই আড়াই মাস ধরে আমাদের বংশে পাঁচ-পাঁচটা বিয়ে হলো। বরযাত্রীর আনাগোনা লেগেই ছিল। এমন দিন খুব কমই গেছে—এক'শ জনের কম অতিথির উপস্থিতি ছিল; তার ওপর বরযাত্রীরা এসে হাজির হত, তখন তার সংখ্যা পাঁচ-শ'য় গিয়ে

দাঁড়াতো। এই পাচটা মেয়েই কিন্তু আমার চেয়ে বয়সে ছোট; আমার কথা যদি শুনতো তাহলে এখনও তিন-চার বছর চুপ করে থাকতে হতো। কিন্তু তুমি তো জানো, আমার কথা শুনবেই বা কে। তারপর ভেবে দেখলাম মেয়ের বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে মা-বাবার তাড়াতাড়ি করাটা এমন কিছু অনুচিত নয়। জীবনের কতটুকুরই বা ঠিক-ঠিকানা আছে! মা-বাবা যদি অকালে মারা যায়, তাহলে কেই বা মেয়েকে বিয়ে করবে! ভাইদের ওপর ভরসা কতটুকু। বাবা যদি বেশ কিছু সম্পত্তি রেখে যায়, তাহলে হয়তো তেমন চিন্তা নেই। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বাবা তার ঋণের বোঝা রেখে গেছে, তখন বোন ঐ ভাইয়ের বোঝা-স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। অন্যান্য অনেক হিন্দু আচার নিয়মের মত এও এক আর্থিক সমস্যা এবং যতদিন না আমাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, এই আচার নিয়মও দূরীভূত হবে না।

এখন আমার বলিদানের সময় এসেছে। পনেরো দিন পর এই বাড়ীই আমার কাছে পরের বাড়ী হয়ে যাবে। তখন হয়তো দু-চার মাসের জন্য আসবো, অতিথির মত থাকতে হবে। আমার হবু বর বেনারসের বাসিন্দা, আইন নিয়ে পড়াশুনা করছে। ওর বাবা সেখানকার নামকরা উকিল। শুনেছি, বেশ কিছু জমিজমা আছে, বাড়ীঘর আছে, মর্যাদাসম্পন্ন লোক। আমি এ যাবৎ বরকে দেখিনি। বাবা অবশ্য আমাকে একবার জিজ্ঞেস করিয়েছিলেন, যদি চাই তাহলে বরকে আমন্ত্রণ জানাতে পারি। কিন্তু আমি বলে পাঠিয়েছি, তার কোন প্রয়োজন নেই। কোন এক সংসারে বধূ হয়ে যাবো; ভাগ্যের লিখন যা আছে, তা হবে। বাবা তো আর কারো মনের ভেতর যেতে পারবেন না, আমিও পারবো না। না হয় দু'একবার দেখা হতো, আলাপ সাক্ষাতও হতো, তাতে কি আমরা দুজনে দুজনকে জেনে নিতে পারতাম? এটা কোন রকমে সম্ভব নয়। বড়জোর আমরা দুজনে একে অপরের রঙ-রূপ-চেহারা দেখতাম। এর বেশী কি! এ ব্যাপারে আমার স্থির বিশ্বাস, বাবা আমার চেয়ে কম সংযত নন। আমার দুই ভগ্নিপতি অবশ্য দেখতে সুন্দর নয়, তা বলে কোন রমণী তাদের ঘৃণা করবে না। আমার দিদিরা তাদের সঙ্গে বেশ আনন্দেই জীবন কাটাচ্ছে। তাহলে, বাবা কেনই বা আমার প্রতি অবিচার করবেন? আমি জানি, আমাদের সমাজে কিছু সংখ্যক লোকেদের বিবাহিত জীবন সুখকর নয়, কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোন সমাজ আছে যাতে অসুখী পরিবার নেই? তাছাড়া সব তো আর পুরুষের দোষে হয় না, অধিকাংশ স্ত্রীরাই বিষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিয়েটাকে আমি সেবা ও ত্যাগের ব্রত হিসেবে মনে করি, এই ধারণা নিয়ে আমি তাকে অভিবাদন জানাই।

হ্যাঁ, আমি অবশ্য তোমাকে বিনোদবাবুর কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে চাই না, তবে ২০শে জুলাইয়ের মধ্যে দু দিনের জন্য যদি তুমি আসতে পারো, আমাকে বাঁচিয়ে তোলো। ব্রতের দিন যতই এগিয়ে আসছে, আমার মনে এক অজ্ঞাত আশঙ্কা জেগে উঠছে। তুমি নিজেই এখন রোগে জর্জরিত, আমার কতটুকু সেবা করবে—তবুও নিশ্চয়ই এসো। বুঝলে!

তোমার

চন্দ্রা

॥ ৩ ॥

মুসৌরী

৫-৮-২৫

প্রিয় চন্দ্রা,

অনেক কথা লেখার আছে, কিন্তু কোত্থেকে যে শুরু করি, বুঝে উঠতে পারছি না। প্রথমে, তোমার বিয়ের এই শুভ অবসরে যেতে পারিনি বলে ক্ষমা চাইছি। যাবো বলে আমি ঠিক করেছিলাম, তোমার স্বয়ম্বরে আমি কি না গিয়ে থাকতে পারি! কিন্তু তার ঠিক তিনদিন পূর্বে বিনোদ আত্মসমর্পণ করে আমায় এমন মুগ্ধ করে ফেলে যে, কোন কিছুর দিশে পাই না। আহা! প্রেমের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত সেই সব উষ্ণ আবেগময় এবং কাঁপা-কাঁপা শব্দ এখনও যেন আমার কানে বাজছে। আমি দাঁড়িয়েছিলাম আর বিনোদ আমার সামনে নতজানু হয়ে প্রেরণা, বিনয় ও আগ্রহের প্রতিমূর্তি হয়ে বসেছিল। এমন মুহূর্ত জীবনে একবারই আসে—শুধু একবার, কিন্তু তার মধুর স্মৃতি স্বর্গ সঙ্গীতের মত জীবনের তারে ব্যাপ্ত থাকে। সেই আনন্দের উপভোগ তুমি অনুভব করতে পারবে না। আমি সেই অবস্থায় কেঁদে ফেলেছিলাম। বলতে পারি না, মনে যে কত ভাবের উদয় হল। কিন্তু আমার চোখ থেকে জলের ধারা বইতে থাকে। এটাই হয়ে ওঠে আনন্দের চরমসীমা। আসলে, আমি কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। তিন চারদিন ধরে বিনোদকে যাতায়াতের পথে কুসুমের সঙ্গে কথা বলতে দেখি, কুসুম নিত্যনতুন গহনা-পোশাকে সেজে থাকত। তোমায় বলবো কি, একদিন বিনোদ কুসুমের একটি কবিতা পাঠ করে আমায় শোনায় এবং প্রতিটি শব্দের অর্থ নিয়ে মাথা ঘামায়। জানোই তো, আমি বড় স্পর্শকাতর; ভেবে দ্যাখো, সে যখন ঐ শাঁকচুন্নির পেছনে পাগল, আমার কি এমন গরজ পড়েছে তার কথা ভেবে মন খারাপ করি। পরদিন সকালে সে আসতে আমি বলে পাঠাই,

শরীর ভালো নেই। তৎসত্ত্বেও সে যখন আমার সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করে, নিরুপায় হয়ে আমায় বাইরের ঘরে ঢুকতে হলো। মনে মনে ঠিক করে ঢুকেছিলাম—স্পষ্ট বলে দেবো আপনি আর আসবেন না। আমি আপনার যোগ্য নই। আমি কবি নই, বিদুষী নই, সুভাষিনী নই—একটা গোটা স্পীচ মনে ঠেলে আসছিল, কিন্তু ঘরে ঢুকেই বিনোদের সতৃষ্ণ চোখ দেখে, প্রবল উৎকণ্ঠায় কম্পিত ঠোঁট—সেই আবেগের ছবি আমি আঁকতে পারবো না। বিনোদ আমার বসার সুযোগটুকুও দেয় না। আমার সামনে নতজানু হয়ে মেঝের ওপর বসে পড়ে, তার আতুর উন্মত্ত শব্দ আমার হৃদয়কে তরঙ্গিত করতে থাকে।

একটি সপ্তাহ প্রস্তুতিতে পার হয়। বাবা মা সকলেই খুশীতে আনন্দে ভরে ওঠে। সবচেয়ে খুশী হয়েছে কুসুম। হ্যাঁ, সেই কুসুম যার মুখ দেখতেও ঘৃণা হতো! এখন আমি বুঝতে পারছি, ওর প্রতি মিথ্যে সন্দেহ করে সাংঘাতিক অন্যায় করেছিলাম। তার হৃদয় সত্যি কপটতাহীন—তাতে ঈর্ষা নেই, তৃষ্ণাও নেই, সেবাই তার জীবনের মূল ধর্ম। জানি না, তাকে ছাড়া এই সাতদিন আমার কাটতো কি করে! আমি কিছুটা অসহায় হয়ে পড়েছিলাম। কুসুমের ওপর আমার যাবতীয় ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম। গয়না পছন্দ করা থেকে শুরু করে সাজানো, পোশাকের রঙ, শাড়ি ব্লাউজ সব ব্যাপারেই দেখেছি ওর বেশ প্রচ্ছন্ন রুচি ও পছন্দ আছে। আটদিনের দিন সে আমায় কনে সাজায়। বিশ্বাস করবে না, নিজের রূপ দেখে আমি একেবারে বিস্মিত বিমোহিত হয়ে পড়েছি। নিজেকে কখনও এত সুন্দর ভাবিনি। গর্বে আমার চোখে যেন নেশা ধরে গেছিল।

সেদিন গোধুলীতে বিনোদ আর আমি দুটো আলাদা জলধারার মত সঙ্গমে মিশে একাত্ম হয়ে পড়ি। মধুচন্দ্রিমার প্রস্তুতি আগে থেকেই ঠিক করা হয়েছিল। পরদিন সকালেই আমরা মুসৌরির পথে রওন দিই। কুসুম আমাদের তুলে দিতে স্টেশনে গিয়েছিল, বিদায় নেয়ার সময় বেচারা কেঁদে ফেলে। তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার ইচ্ছে ছিল, কেন জানি না, বিনোদ রাজি হল না।

মুসৌরি বাস্তবিক রমণীয় স্থান—এতে কোন সন্দেহ নেই। শ্যামবর্ণ মেঘমালা পাহাড়ে পাহাড়ে বিশ্রাম করছে, শীতল বাতাস আশা তরঙ্গের মত মন-প্রাণ বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। আমার কি মনে হচ্ছিল জানো, বিনোদের সঙ্গে যে-কোন নির্জন বনেও এমন সুখ পাওয়া যেত। তাকে পেয়ে এখন আমার কোন জিনিসের প্রতি লালসা নেই। তুমি এই আনন্দময় জীবনের সম্ভবতঃ কল্পনাও করতে পারবে ন। সকাল হলেই প্রাতরাশ আসে, আমরা দুজনে সেরে নিই;

এদিকে গাড়ি প্রস্তুত, নটা বাজতে বাজতে বেড়াতে বেরিয়ে পড়ি। কোন ঝরনার ধারে গিয়ে বসি। জলধারার মধুর সঙ্গীত শুনি কিছুক্ষণ, কিংবা কোন উপলখণ্ডের ওপর গিয়ে দু'জনে পাশাপাশি বসি। আকাশে মেঘদলের ক্রীড়া দেখি। এগারোটা বাজতে বাজতে ফিরে আসি। রান্না তৈরি। খাবার খেয়ে নিই। তারপর আমি পিয়ানোয় গিয়ে বসি। বিনোদের সঙ্গীত-প্রীতি আছে। নিজেও খুব ভাল গান জানে। আমি যখন গাই, সে তখন তালে তালে মাথা নাড়ে। তৃতীয় প্রহরে আমরা ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে খেলতে বেরোই, নয়তো কোন খেলা দেখতে যাই। রাতের খাবার সেরে থিয়েটার দেখতে যাই, তারপর ফিরে এসে ঘুম। শাশুড়ীর বকুনি নেই, ননদের কানাকানি নেই, জায়েদের ঠেসমারা কথা নেই। তবুও এই সুখেও মাঝে মাঝে এক ধরনের আশঙ্কা জাগে—কি জানি, ফুলের মাঝে কোন কাঁটা লুকিয়ে নেই তো, আলোর পেছনে অন্ধকার! আমি বুঝতে পারি না, এমন শঙ্কা কেন জেগে ওঠে? ওমা, পাঁচটা বেজে গেছে, বিনোদ তৈরি, আজ টেনিস ম্যাচ দেখতে যাবো। আমিও তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিই। পরে আবার লিখবো।

হ্যাঁ, একটা কথা ভুলেই গিয়েছি। তোমার বিয়ের খবরাখবর জানিও। কর্তাটি কেমন? রঙ রূপ? শ্বশুরবাড়ি গিয়েছো, নাকি এখনও বাপের বাড়িতে? শ্বশুরবাড়ি গিয়ে থাকলে সেখানকার অভিজ্ঞতা নিশ্চিত লিখবে। তোমার সেখানে নিশ্চয়ই দারুন এক্সিবিশন হয়েছে। ঘর, কুটুম, পাড়াপ্রতিবেশী, বৌ-ঝিরা ঘোমটা তুলে তুলে তোমার মুখ দেখেছে, কেমন! বেশ পরীক্ষা হয়েছে কি বল! সব খুঁটিনাটি বিস্তারিত লিখবে। দেখি, কবে আবার সাক্ষাৎ ঘটে।

তোমার পদ্মা

॥ ৪ ॥

গোরক্ষপুর

১-৯-২৫

প্রিয় পদ্মা,

তোমার চিঠি পড়ে মনে অপূর্ব শান্তি পেলাম। তুমি আসতে পারনি দেখে, আমি বুঝেছি বিনোদবাবু তোমাকে হরণ করে নিয়ে গেছে, কিন্তু এটা জানা ছিল না, তুমি মুসৌরিতে হাজির হয়েছো। এমন আমোদ-প্রমোদে কি আর গরিব চন্দ্রার কথা তোমার মনে পড়বে! এখন বুঝতে পারছি, বিবাহের নতুন ও পুরনো আদর্শে কতটুকু পার্থক্য। তুমি নিজের পছন্দমতো বিয়ে করেছো, তাই সুখী। আমি লোকলজ্জার ভয়ে দাসী হয়ে আছি, ভাগ্যকে ধিক্কার দিচ্ছি।

আচ্ছা, এবার আমার ঘটনা শোনো। দান-যৌতুকের ব্যাপারে আমার কোন সম্পর্ক নেই। জানোই ত, বাবা উদারহৃদয় স্বভাবের। একেবারে হৃদয় উজার করে দিয়েছেন। কিন্তু, দোরে বরযাত্রী আসতেই আমার অগ্নিপরীক্ষা শুরু হয়। কি উৎকণ্ঠাই না বর-দর্শনের, অথচ দেখি কি করে! বংশের নাম যে কাটা যাবে। দোরে বরযাত্রী দাঁড়িয়ে। সবাই বরকে ঘিরে আছে। মনে মনে ভাবলাম—ছাদে উঠে দেখি। ছাদে উঠলাম, কিন্তু সেখান থেকে কিছুই দেখা গেল না। অথচ—এই অপরাধের জন্য মার কাছ থেকে বকুনি শুনতে হলো। আমার যেসব ব্যাপার তাঁদের ভালো লাগে না, তার সব দোষ আমার 'শিক্ষা'র মাথায় চাপিয়ে দেয়। বাবার যদিও আমার প্রতি সহানুভূতি আছে, কিন্তু তিনি কার-কার মুখ বন্ধ রাখবেন। বরানুগমন অনুষ্ঠান হয়ে গেল, তারপর সাতপাকের প্রস্তুতি হতে লাগলো। বরকর্তার তরফ থেকে গয়না আর কাপড়ের থালা এলো। বোন! গোটা বাড়ির স্ত্রী-পুরুষ সকলেই এমন হুমড়ি খেয়ে পড়ল, যেন এরা কখনও এমন জিনিস দেখেনি। কেউ বলে, হাঁসুলি আনেনি, কেউ হারের উল্লেখ করে কাঁদে। মা সত্যি সত্যি কাঁদতে শুরু করে যেন আমায় জলে ফেলে দিয়েছে। বরপক্ষদের খুব নিন্দে-মন্দ হতে থাকে। কিন্তু আমি গয়নাগাটি চোখ তুলেও দেখিনি। তবে বরের সম্পর্কে কেউ কোন কথা বললে, উৎকর্ণ হয়ে তা শুনতে থাকি। বোঝা গেল ছিপছিপে শরীর। গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ, চোখ বড় বড়, হাসিখুশী মেজাজের। এইসব শুনে দেখার উৎকণ্ঠা আরও প্রবল হয়ে ওঠে। সাতপাকের মুহূর্ত যতই এগিয়ে আসতে থাকে, আমার হৃদয় ততই ব্যগ্র হয়ে ওঠে। এখন পর্যন্ত যদিও তার সামান্য ঝলসানিও আমি দেখিনি. তবুও আমি তার প্রতি এক অভূতপূর্ব অনির্বচনীয় প্রেম অনুভব করছিলাম। এ-সময় যদি আমার কানে যেতো, তার শত্রুদের কিছু একটা হয়েছে, তাহলে আমি হয়তো উন্মাদ হয়ে যেতাম। এখন পর্যন্ত তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়নি, তাঁর কণ্ঠস্বরও আমি শুনিনি, তবুও আমার বিশ্বাস সংসারের সেরা রূপবান পুরুষও আমার মন-হৃদয় আকর্ষিত করতে পারত না। এখন সে-ই আমার সর্বস্ব।

মাঝরাতের পরে যজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। সামনে হোম-কুণ্ড, দু'ধারে লোকজন বসেছিলেন, দীপ-বাতি জ্বলছিল। কুলদেবতার মূর্তি রাখা ছিল। বেদ-মন্ত্র পাঠ চলছিল। সে সময় আমার মনে হল, প্রকৃতপক্ষে দেবতা সেখানে বিরাজ করছেন। অগ্নি, বায়ু, দীপ, নক্ষত্র সব ঐ সময় দেবত্বের জ্যোতিতে বিকীরিত হচ্ছিল। এই প্রথম আমি আধ্যাত্মিক বিকাশের পরিচয় পেলাম। অগ্নির সম্মুখে যখন আমি মাথা আনত করলাম, তা যে শুধু পুরনো সংস্কারবশতঃ তা নয়, বরং আমি অগ্নিদেবকে আমার সামনে মূর্তিমান, স্বর্গীয় আভায় তেজময় দেখতে পেলাম।

আমার শেষ আশা ছিল, পরদিন সকালে যখন স্বামীকে উপোস-ভঙ্গের মিষ্টিমুখ করার জন্য ডাকা হবে, সে-সময় দেখবো। তখন তো তার মাথায় টোপর, ফুলের ঝরা থাকবে না, বন্ধুদের সঙ্গে আমিও গিয়ে বসবো, মন ভরে তাকে দেখবো। তখন কি আর জানা ছিল, বিধাতা অন্য কুচক্র রচিত করেছে। সকালে দেখি, বরযাত্রীদের শামিয়ানা-তাঁবু তুলে ফেলা হচ্ছে। ব্যাপার কিছুই নয়। বরযাত্রীদের জলখাবারের জন্য যা পাঠানো হয়েছিল, তা পর্যাপ্ত ছিল না। হয়তো ঘি খারাপ ছিল। আমার বাবাকে তো তুমি জানই! কখনও কারও কাছে নত হননি, যখন যেখানে বাঘের দাপটে কাটিয়েছেন। বাবা বললেন—যাচ্ছে যখন, যেতে দাও। তাদের অনুরোধ করার প্রয়োজন নেই ; কন্যাপক্ষের ধর্ম বরযাত্রীদের সৎকার করা, কিন্তু সৎকারের অর্থ এই নয় যে, চোখ রাঙ্গিয়ে, ধমক দিয়ে কাজ আদায় করা। একি কোন অফিসারের ক্যাম্প? যদি সে তার ছেলের বিয়ে দিতে পারে, তাহলে আমিও আমার মেয়ের বিয়ে দিতে পারি!

বরযাত্রীরা ফিরে যায়, আমি আর স্বামীদর্শন করতে পারি না! গোটা শহরে হৈ-চৈ পড়ে যায়। বিরোধীদের উপহাস করার অভূতপূর্ব সুযোগ ঘটে। বাবা অনেক কিছুর আয়োজন করেছিলেন। সে-সবই নষ্ট হয়ে যায়। বাড়িতে যাকেই দেখি, আমার শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে নিন্দা-মন্দ করতে থাকে—গোঁয়ার, লোভী, বদমাশ। আমার অবশ্য একটুও খারাপ বোধ হয় না। কিন্তু স্বামীর বিরুদ্ধে আমি একটা শব্দও শুনতে চাই না। একদিন মা বললেন—ছেলেটাও যেন অবুঝ। দুধের বাচ্চা তো নয়! এদিকে আইন পড়ছে, গোঁফ-দাড়ি গজিয়েছে। তার তো উচিত ছিল বাবাকে বোঝানো—আপনারা এসব কি করছেন! কিন্তু সেও ভেজা বেড়ালের মত চুপ করে থাকে। শুনেই আমার রাগ ধরে ওঠে! অবশ্য, আমি কিছু বলি না, কিন্তু মা বুঝতে পেরেছেন এ-ব্যাপারে আমি তার সঙ্গে একমত নই। তোমাকেই আমি জিজ্ঞেস করি, যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল তাতে তার কি ভূমিকা? যদি সে বাবা এবং অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠদের কথা মান্য না করতো, তাহলে কি তাঁদের অপমান করা হতো না? সে-সময় সে তাই করেছে, যা করা উচিত। আমার কিন্তু বিশ্বাস, এই ঝামেলা কিছুটা শান্ত হলেই সে এখানে আসবে। এখন থেকেই আমি তার পথ চেয়ে আছি। ডাকপিওন যখন চিঠি আনে, আমার বুকের ভেতর কাঁপুনি জাগে—হয়তো তার চিঠি থাকতে পারে! মনে বারবার ইচ্ছে হয়, আমিই একটা চিঠি দিই ; কিন্তু লজ্জায়-সংকোচে আর এগোতে পারি না। হয়তো আমি লিখতেও পারবো না। মান নয়, কেবল সংকোচ জড়িয়ে আছে। তবে, যদি পাঁচ-দশ দিনে তার কোন চিঠি না আসে, কিংবা সে যদি নিজে না আসে, তাহলে এই

সংকোচ তখন ম্লান হয়ে দাঁড়াবে। তুমি কি তাকে একটা চিঠি লিখতে পার? তাহলে সবটা একটা খেলা হয়ে দাঁড়াবে। আমার এই সামান্য উপকারটুকু করতে পারো না? ঈশ্বরের দিব্যি, সেই চিঠিতে কখনও ভুলেও লিখবে না যে, চন্দ্রার প্রেরণায় পাঠালে। তোমার তরফ থেকে আশঙ্কা করে যে ভুল করছি, তার জন্য ক্ষমা চাইছি—সত্যি আমি তোমার প্রতি অন্যায় করেছি। কবে আর আমি বুদ্ধিমতী ছিলাম?

তোমার চন্দ্রা

॥ ৫ ॥

মুসৌরী

২০-৯-২৫

প্রিয় চন্দ্রা,

তোমার চিঠি পাবার পরদিনই আমি কাশীতে চিঠি দিয়েছি। তার উত্তরও পেয়েছি। সম্ভবতঃ বাবা তোমায় চিঠি দিয়ে থাকবেন। জানোইত, বাবা কিছুটা প্রাচীন ধারণার লোক। আমার সঙ্গে একদিনও তার সঙ্গে বনিবনা হতো না। তোমার সঙ্গে হবে। আমার স্বামী যদি আমার সঙ্গে এ ধরনের ব্যবহার করতো—অকারণে যদি আমার ওপর রাগ করতো—তাহলে আমি আজীবন তার মুখদর্শন করতাম না। যদি বা কখনও আসতো, কুকুরের মত তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতাম। পুরুষের ওপর সবচেয়ে বেশী অধিকার তার স্ত্রীর। বাবা-মাকে খুশী করার জন্য সে স্ত্রীকে তিরস্কার করতে পারে না। তোমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ভয়ানক ঘৃণ্য ব্যবহার করেছে। প্রাচীন ধারণাবাহী লোকেদের অদ্ভুত হৃদয়, তারা এসব ব্যাপার অবলীলায় সহ্য করে। এখন বুঝতেই পারছো সেই প্রথার কুফল, অথচ তার প্রশংসা করতে তোমার মুখ আর ক্লান্ত হয় না। ঐ দেয়াল এখন ধসে গেছে, মেরামতি করে আর কাজ চলবে না। এখন সে স্থানে নতুন করে দেয়াল গাঁথার প্রয়োজন।

এবার আমার কয়েকটা কথা শোন। আমার এখন সন্দেহ হচ্ছে, বিনোদ আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। তার আর্থিক অবস্থা, আমি যা মনে করেছিলাম, তেমন নয়। শুধু আমায় প্রতারণা করার জন্য সে যাবতীয় মিথ্যাচরণ করেছিল। গাড়ী কারো কাছ থেকে চেয়ে এনেছিল, বাংলোর ভাড়া এখনও শোধ করেনি, ফার্ণিচার ভাড়া করা। অবশ্য এটা ঠিক, সে আমায় প্রত্যক্ষভাবে প্রতারণা করেনি। কখনও নিজের ধন-সম্পত্তি নিয়ে বড় বড় কথা বলেনি, কিন্তু এমন চাল-চলন,

আচার-ব্যবহার যাতে অন্যদের অনুমান হয় সে বিরাট ধনী লোক—এটা এক ধরনের প্রতারণা-ই বটে। এই মিথ্যাচার এইজন্য গড়ে তুলেছে যাতে কোন শিকার ধরা পড়ে। এখন লক্ষ্য করছি, বিনোদ আমার কাছে তার প্রকৃত অবস্থা লুকোবার জন্য চেষ্টা করে। তার নিজের চিঠি আমায় দেখতে দেয় না, কেউ সাক্ষাৎ করতে এলে সে চমকে ওঠে এবং অস্বাভাবিক গলায় বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করে—কে? তুমি তো জানো, আমি টাকার কাঙাল নই। আমি শুধু বিশুদ্ধ হৃদয় চাই। যার মাঝে পুরুষার্থ আছে, প্রতিভা আছে, সে আজ কিংবা কাল নিশ্চিত ধনী হবে। এ ধরনের মিথ্যাচারকে আমি ঘৃণা করি। বিনোদ যদি তার অসুবিধেগুলি আমায় মুখ ফুটে বলে, তাহলে আমি সহানুভূতি দেখাবো, এবং সে-সব অসুবিধে দূর করার সাহায্য করবো। এভাবে সে যদি আমার কাছে লুকোয়, তাহলে সহানুভূতি বা সহযোগিতা কিছুই করা যাবে না, বরং আমার মনে অবিশ্বাস, দ্বেষ এবং ক্ষোভ সৃষ্টি করবে। এই চিন্তাই আমাকে ভয়ানক পীড়িত ও কাতর করে তুলেছে। যদি সে নিজের অবস্থা স্পষ্ট বলে দিত, তাহলে কি আমি মুসৌরিতে আসতাম? লক্ষ্ণৌয়ে এমন কিছু গরম পড়ে না যাতে মানুষ পাগল হয়ে যাবে। হাজার টাকা জলে ফেলার কি দরকার ছিল? সবচেয়ে কঠিন সমস্যা দাঁড়িয়েছে জীবিকার প্রশ্ন। এরি মধ্যে আমি বেশ কয়েকটা আবেদন-পত্র স্কুলে পাঠিয়েছি। এখন উত্তরের প্রতীক্ষায় আছি। হয়তো এ মাসের শেষাশেষি কোথাও জুটে যেতে পারে। প্রথম প্রথম তিন চার শো টাকা পাওয়া যাবে। বুঝতে পারছি না, কিভাবে চলবে। বাবা আমার কলেজ খরচ দিতেন দেড়শ টাকা। আট-দশ মাসেও যদি কোথাও না জোটে, তাহলে যে কি হবে—এই দুশ্চিন্তা আরও পীড়িত করে তুলেছে। অসুবিধেটা কি জানো, বিনোদ আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছে। যদি আমরা দুজন বসে পরামর্শ করি, তাহলে যাবতীয় জট খুলে যেত। মনে হয়, সে আমাকে এ-ব্যাপারে যোগ্য মনে করে না। হয়তো তার ধারণা, আমি একটা ডলপুতুল, যাকে দফায়-দফায় গয়না, শাড়ি, সেন্ট—এসব দিয়ে সাজানোই যথেষ্ট। থিয়েটারে নতুন কোন 'শো' হবে, ছুটে এসে আমায় খবর দেয়। কোথাও কোন জলসা অনুষ্ঠিত হলে, বা কোন খেলার আয়োজন হলে, বা কোথাও বেড়াতে যাবার হলে—তার খবর আমায় অবিলম্বে জানান দেয়। খুশিতে ভরপুর, যেন আমি রাতদিন বিনোদন, ক্রীড়া এবং বিলাসে মগ্ন থাকতে চাই, যেন আমার হৃদয়ে কোন সিরিয়াস অংশই নেই! এ আমার অপমান, সাংঘাতিক অপমান—যা আমি এখন আর সহ্য করতে পারি না। আমি নিজস্ব পূর্ণ অধিকার নিয়েই সন্তুষ্ট হতে পারি।

আজ এইটুকু। পরে আবার জানাবো। তোমার ওখানকার খবরা-খবর সব

লিখো। আমার নিজের সম্পর্কে যত চিন্তা, তার চেয়ে তোমার চিন্তা কোন অংশে কম নয়। এবার দেখতে হবে, আমাদের বুদ্ধির সমাধান কোথায় হয়। তুমি তোমার স্বদেশী···পাঁচ হাজার বছরের পুরনো জর্জর নৌকোয় বসে আছো, আমি আছি নতুন দ্রুতগতিসম্পন্ন মোটর-বোটে। সুযোগ, বিজ্ঞান এবং উদ্যোগ আমার পক্ষে। যদি বা কোন দৈব-বিপত্তি ঘটে, তাহলে আমি এই মোটর-বোটেই ডুবে মরবো। বছরে কতজনই রেল-দুর্ঘটনায় মারা যায়, তা বলে কেউ আর গরুর গাড়ীতে দূর পাল্লায় যাতায়াত করে না। রেলের বিস্তার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবার শেষ করি।

তোমার পদ্মা

॥ ৬ ॥

গোরক্ষপুর

২৫-৯-২৫

প্রিয় পদ্মা,

তোমার চিঠি পেয়েছি, আজ জবাব দিতে বসেছি। একমাত্র তুমিই বড্ড সময় নাও। এ ব্যাপারে তোমার উচিত আমার কাছ থেকে উপদেশ নেওয়া। বিনোদবাবুর ওপর তুমি অহেতুক আক্ষেপ করছো। তুমি কি আগে থাকতে তার আর্থিক অবস্থার খোঁজ-খবর নাও নি? নাকি সুন্দর, রসিক, ভদ্র, বাক্-চতুর যুবককে দেখে মজে গেছিলে? এখন তোমারই দোষ। তুমি তোমার ব্যবহারে, কথা-বার্তায়, চালচলনে প্রমাণ করে দাও যে তোমার মাঝেও সিরিয়াসনেস আছে, তারপর দেখা যাক বিনোদবাবু কি করে তোমার কাছে লুকোয়। জানো বোন, এ তো মানুষের স্বভাব। সকলেই চায় লোকেরা তাকে সম্পন্ন মনে করুক। এই মিথ্যাচরণ শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে, এবং যে এ কাজে সফল হয়—তার জীবনকেই সফল বলে ধরা হয়। যে যুগে অর্থই হলো সর্বপ্রধান—মর্যাদা বলো, কীর্তি বলো, যশ বলো—এমন কি বিদ্যাও যখন অর্থ দিয়ে কেনা যায়, সে যুগে মিথ্যাচরণ করাটাই এক ধরনের প্রয়োজনীয় মনে হয়। আসলে অধিকার যোগ্যতার মুখাপেক্ষী। এ দুটোর তুলনা করা চলে ফুল ও ফলের সম্পর্কে। যোগ্যতায় ফুল ফোটে, অধিকারে ফল বেরোয়।

এই জ্ঞান-উপদেশের পর তোমায় আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমার স্বামীর নামে যে চিঠিখানি তুমি লিখেছিলে, তার ফলাফল খুব ভালই হয়েছে। ঠিক তার পাঁচদিন পরে স্বামীর কাছ থেকে একখানি চিঠি পাই। সত্যি বলছি বোন, সেই

যেন অন্ধের দৃষ্টি ফিরে পাওয়া। কখনও ঘরে গিয়ে শেকল তুলে দিই, আবার কখনও একতলায় নেমে আসি। সারা বাড়িতে হৈ-হৈ পড়ে যায়। তোমার কাছে চিঠি পেয়ে যে কি খুশী হয়েছি, তার অনুমান তুমি করতে পারো। আমার কাছে সেই চিঠি অবশ্য অতি সাধারণ, হতাশাই মনে হতো, কিন্তু আমার কাছে তা ছিল সঞ্জীবনী-মন্ত্র, আশার আলো। আমার প্রিয়তম বরযাত্রীদের গোয়ার্তুমি ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করেছিল, কিন্তু বয়স্কদের সামনে সে তো আর মুখ খুলতে পারে না। তাছাড়া বরযাত্রীদের যেমন আদর আপ্যায়ন করা উচিত, কন্যাপক্ষরা তেমন করেনি। শেষে লিখেছে—প্রিয়তমা, তোমাকে দেখার জন্য মন যে কি রকম উৎকণ্ঠীত আছে, লিখে প্রকাশ করতে পারি না। তোমার কম্পিত প্রতিচ্ছবি প্রত্যহ আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়, কিন্তু জানো ত, বংশমর্যাদা পালন করা আমার কর্তব্য। যতদিন না মা-বাবার সমর্থন পাই, তোমার কাছে যেতে পারব না। তোমার অভাবে আমার প্রাণ যদিও বা যায়, তবু বাবার ইচ্ছাকে আমি উপেক্ষা করতে পারি না। তবে হ্যাঁ, একটা কথা—আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি এবং তা ঠিক করে নিয়েছি—পৃথিবী ওলট-পালট হোক না কেন, কুসন্তান বলুক আর যাই বলুক না কেন, বাবার সব রাগ আমার মাথায় পড়ুক, বাড়ি ছাড়তে হোক না কেন, তবুও আমি দ্বিতীয়বার বিয়ে করবো না। তবে যতদূর আমি বুঝতে পেরেছি, ব্যাপারটা বেশীদূর গড়াবে না। এঁরা কয়েক দিনের মধ্যেই নরম হয়ে যাবেন, তখন আমি যাবো এবং আমার প্রাণেশ্বরকে বুকের মাঝে আঁকড়ে ধরে নিয়ে আসবো।

হ্যাঁ, আমি এখন সন্তুষ্ট, আমার আর কিছু চাই না। আমার প্রতি তার এত দরদ, এর বেশী সে আর কি করতে পারে। প্রিয়তম, তোমার চন্দ্রা সর্বদা তোমারই কাছে থাকবে, তোমার ইচ্ছাই তার কর্তব্য। যতদিন বেঁচে থাকবে, তোমার পবিত্র চরণে জড়িয়ে থাকবে। তাকে তুমি ভুলে যেও না।

বোন, চোখে জল ভরে উঠেছে, আর লিখতে পারছি না, তাড়াতাড়ি উত্তর দিও।

তোমার

চন্দ্রা

॥ ৭ ॥

দিল্লী

১৫-১২-২৫

প্রিয় বোন,

তোমার কাছে বার বার ক্ষমা চাইছি, পায়ে পড়ছি। আমার চিঠি না লেখার

কারণ আলস্য নয়, ঘোরাঘুরি-বেড়ানোও নয়। রোজই ভাবি, আজ লিখব, কিন্তু একটা-না-একটা কাজ এসে হাজির হতো কিংবা কোন কিছু ঘটনা ঘটতো, কিংবা কোন একটা বাধা এসে হাজির হতো—ফলে মন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতো। মুখ ঢেকে চুপচাপ বিছানায় পড়ে থাকতাম। তুমি যদি এখন আমায় দেখো, হয়তো চিনতেই পারবে না। মুসৌরি থেকে দিল্লী এসেছি এক মাস পেরিয়ে গেছে। এখানে বিনোদের একটা চাকরি জুটেছে, মাত্র তিনশ টাকা মাইনে। এই গোটা মাসটা বাজারের ছাই উড়িয়ে কেটে গেছে। বিনোদ অবশ্য আমাকে পুরোপুরি স্বাধীনতা দিয়েছে। আমার যা ইচ্ছে, আমি তাই করি—তাতে বিনোদের কোন সংস্রব নেই। সে যেন আমার অতিথি। সংসারের যাবতায় ভার আমার ঘাড়ে চাপিয়ে সে নিশ্চিন্ত। এমন নিশ্চিন্ত মানুষ আমি দেখিনি। ডিনারে উপস্থিত হবার কোন ভাবনাই নেই, ডাকলে পরে এসে হাজির হয়, নইলে বসেই থাকে। চাকর-বাকরদের সে কিছু বলবে না—এটা যেন প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে। তাদের ধমক দিতে হলে আমি, তাড়িয়ে দিতে হলেও আমি, তার এ ব্যাপারে কোন মাথাব্যথা নেই। আশ্চর্য। আমি চাই, সে যেন আমার ব্যবস্থার আলোচনা করুক, দোষ-ত্রুটি ধরুক। আমি চাই, মার্কেট থেকে কিছু কিনে আনলে সে আমায় বলুক আমি ঠকেছি নাকি লাভ করেছি, আমি চাই মাসের বাজেট করার সময় তার সঙ্গে আমার তর্ক-বচসা হোক, কিন্তু এসব আশা-কল্পনা আমার একটাও পূরণ হয় না। আমি বুঝতে পারি না, এভাবে কোন স্ত্রী ঘর-সংসারের গোছগাছের ব্যবস্থায় কতদূর সফল হতে পারে। বিনোদের এ রকম সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের ফলে আমার নিজস্ব প্রয়োজন পূরণের কোন পথ রাখেনি। আমার শখের জিনিস নিজে কিনে আনতে খুব খারাপ লাগে, অন্ততঃ আমার দ্বারা এ হয়ে ওঠে না। আমি জানি, আমি যদি নিজের জন্য কোন জিনিস আনি, সে রাগ করবে না। বরং সে খুব খুশীই হবে, কিন্তু আমার ইচ্ছে, আমার শখের প্রসাধনী সামগ্রী সে নিজে কিনে এনে আমাকে উপহার দিক। তার কাছ থেকে গ্রহণ করতে যে আনন্দ, তা নিজে কিনে আনায় পাওয়া সম্ভব নয়। বাবা এখনও মাসে মাসে একশ টাকা করে দিচ্ছেন, সে টাকা আমি নিজের প্রয়োজনমত খরচ করতে পারি। কিন্তু কেন জানি না, আমায় ভয় পাছে বিনোদ না আবার ভেবে বসে আমি ওর টাকা খরচ করছি। যে লোক কোনো কথায় অখুশী হয় না, সে কোনো কথায় খুশীও হতে পারে না। আসলে আমি বুঝতেই পারি না, সে কোন্ ব্যাপারে খুশী হবে, কোন ব্যাপারে অখুশী হবে। আমার অবস্থাটা কিছুটা ঐ ধরনের লোকের মত—রাস্তা না জেনে যে ইতস্ততঃ ঘুরে মরছে। তোমার মনে আছে চন্দ্রা, অঙ্কের প্রশ্নোত্তর করার পরে কি দারুণ ঔৎসুক্যে উত্তর

দেখতাম। আমাদের অঙ্কের উত্তর বইয়ের উত্তরের সঙ্গে যখন মিলে যেত, আমরা কী খুশীই না হতাম! পরিশ্রম সফল হয়েছে—এ বিশ্বাস মনে ঘটতো। যে অঙ্ক বইয়ে প্রশ্নোত্তর থাকতো না, সেই অঙ্ক কষতে আমাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ বা ইচ্ছে হতো না। ভাবতাম, পরিশ্রমটাই জলে যাবে। আমি এখন রোজ প্রশ্নের অঙ্ক কষে যাই, জানি না উত্তর ঠিক-ঠিক হলো, নাকি ভুল। ভেবে দেখো, আমার মনের অবস্থা এখন কেমন।

সপ্তাহখানিক আগে, লক্ষ্ণৌয়ের মিস রিগের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হল। উনি লেডি ডাক্তার, আমাদের বাড়িতে তাঁর যাতায়াত আছে। কারু মাথা ধরলে, অমনি মিস রিগকে ডাকা হত। বাবা যখন মেডিকেল কলেজের প্রফেসার ছিলেন, তখন মিস রিগকে পড়িয়েছিলেন। সেই উপকার আজও মনে রেখেছে। এখানে তাঁকে দেখে ডিনারের নিমন্ত্রণ না-করাটা অশিষ্টতার চূড়ান্ত হতো। মিস রিগ রাজী হন। সেদিন আমায় যে অসুবিধে ভোগ করতে হয়েছে, তা বর্ণনা করা যাবে না। আমি এর আগে কখনও ইংরেজদের সাথে টেবিলে ডিনার করিনি। তাদের ডিনার টেবিলে কি যে শিষ্টাচার, তা আমার বিন্দুমাত্র জানা নেই। ভেবেছিলাম, বিনোদ আমায় সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবে। সে বহু বছর ইংলণ্ডে ইংরেজদের সঙ্গে বাস করেছে। আমি তাকে মিস রিগের আসার খবর আগেই দিয়ে রাখি, কিন্তু সে যেন কথাগুলো শুনতে পায় না। যাই হোক, আমি তখন স্থির করি, তাকে কিছু আর জিজ্ঞেস করবো না, বড় জোর মিস রিগ উপহাস করবেন। করুক গে। নিজে ওপর বার বার রাগ ধরছিলো, কেন যে মিস রিগকে নিমন্ত্রণ করতে গেলাম! আশেপাশে বাংলোয় আমাদের মত কয়েকটা পরিবার থাকে। তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া যেত। কিন্তু সঙ্কোচ হলো, পাছে ওরা আমায় গ্রাম্য ভেবে বসে। নিজের এই অসহায় অবস্থায় চোখ থেকে জল গড়ালো। অবশেষে নিরাশ হয়ে নিজের বুদ্ধি অনুসারে কাজ করি পরদিন মিস রিগ এলেন। আমরা দুজনেও টেবিলে বসি। খাবার পরিবেশন করা হলো। লক্ষ্য করলাম, বিনোদ বার বার সঙ্কুচিত হয়ে উঠছে, মিস রিগ বার বার নাসিকা কুঞ্চিত করছেন—স্পষ্ট ধরা পড়ছিল শিষ্টাচারের মর্যাদা ভঙ্গ হয়েছে। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছিল। কোন রকমে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া গেল। তারপর আমি কান ধরেছি আর যদি কোন ইংরেজকে নিমন্ত্রণ করি। সেদিন থেকে লক্ষ্য করছি, বিনোদ আমার ওপর কিছুটা যেন রুষ্ট হয়েছে। হুঁ, আমিও তার সঙ্গে কোন কথা বলছি না। সে ভেবেছে আমি বুঝি তাকে উপহাসাস্পদ করে তুলেছি। আমার মনে হয় সে-ই আমাকে লজ্জায় ফেলেছে। সত্যি বলছি চন্দ্রা, ঘর-সংসারের এই সব

ঝামেলায় এখন কারো সঙ্গে কথা বলা—হাসির সুযোগটুকুও পাই না। এদিকে ক' মাস ধরে কোন বই পড়তে পারিনি। বিনোদের সেই বিনোদশীলতা কে জানে কোথায় হারিয়ে গেছে। এখন সে সিনেমা-থিয়েটারের নামোচ্চারণও করে না। যদি আমি যেতে চাই, অমনি সে তৈরি হয়ে যাবে। অথচ আমি চাই, তার কাছ থেকে প্রস্তাব আসুক, আমি শুধু অনুমোদন করবো। সম্ভবতঃ এখন সে পূর্বেকার অভ্যাস পাল্টাতে চাইছে। তার মুখে দেখতে পাই তপস্যার সংকল্প আঁকা। মনে হয়, গৃহ-পরিচালনার শক্তি সে সংগ্রহ করতে না পেরে যাবতীয় দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। মুসৌরীতে সে ছিল গৃহ-পরিচালক। দু-আড়াই মাসে পনেরো-শ টাকা খরচ করেছিল। কোত্থেকে যে টাকাটা জুটিয়েছিল, আমি আজও তা জানি না। কাছে হয়তো সামান্য কিছু টাকা আছে। হয়তো কোনো বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে নিয়েছিল। এখন তিনশ টাকার মাইনেয় থিয়েটার-সিনেমার কথা উল্লেখ করা যায় না। পঞ্চাশ টাকা বাড়িভাড়ায় বাদ যায়। এইসব ঝামেলায় আমিও বিরক্ত হয়ে উঠেছি। ইচ্ছে করে, বিনোদকে বলি, আমার দ্বারা এই ঝর্ঝরে গাড়ী আর টানা যাবে না। এদিকে উনি দুই-আড়াই ঘণ্টা য়ুনিভার্সিটির কাজ সেরে সারাদিন মনের সুখে টেনিস খেলে, উপন্যাস পড়ে, ঘুমিয়ে কাটায় অথচ আমি সকাল থেকে মাঝরাত অব্দি সংসারের ঘানি টেনে মরি। কয়েকবার ঝগড়া করতে ইচ্ছে হয়েছে, মনে মনে ভেবে ওর কাছেও গেছি, কিন্তু কি বলবো, ওর কাছে যেতেই আমার সমস্ত সংযম, সমস্ত গ্লানি, সমস্ত বিরক্তি উবে যায়। ওর বিকশিত মুখশ্রী, ওর অনুরক্ত চোখ-জোড়া, ওর কোমল কণ্ঠস্বর আমার ওপর যেন মোহিনী মায়া বিস্তার করে ফেলে। ওর একটা আলিঙ্গনে আমার সমস্ত বেদনা বিলীন হয়ে পড়ে। যদি সে এত রূপবান, এত মধুর ভাষা, এত সৌম্য না হত, তাহলে খুব ভালো হতো। আমি হয়তো সহজে ঝগড়া করতে পারতাম, আমার অসুবিধেগুলো জোর গলায় বলতে পারতাম। এমত অবস্থায় সে যেন আমাকে ভেড়া করে ফেলেছে। কিন্তু আমি এই মায়া নষ্ট করার জন্য সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছি। বলতে গেলে এক রকম আমি আত্ম-সম্মান খুইয়ে বসেছি। প্রতিটি কথায় কেন যে আমি অপ্রসন্নতার ভয় পাই। আমার মাঝে কেন এই ভাবনা হয় না—আমি যা করছি, ঠিক করছি। কেন আমি এতটা মুখাপেক্ষী হয়ে আছি। এই মনোবৃত্তিকে আমার জয় করতেই হবে, যাই হোক না কেন। এখন বিদায়। তোমার খবরাখবর জানিও, মন পড়ে রইল।

তোমার

পদ্মা

॥ ৮ ॥

কাশী

২৫-১২-২৫

প্রিয় পদ্মা,

তোমার চিঠি পড়ে দুঃখ হলো, হাসি পেল, কিছুটা রাগও হলো। আসলে তুমি কি যে চাও, তোমার নিজেরই জানা নেই। তুমি আদর্শ স্বামী পেয়েছো, মিছিমিছি আশঙ্কা করে মন অশান্ত করো না। তুমি স্বাধীনতা চাও, তাও তুমি পেয়েছো। দুজন প্রাণীর পক্ষে তিনশ টাকা কম নয়। তাছাড়া তোমার বাবাও একশ টাকা করে দিচ্ছেন। আর কি চাই। আমার ভয় হয়, তোমার মন কিছুটা বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে। তোমার প্রতি সহানুভূতির সামান্যতম শব্দও আমার কাছে অবশিষ্ট নেই।

১৫ তারিখে আমি কাশীতে এসে পড়েছি। আমার স্বামী নিজে আমাকে আনতে গিয়েছিল। বাড়ি থেকে আসার সময় প্রচণ্ড কেঁদেছি। আগে আমার ধারণা ছিল, মেয়েরা মিছিমিছি কান্নাকাটি করে। তাছাড়া মা-বাবা হারানোর ব্যথা আমার কাছে নতুন ব্যাপার নয়। গ্রীষ্মকালে, পুজোয় এবং বড়দিনের ছুটির পর ছ বছর ধরে এই হারানোর ব্যথা অনুভব করে আসছি। কখনও চোখে অশ্রু দেখা দেয়নি। বান্ধবীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের আনন্দ হতো। কিন্তু এবার যেন মনে হয়, কেউ বুঝি হৃদয় ধরে টান দিয়েছে! মার গলা জড়িয়ে এত কেঁদেছি যে, কিছুক্ষণ পরে মূর্চ্ছা গেছি। বাবার পায়ের ওপর পড়ে কান্নার ইচ্ছে মনে মনেই রয়ে গেছে। হায়, কান্নারও কি আনন্দ! বাবার পায়ের তলায় কান্নার জন্য আমি সে সময় প্রাণও বিসর্জন দিতে পারতাম। আমি তাঁকে কিছু করতে পারিনি, এটা ভেবেই কান্না পায়। আমাকে প্রতিপালন করতে বাবা কত কষ্ট সহ্য করেছেন। আমি ছিলাম জন্মরোগী। রোজ আমার জ্বর আসতো। মা আমায় সারারাত ধরে কোলে নিয়ে বসে থাকতেন। বাবার কাঁধে চেপে লম্ফ-ঝম্প করার কথা আজও মনে পড়ে। তিনি কখনও আমাকে ক্রুদ্ধ চোখে দেখেন নি। আমার মাথায় যন্ত্রণা হলে, তাঁর হাত ঘেমে উঠত। দশ বছর বয়স অব্দি এ রকম কেটেছে। ছ বছর দেহরাদুনে কাটিয়েছি। এখন তাঁকে সেবা করবার যোগ্যতা যেই অর্জন করেছি, তখন যেন ঝেড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। মাত্র আট মাস তাঁর চরণ সেবা করতে পেরেছি এবং এই আট মাসই আমার জীবনের মুক্তো। ঈশ্বরের কাছে আমার প্রার্থনা, আমি যেন পরজন্মে এই ক্রোড়েই জন্ম নিই, আবার যেন এই পিতৃস্নেহের অপার আনন্দ উপভোগ করতে পারি।

বিকেলে গাড়ী স্টেশন থেকে রওনা দেয়। আমি মেয়েদের কামরায় ছিলাম। আর সকলে পাশে অন্য কামরায় ছিল। সহসা স্বামীকে দেখার একটা প্রবল ইচ্ছে মনের মধ্যে জেগে ওঠে। সান্ত্বনা, সহানুভূতি এবং আশ্রয়ের জন্য হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কোন বন্দী দ্বীপান্তরে যাচ্ছে এমন মনে হতে থাকে আমার।

ঘণ্টাখানিক পরে গাড়ী একটা স্টেশনে থামে। পেছন দিকের জানালায় মুখ বাড়িয়ে আমি দেখছিলাম। হঠাৎ গাড়ীর দরজা খুলে কেউ একজন পা রাখে। কামরায় আমি ছাড়া অন্য কোন নারী ছিল না। চমকে পেছন ফিরে দেখি, একজন পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘোমটায় মুখ ঢেকে ফেলি, জিজ্ঞেস করি—আপনি কে? এটা মেয়েদের কামরা। আপনি পুরুষদের কামরায় যান।

ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে থাকে, সেই অবস্থায় বলে—আমি এই কামরায় বসবো। পুরুষদের কামরায় বড্ড ভিড়।

আমি সরোষে বলে উঠি—না, আপনি এ কামরায় বসতে পারবেন না।

'কেন? আমি বসবোই।'

'আপনাকে যেতে হবে। আপনি এক্ষুণি চলে যান, নইলে আমি শেকল ধরে টানবো।'

'ওরে বাব্বা, আমিও মানুষ, কোন জন্তু নই। এত জায়গা খালি পড়ে রয়েছে। আপনার ক্ষতি কিসের?'

গাড়ীর বাঁশী বেজে ওঠে। আমি আরও ঘাবড়ে গিয়ে বলি—'আপনি যাবেন, নাকি আমি শেকল টানবো?'

ভদ্রলোক হেসে ওঠে—ইস, আপনাকে ভয়ানক রাগী বলে মনে হচ্ছে একজন গরীব লোকের ওপর আপনার কি দয়া হয় না?

গাড়ী রওনা দেয়। রাগে-লজ্জায় আমার শরীর ঘেমে ওঠে। দ্রুত হাতে দরজা খুলে ফেলি, বলি—ঠিক আছে, আপনি তাহলে বসুন, আমি চলে যাচ্ছি।

সত্যি বলছি, সে সময় আমার মনে লেশমাত্র ভয় ছিল না। জানি, পড়ে গেলে নির্ঘাৎ মৃত্যু, কিন্তু একজন অজানা-অচেনা লোকের সঙ্গে একাকী বসে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াও শ্রেয়। সবে একটা পা এগিয়ে দিয়েছি, অমনি ভদ্রলোক আমার হাত কষে ধরে, তারপর ভেতরে টানতে টানতে এনে বলে—হুঁ, এতক্ষণে আমায় দ্বীপান্তরে পাঠাবার ব্যবস্থা প্রায় করে ফেলেছিলেন, আর কি! এখানে আর কেউ তো নেই, আপনি এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন? বসুন, একটু কথা বলুন, হাসুন। সামনের স্টেশনেই আমি নেবে পড়বো, ততক্ষণ আপনার কৃপা-দৃষ্টি থেকে

আমাকে বঞ্চিত করবেন না। আপনাকে দেখে হৃদয় আর ধরে রাখতে পারছি না। কেন যে মিছিমিছি একজন গরীবের মৃত্যুর জন্য দায়ী হবেন!

আমি এক টানে হাত ছাড়িয়ে নিই। সর্বশরীর কাঁপতে থাকে। চোখে অশ্রু ভরে ওঠে। আমার কাছে যদি তখন কোন ধারালো অস্ত্র থাকতো, তাহলে নিশ্চয় সেটা বার করে ফেলতাম, তারপর মারার বা মরার জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়তাম। কিন্তু, এমত অবস্থায় শুধু ঠোঁট কামড়ানো ছাড়া আর কি করার ছিল। চেঁচামেচি, রাগ দেখানো ব্যর্থ মনে করে আমি সাবধান হবার চেষ্টা করে বলি—আপনি কে?

লোকটা ওরকমই ঠ্যাটার মত বলে—তোমার প্রেমের প্রত্যাশী।

'ইয়ার্কি মারবেন না। সত্যি করে বলুন।'

'সত্যি কথাই বলছি। আমি তোমার প্রেমিক।'

'সত্যি যদি আমার প্রেমিক হয়ে থাকেন, তাহলে দয়া করে অন্ততঃ সামনের স্টেশনে নেমে পড়ুন। আমার দুর্নাম করে আপনার কোন লাভ হবে না। আমায় দয়া করুন।'

আমি হাতজোড় করে তাকে এ-কথা বলি। আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। ভদ্রলোক দরজার কাছে গিয়ে বলে—বেশ, এই যদি আপনার হুকুম হয়ে থাকে, তাহলে আমি যাচ্ছি। মনে রাখবেন। বুঝলেন।

সে দরজা খোলে, তারপর একটা পা এগিয়ে দেয়। আমার মনে হয়, সে বুঝি তলায় ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। বুঝলে পদ্মা, সে সময় আমার বুকের ভেতর যে কি রকম করছিল তা বোঝাতে পারবো না। বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মত আমি ঝাঁপিয়ে তার হাত চেপে ধরি, তারপর তাকে জোরে টেনে আনি আমার দিকে।

সে গ্লানি মাখানো গলায় বলে—'আপনি কেন টানলেন? আমি তো চলেই যাচ্ছিলাম।'

'পরের স্টেশন আসতে দিন।'

'আপনি যখন তাড়িয়ে দিচ্ছেন, যত তাড়াতাড়ি যাই ততই ভালো।'

'তা বলে আমি তো বলিনি, আপনি চলন্ত গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ুন।'

'আমার ওপর যদি এতই দয়া হয়ে থাকে, তাহলে একবার অন্ততঃ আপনাকে দেখতে দিন।'

'আপনার স্ত্রীর সঙ্গে অন্য কোন পুরুষ যদি এমন কথা বলে, তাহলে আপনার কেমন লাগবে?'

ভদ্রলোক রেগে গিয়ে বলে ওঠে—'ওকে আমি মেরে ফেলবো।'

আমি নিঃসঙ্কোচে বলে উঠি—'তাহলে ! আপনার সঙ্গে আমার স্বামী কেমন ব্যবহার করবে, এ আপনি বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই।'

'তুমি নিজের রক্ষা নিজেই করতে পারবে। তোমার স্বামীর কোন প্রয়োজন নেই। এসো, আমার কাছে এসো—আলিঙ্গনে ধরা দাও। আমিই তোমার সেই ভাগ্যবান স্বামী এবং সেবাদাস।'

আমার হৃদপিণ্ড হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে। মুখ থেকে সহসা বেরিয়ে পড়ে—'ওমা ! আপনি !! তুমি !!!' কিছুটা দূরে সরে এসে আমি দাঁড়িয়ে থাকি। ঘোমটা এক হাত লম্বা টেনে দিই। মুখ থেকে একটাও শব্দ বেরোয় না।

স্বামী বলে—এখন আর কিসের লজ্জা, কেনই বা ঘোমটা।

আমি—যাও, তুমি বড় পেছনে লাগো। এতক্ষণ আমায় ভয় দেখিয়ে, কাঁদিয়ে তোমার কি লাভ হয়েছে ?

স্বামী—লাভ ? এই সামান্য সময়ে তোমাকে যতটা জানতে পেরেছি, বাড়িতে কয়েক বছর থেকেও তা জানতে পারতাম না। আমার এই অপরাধ তুমি নিও না। আচ্ছা, সত্যি কি তুমি গাড়ী থেকে ঝাঁপ দিতে ?

'নিশ্চয়ই !'

'ভাগ্যে বেঁচে গেছি। তবে জানো, এই রসিকতা অনেকদিন আমাদের মনে থাকবে।'

আমার স্বামী সাধারণ লম্বা, শ্যামবর্ণ, মুখে বসন্তের দাগ, ছিপছিপে শরীর। তার চেয়েও অনেক বেশী রূপবান পুরুষ আমি দেখেছি ; কিন্তু আমার হৃদয় যে কি উল্লসিত হয়ে উঠছিল ! কি আনন্দময় সন্তুষ্ট অনুভব করেছিলাম, তা আমি বর্ণনা করতে পারবো না।

তাকে জিজ্ঞেস করি—গাড়ী কখন পৌছুবে।

'সন্ধ্যে নাগাদ পৌছবে।'

লক্ষ্য করলাম, স্বামীর চেহারা কিছুটা উদাস হয়ে পড়ে। মিনিট দশেক সে চুপ করে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। তাকে শুধু কথায় ব্যস্ত রাখার জন্য এই অনাবশ্যক প্রশ্নটা আমি করেছিলাম। কিন্তু, এখন কোন কথা না বলাতে, আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করি না। পানের বাটা খুলে পান সাজতে বসি। সহসা সে বলে ওঠে—চন্দ্রা, একটা কথা বলবো।

আমি বললাম—হ্যাঁ-হ্যাঁ—সহজে বলতে পারো।

সে মাথা আনত করে কিছুটা লজ্জিত ভাবে বলল—যদি জানতাম তুমি এত রূপসী, তাহলে হয়তো তোমাকে বিয়ে করতাম না। এখন তোমার রূপ দেখে

মনে হচ্ছে, সত্যি আমি খুব অন্যায় কাজ করে ফেলেছি। আমি কোনও ভাবে তোমার যোগ্য নই।

পান সাজিয়ে তাকে দিয়ে বলি—এমন কথা বলো না লক্ষ্মীটি! তুমি যাই হও না কেন, তুমি আমার সর্বস্ব। আমি তোমার দাসী হতে পেরে নিজের ভাগ্যকে ধন্য মনে করি।

পরের স্টেশন এসে পড়ে। গাড়ী থামে। স্বামী সেখানেই নেমে পড়ে। এরপর যখনই গাড়ী থামে, সে জানালার ধারে এসে দু-চারটে কথা বলে যায়। সন্ধ্যে নাগাদ আমরা বেনারসে এসে পৌছুই। তাদের বাড়ি একটা গলির ভেতর, আমাদের বাড়ির চেয়ে আয়তনে ছোট। এ-কদিনে এও বুঝতে পেরেছি, শ্বাশুড়ীর স্বভাব কিছুটা রুক্ষ ধরনের। কিন্তু এখনও কারো সম্পর্কে কিছু বলা যায় না। এও হতে পারে, আমারই ভুল। পরে লিখে জানাবো। এঁদের ঘর কেমন, আর্থিক অবস্থা কেমন, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী কেমন—এসবের আমার চিন্তা নেই। আমার ইচ্ছে, এখানকার সকলেই যেন আমার প্রতি খুশী থাকেন। স্বামী আমাকে ভালবাসে, এটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আর কোন ব্যাপারে আমার ভ্রূক্ষেপ নেই। আমার কাছে তোমার ভগ্নিপতির বার বার আসাটা শ্বাশুড়ীর পছন্দ নয়। উনি হয়তো ভাবেন, শেষে না আবার মাথায় উঠে বসি। আমার প্রতি তাঁর এমন নির্মমতা কেন, বলতে পারি না, তবে এটা বিশ্বাস করি—যদি তিনি এ ব্যাপারে অখুশী হন, তা আমার ভালোর জন্য। উনি নিশ্চয়ই এমন কোন ব্যাপার করবেন না, যাতে আমার ভালো না হয়। আপন সন্তানের খারাপটা কোন মা-ই করতে পারেন না। আমার মাঝে নিশ্চয়ই কোন ত্রুটি তার নজরে ধরা পড়েছে। দু-চারদিনে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। তোমার খবরাখবর জানিও। উত্তরের প্রতীক্ষা এক মাসের মধ্যেই আশা করছি, নইলে তোমার খুশী হলে।

তোমার চন্দ্রা

॥ ৯ ॥

দিল্লী

১-২-২৬

প্রিয় বোন,

তোমার প্রথম মিলনের কৌতূহলময় বিবরণ পড়ে মন খুশীতে ভরে উঠেছে বলতে কি, তোমার প্রতি কিছুটা ঈর্ষা হচ্ছে। ভেবেছিলাম, আমার প্রতি তোমার ঈর্ষা হবে, কিন্তু ব্যাপারটা বিপরীত হয়ে দাঁড়ালো। তোমার এখন চারদিকে শুধু

শ্যামলিমা নজরে পড়ছে ; অথচ আমি যেদিকে নজর দিই, ধূ-ধূ মাঠ আর নগ্ন টিলা ছাড়া আর কিছু নয়। যা গে! এবার আমারও কিছু বৃত্তান্ত শোনো—'হৃদয় ধরে বসো, সখী, সময় হয়েছে আমার।'

বিনোদের অবিচলিত দার্শনিকতা এখন অসহ্য হয়ে উঠেছে। বিচিত্র ধরনের জীব। বাড়িতে যদি আগুন লাগে, বাজ পড়ে—তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তার প্রতি আমার আর বিন্দুমাত্র দয়া নেই। সকাল থেকে রাত অব্দি আমি সংসারের ঝামেলা পোহাই, অথচ তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সত্যি বলছি, এমন সহানুভূতিহীন পুরুষ আমি কখনও দেখিনি। তার উচিত ছিল কোন বনে গিয়ে তপস্যা করা। এখন ধরো দুজন প্রাণী মাত্র, ছেলে-পিলে হলে যে মরার নিঃশ্বাস ফেলতে পারবো না। ঈশ্বর না করুন, সেই দারুণ বিপত্তি আমার মাথায় ভেঙ্গে পড়ে।

চন্দ্রা, এখন আমার ইচ্ছে করে, যে-কোন ভাবে হোক—তার এই সমাধি ভাব ভেঙ্গে ফেলি। কিন্তু কোন উপায় সফল হচ্ছে না, কোন চাল ঠিক-ঠিক ভাবে দেওয়া যাচ্ছে না। একদিন আমি তার ঘরে ল্যাম্পের বালব ভেঙ্গে ফেলি। ঘর অন্ধকার। বিকেলে বেড়িয়ে যখন উনি ফিরলেন, দেখলেন ঘর অন্ধকার। তা, আমায় জিজ্ঞেস করতে, আমি বলে দিই—বালব ভেঙ্গে গেছে। ব্যস্, কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। খাবার খেল, তারপর আমার ঘরে এসে শুয়ে পড়লো। খবরের কাগজ-উপন্যাস এগুলি দেখলোও না, কি জানি সেইসব ঔৎসুক্য কোথায় যে বিলীন হয়ে গেছে। সারাদিন পার হয়ে গেল, তার বালব লাগানোর কোন গরজ বা চিন্তা দেখা গেল না। শেষে আমাকেই বাজার থেকে নিয়ে আসতে হলো।

একদিন রেগে-মেগে আমি ঠাকুরকে বার করে দিই। ভাবলাম, সারারাত যখন কর্তা না খেয়ে ঘুমোবে, তখন তার চোখ খুলবে। হায়! এই লোকটা আমায় জিজ্ঞেস পর্যন্ত করল না। চা পায়নি, তাতে কি! তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। ঠিক দশটায় সে তার পোশাক পরে, একবার কিচেনে গিয়ে দেখে—সেখানে চুপ-চাপ। তারপর, সোজা কলেজে রওনা দেয়। অন্য কেউ হলে জিজ্ঞেস করতো, ঠাকুর কোথায় গেছে, কেন গেছে, এবার কি হবে, কে রান্না করবে, অন্ততঃ আমাকে এটুকু তো সে বলতে পারতো—তুমি যদি রান্না না করতে পারো, তাহলে বাজার থেকে কিছু খাবার আনিয়ে নাও। উনি চলে যাবার পর আমার ভয়ানক অনুতাপ হয়। রয়েল হোটেল থেকে খাবার আনাই, তারপর বেয়ারার হাত দিয়ে কলেজে পাঠিয়ে দিই। কিন্তু নিজে না খেয়ে থাকি। সারাদিন ক্ষিদের জ্বালায় আমার অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়। কলেজ থেকে উনি ফিরে

আসেন, আমায় পড়ে থাকতে দেখে এমন বিচলিত হয়ে ওঠেন—যেন আমার পিত্ত-দোষ হয়েছে। সেই মুহূর্তে ডাক্তার ডেকে পাঠায়। ডাক্তার এসে আমার চোখ দেখে, জিভ দেখে, নাড়ি টিপে দেখে, মালিশ করার ওষুধ, খাবার ওষুধ আলাদা আলাদা করে দেয়। সে ওষুধ আনতে বেরিয়ে যায়। ফিরে যখন আসেন, সঙ্গে বারো টাকার বিলও আনেন। এসব কাণ্ড-কারখানায় আমার এমন রাগ ধরছিল যে ইচ্ছে করছিল পালিয়ে কোথাও চলে যাই। উপরন্তু, উনি আবার আরাম-কেদারা টেনে আমার খাটের কাছে এসে বসে পড়েন, প্রতিক্ষণে জিজ্ঞেস করেন, কেমন বোধ করছো শরীর? যন্ত্রণা কমেছে? এদিকে আমার খিদের চোটে আঁত কুঁই-কুঁই করছে। ওষুধগুলি হাতে ছুঁয়েও দেখিনি। শেষে, আমি সহ্য করতে না পেরে আবার বেয়ারাকে দিয়ে খাবার আনাই। আবার চাল উল্টো হয়। ভয় ছিল, সকাল হলেই আবার উনি ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসে, তাই সকাল হতে হতে হার স্বীকার করে সংসারের কাজ-কর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। তক্ষুণি অন্য একজন ঠাকুর ডেকে আনি। পুরনো ঠাকুরকে বেকসুর বার করে দেয়ার সাজা—ফলস্বরূপ একটা নিরামিষকে রাখতে হয়—সামান্য রুটিটুকুও তৈরি করতে পারে না। সেদিন থেকে আরেকটি গলগ্রহ জুটলো। দু-বেলা দুটো ঘণ্টা এই ঠাকুরকে রান্না শেখাতেই কেটে যায়। এর আবার নিজের রন্ধন শিল্প সম্পর্কে এমন উগ্র ধারণা ও অহংকার আছে, যতই বকি না কেন, সে নিজের ইচ্ছে মতই রান্না করে। মাঝে মাঝে আবার এমন ফিক্-ফিক্ করে হাসে, যেন বলতে চায়—'তুমি এসব কি বুঝবে, বরং চুপচাপ বসে দেখো।' বিনোদকে চটাতে চেয়েছিলাম, অথচ নিজেই অগাধ জলে পড়ে গেছি। টাকা যা খরচ হবার হয়েছে, মাঝখান থেকে আরেকটা ঝামেলা এসে জুটলো। আমি বেশ ভালো করে জানি, বিনোদের ডাক্তার ডেকে আনা বা আমার বিছানার ধারে বসে থাকা—একটা লোক-দেখানো ব্যাপার। ওর চোখে-মুখে বিন্দুমাত্র শঙ্কার ছাপ ছিল না, তেমন অশান্ত ছিল না।

চন্দ্রা, আমায় ক্ষমা করো। এমন পুরুষের পাল্লায় পড়ে তোমার কি দশা হতো, আমি জানি না; তবে আমার এ অবস্থায় থাকা অসহ্য হয়ে উঠেছে। এর পরে যে বিবরণ দিচ্ছি, তা শুনে তুমি নাক-ভ্রূ কুঁচকাবে, আমায় গালাগাল দেবে, কলঙ্কিনী বলবে। যা ইচ্ছে তুমি বলো, কিন্তু আমার ভ্রূক্ষেপ কিসের। আজ দিন-চারেক হলো, আমি রমণী-চরিত্রের এক নতুন অভিনয় করি। আমরা দুজন সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। হলে, আমার পাশে এক বাঙালী ভদ্রলোক বসেছিলেন। বিনোদ সিনেমাও এমনভাবে দেখে, যেন সে ধ্যানে বসেছে।

কোন কথাটি নয়, আলোচনা নয়—কিছু না। বইটি দারুণ ভালো, অভিনয় এতখানি জীবন্ত যে বার বার আমার মুখ থেকে প্রশংসাবাক্য বেরিয়ে পড়ছিল। বাঙ্গালী ভদ্রলোকটিও ছবি দেখে বেশ আনন্দ পাচ্ছিলেন। আমরা দুজনে ঐ ছবি সম্পর্কে নানা রকম আলোচনা শুরু করি। ভদ্রলোক ছবি সম্পর্কে এমন সুন্দর সমালোচনা করছিলেন, যে, আমি মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারি নি। ফিল্মের আলোচনার চেয়ে বেশী আকর্ষণীয় ছিল তাঁর বাক্-ভঙ্গিমা। আমি বেশ আনন্দ পাচ্ছিলাম। বোন, সত্যি বলছি, চেহারায় সে বিনোদের নখের যুগ্যিও নয়, কিন্তু আমি শুধু বিনোদকে ঈর্ষান্বিত করার জন্য ওর সঙ্গে মুচকি হেসে কথা বলতে থাকি। ভদ্রলোক হয়তো ভাবলেন, নতুন একটা বুঝি জুটলো। 'বিশ্রামে'র সময় তিনি বাইরে যান, আমিও উঠে দাঁড়াই ; কিন্তু বিনোদ তার সিটে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকে।

আমি বলি—বাইরে যাবো, বসে বসে আমার কোমর ধরে গেছে।

বিনোদ বলে—হ্যাঁ, চলো একটু এদিক-ওদিক পায়চারি করা যাক। আমি কিছুটা হেলায় বলি—তোমার যদি ইচ্ছে না হয়, যেওনা ; আমি তোমায় যেতে বলছি না।

বিনোদ আবার নিজের সিটে বসে পড়ে, বলে—বেশ তো।

আমি বাইরে বেরিয়ে আসতেই ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কি এখানেই থাকেন ?

'আমার স্বামী এখানকার য়ুনিভার্সিটির প্রফেসার।'

'আচ্ছা! উনি বুঝি আপনার স্বামী। অদ্ভুত লোক তো!'

'আপনাকেও সম্ভবতঃ এখানে প্রথম দেখলাম।'

'হ্যাঁ, আমার দেশ বাংলায়। কাঞ্চনপুর মহারাজার আমি প্রাইভেট সেক্রেটারী। মহারাজা এখানে ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন।'

'আরও কিছুদিন আছেন তাহলে ?'

'আশা করি। তবে, বলা যায় না। থাকলে বছর খানিক। আবার যাবার হলে হয়তো পরের ট্রেনেই রওনা হতে হবে। মহারাজা সাহেবের কোন স্থিরতা নেই। এমনিতে উনি খুব ভদ্র এবং মিশুকে। আপনার সঙ্গে পরিচয় হলে খুশী হবেন।'

কথা বলতে বলতে আমরা রেঁস্তোরায় গিয়ে বসি। ভদ্রলোক চা ও টোস্ট নেন। আমি শুধু চা নিই।

'তাহলে বলুন, এই মুহূর্তে মহারাজা সাহেবের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই। আপনি আলাপ করে বিস্মিত হবেন। মুকুটধারীদের মাঝে এমন বিনয় ও নম্রতা সচারাচর দেখা যায় না। তাঁর কথা শুনে আপনি মুগ্ধ হবেন।'

আয়নায় নিজের চেহারা একবার পরখ করে নিয়ে বলি—না, আজ থাক। পরে কোন দিন দেখা হবে। আপনার সঙ্গে মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ হবে। আপনার স্ত্রী কি আপনার সঙ্গে আসেন নি ?

যুবক স্মিত হেসে বললেন—আমি এখনও অবিবাহিত, সম্ভবতঃ অবিবাহিত থেকে যাবো।

আমি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করি—সে কি ? আপনি দেখছি মেয়েদের কাছ থেকে তফাতে সরে থাকার জীব। এতক্ষণ এত কথা হলো, অথচ দেখুন না আপনার নামটুকুও জিজ্ঞেস করা হয়নি।

ভদ্রলোক জানান, তার নাম ভুবনমোহন দাশগুপ্ত। আমিও নিজের পরিচয় দিই।

'আজ্ঞে না ; আমি সেই হতভাগাদের দলে নয়, যারা একবার হতাশ হয়ে আর কোন পরীক্ষা করে না। সংসারে রূপের অভাব নেই, কিন্তু রূপ আর গুণের একাকার খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। যে রমণীর সঙ্গে আমার প্রেম হয়েছিল, সে আজ এক নামকরা উকিলের স্ত্রী। আমি গরীব ছিলাম। তার ফল আমায় এমন পেতে হয়েছে যা আজীবন মনে থাকবে। বছর খানিক ধরে তার উপাসনা করেছি, কিন্তু যখন সে টাকা ধনসম্পত্তির প্রশ্ন তুলে আমায় সরিয়ে দিল, আমি আর কিসের আশা করবো ?'

আমি হেসে বললাম—আপনি দেখছি খুব তাড়াতাড়ি মনের সাহস হারিয়ে ফেলেছেন !

সামনের দরজার দিকে তাকিয়ে থাকেন ভুবন, তারপর বলেন—অদ্যাবধি আমি এমন কোন বীর পুরুষ দেখিনি, যে রমণীর কাছে পরাজয় বরণ করে নি। এরা হৃদয়ে আঘাত করে, এবং হৃদয় একবারই মাত্র গভীর আঘাত সহ্য করতে পারে। যে রমণী আমার প্রেমকে তুচ্ছ জ্ঞানে পায়ে মাড়িয়ে চলে গেছে, তাকে আমি দেখিয়ে দিতে চাই—আমার দৃষ্টিতে ধন-সম্পত্তি অতি তুচ্ছ ব্যাপার। এটাই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমার জীবন সেদিনই সফল হবে, যেদিন বিমলার বাড়ির সামনে আমার বিশাল প্রাসাদ গড়ে উঠবে এবং তার স্বামী আমার সঙ্গে পরিচয় রাখা নিজের সৌভাগ্য বলে মনে করবে।

আমি কিছুটা গম্ভীরভাবে বলি—এ আর এমন কিছু বিরাট উদ্দেশ্য নয়। আপনি এটা কেনই বা ভাবছেন যে, বিমলা শুধু অর্থ-সম্পত্তির জন্য আপনাকে পরিত্যাগ করেছে। আরো অনেক কারণ থাকাও তো সম্ভব ! মা-বাবা তাকে চাপ দিয়েছে, কিংবা এও হতে পারে তার নিজের মাঝে এমন কিছু ত্রুটি দেখা দিয়েছে যার ফলে

আপনার জীবন দুঃখময় হয়ে যেত। আপনি কেন ভাবছেন, যে প্রেমে বঞ্চিত হয়ে আপনি দুঃখী হয়েছেন, সে-প্রেমে বঞ্চিত হয়ে সে সুখী হয়েছে। এও তো সম্ভব ছিল, আপনি কোন ধনী রমণী পেয়ে সরে যেতেন।

ভুবন কিছুটা উত্তেজিত হয়ে জোর দিয়ে বলেন—না, এ' অসম্ভব। একেবারে অসম্ভব। তার জন্য আমি ত্রিভুবনের রাজ্য পরিত্যাগ করতে পারি।

আমি এবার হেসে বলি—হ্যাঁ, এ সময় অবশ্য আপনি এ কথা বলতে পারেন ; কিন্তু এমন সঙ্কটে পড়ে আপনার কি যে অবস্থা হতো, তা আপনি নিশ্চিত করে বলতে পারবেন না। জানেন তো, সৈন্যের সাহসিকতার প্রমাণ কিন্তু অস্ত্রে, বাক্-যুদ্ধে নয়। যাক্। আপনি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করুন, কেননা সেই পরীক্ষায় উপস্থিত হতে হয় নি। যে প্রেম প্রত্যাঘাতের আশ্রয় নেয়, তা কখনও প্রেম হতে পারে না। প্রেমের আদি ব্যাপার হলো সহৃদয়তা, প্রেমের শেষ ব্যাপার হলো সহৃদয়তা। এও সম্ভব, এরি মধ্যে এমন কোন ব্যাপার আপনার গোচরে আসে, যা বিমলার তরফ থেকে আপনাকে নম্র-সহিষ্ণু করে তোলে।

ভুবন গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকেন। মিনিট কয়েক পরে মাথা তোলেন, তার পর বলেন—মিসেস বিনোদ, আজ আপনি এমন একটা ব্যাপার জানালেন, যা অদ্যাবধি আমার চিন্তায় জাগেনি। এই ভাবনা এর আগে কখনও আমার মনে উদয় হয়নি। আমি যে কেন এতখানি অনুদার হয়ে উঠেছি, আমি নিজেই জানি না। আজ আমি বুঝতে পারছি, প্রেমের উচ্চ আদর্শের পালন একমাত্র রমণীরা করতে পারে। প্রেমের জন্য পুরুষেরা কখনও আত্মসমর্পণ করতে পারে না—প্রেমকে কখনও তারা স্বার্থ ও কামনা থেকে পৃথক করতে পারে না। আশা করি, এবার আমার জীবন আনন্দময় হয়ে উঠবে। আপনি আমায় আজ যে শিক্ষা দিলেন, তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

বলতে বলতে ভুবন সহসা চমকে ওঠেন—আহ্! আমিও কি বোকা—গোটা রহস্য এখন আমি সহজে বুঝতে পারছি। আর কোন-কিছু লুকনো নেই। সত্যি, বিমলার প্রতি আমি বড় অন্যায় করেছি। ভয়ানক অন্যায়। আমি তখন একরকম অন্ধই ছিলাম। বিমলা, তুমি আমায় ক্ষমা করো।

অনেকক্ষণ ধরে এভাবে ভুবন বিলাপ করতে থাকেন। বারবার আমায় ধন্যবাদ দিতে থাকেন, এবং নিজের মূর্খামির জন্য অনুতাপ করতে থাকেন। কখন যে ঘণ্টা পড়ে, ছবি দেখানো শুরু হয়—আমরা টেরই পাই না। হঠাৎ বিনোদ রেঁস্তোরায় ঢোকে। আমি চমকে উঠি। তার মুখের দিকে চেয়ে দেখি, না, কোন কিছুর

আভাস নেই। বলে—তুমি এখানেই পদ্মা! অনেকক্ষণ হলো ছবি শুরু হয়েছে। আমি চারদিকে খোঁজ করছিলাম।

আমি অপ্রস্তুতভাবে উঠে দাঁড়াই, বলি—ছবি শুরু হয়ে গেছে? ঘন্টির শব্দ শোনা যায়নি তো।

ভুবনও উঠে দাঁড়াল। আমরা ফিরে গিয়ে আবার ছবি দেখতে শুরু করি। বিনোদ যদি এসময় আমায় দু' চারটে শক্ত শক্ত কথা বলতো কিংবা তার চোখে ক্রোধের শিখা দেখা দিত, তাহলে আমার অশান্ত হৃদয় সামলে যেত, আমার মনে কিছুটা দাগ পড়ত,কিন্তু তার অবিচলিত বিশ্বাস আমায় আরও বিক্ষিপ্ত করে তোলে। বোন, আমি চাই সে যেন আমায় শাসন করে। তার কঠোরতা তার উগ্রতা তার বলিষ্ঠতার রূপ আমি দেখতে চাই। তার প্রেম, প্রমোদ এবং বিশ্বস্ততার রূপ আমি দেখেছি। এতে আমার আত্মা তৃপ্ত হয় না। যে পিতা তার সন্তানকে ভাল খাওয়া-দাওয়া করায়, ভাল পোশাক-বস্ত্র পরায়, কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই; সে যে রাস্তায় যায়, সেই রাস্তায় যেতে দেয়, যা কিছু করতে চায়, করতে দেয়, কখনও তার দিকে চোখ রাঙিয়ে কথা বলেনি—এমন সন্তান নিশ্চিত বাউণ্ডুলে ধরনের হবে। আমারও অবস্থাটা সে রকমই হয়েছে। তার উদাসীনতা আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে। সে আমাকে এটুকুও জিজ্ঞেস করে না, ভুবন কে! ভুবন হয়তো ভেবে থাকবেন. আমার স্বামী আমাকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করে না। বিনোদ নিজে স্বাধীন থাকতে চান, আমাকেও স্বাধীনতা দিতে চান। আমার কোনও কাজে তিনি হস্তক্ষেপ করতে চান না। এও চান, আমিও যেন তাঁর কোন কাজে হস্তক্ষেপ না করি। এ ধরনের স্বাধীনতাকে আমি দুজনের পক্ষে বিষতুল্য মনে করি। পৃথিবীতে স্বাধীনতার যাই মূল্য হোক না কেন, ঘরে-সংসারে পরাধীনতারই সমৃদ্ধি বয়ে আনে। আমার একটা গহনাকে যেমন নিজের বলে মনে করি, ঠিক তেমনি, বিনোদকেও আমি নিজের বলেই মনে করি। আমাকে না বলে বিনোদ যদি সে গহনা কাউকে দিয়ে দেয়, তাহলে আমি তার সঙ্গে ঝগড়া করে বসবো। আমি চাই, ঠিক সে রকম, তার ওপর আমার অধিকার হোক। আমার প্রতিও তার এমন অধিকারই আশা করি। আমার প্রতিটি কথায়, প্রতিটি ব্যাপারে তার লক্ষ্য রাখা উচিত। আমি কার সঙ্গে দেখা করি, কোথায় যাই, কি পড়াশুনা করি, কি ভাবে জীবন ব্যতীত করি—এই সব প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে তার তীব্র দৃষ্টি থাকা উচিত। উনিই যখন আমার বিষয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখান না, আমিই বা দেখাবো কেন? এ টানা-পোড়েনে আমরা একে অপরের কাছ থেকে ক্রমশঃ আলাদা হয়ে দূরে সরে যাচ্ছি। তোমায়

কি বলবো, আমি আজও জানি না, সে কোন কোন বন্ধুদের রোজ চিঠি লেখে। সেও কোনদিন আমাকে কখনও জিজ্ঞেস করেনি। যাক্‌গে, কি লিখতে যাচ্ছি, আর কি বলে চলেছি। বিনোদ আমায় কিছু জিজ্ঞেস করলো না। আমি আবার ভুবনের সঙ্গে ফিল্ম সম্পর্কিত আলোচনা করতে শুরু করি।

ফিল্ম শো শেষ হবার পর আমরা বাইরে আসি। টাঙ্গা ঠিক করছি, এমন সময় ভুবন বলেন—আপত্তি না থাকলে, আমার গাড়ীতে আপনাদের পৌছে দিই।

আমরা কোন আপত্তি করি না। আমাদের বাড়ির ঠিকানা জেনে ভুবন গাড়ী চালাতে শুরু করেন। পথে আমি ভুবনকে বলি—'কাল দুপুরে আমার বাড়িতে দুপুরের খাবার খাবেন।' ভুবন আমার আমন্ত্রণ স্বীকার করে নেন।

ভুবন আমাদের পৌছে দিয়ে চলে যান, কিন্তু আমার মন অনেকক্ষণ ধরে তার দিকে চেয়ে থাকে। এই দু-তিন ঘণ্টায় ভুবনকে যতখানি বুঝতে পেরেছি, ততখানি বিনোদকে আজ অব্দি বুঝতে পারিনি। ভুবনকে আমি যত মনের কথা বলে ফেলেছি, তা সম্ভবতঃ বিনোদকে আজ অব্দি বলিনি। ভুবন কিছুটা সেই ধরনের পুরুষ—যদি কোন পর-পুরুষকে আমার প্রতি কুদৃষ্টি দিতে দেখে, তাহলে তাকে মেরে ফেলতে দ্বিধা করবে না। আবার কোন পুরুষের দিকে আমাকে হাসতে দেখলে, সহজেই আমাকে খুন করে ফেলতে পারেন। দরকার পড়লে আমার জন্য আগুনে ঝাঁপ দিতে পারেন। এমনই পুরুষ-চরিত্র আমার হৃদয় জয় করতে পারে। শুধু আমার হৃদয় নয়, সমগ্র নারীজাতি (আমার ধারণায়) এমন পুরুষের জন্য প্রাণ দিতে পারে। তারা অসহায়, তাইতো এমন সাহসী লোকের আশ্রয় খোঁজ করে।

বোন, তুমি হয়তো বিরক্ত হয়ে উঠেছো, চিঠি দীর্ঘ হয়ে উঠেছে, কিন্তু এই 'কাণ্ড' শেষ না করা অব্দি থামতে পারছি না। আমি সকাল থেকে ভুবনের নিমন্ত্রণের আয়োজন করতে শুরু করে দিই। ঠাকুরটা তো নিধিরাম, অগত্যা আমাকেই নিজের হাতে সব কাজ করতে হয়। রান্না তৈরি করায় যে এত আনন্দ, এর আগে কখনও উপলব্ধি করিনি।

ভুবনবাবুর গাড়ি যথাসময়ে এসে হাজির। গাড়ি থেকে নেমে ভুবন সোজা আমার ঘরে এসে ঢোকেন। দু-চারটে কথাবার্তা হয়। ডিনার টেবিলে গিয়ে বসি। বিনোদও এ-সময় খেতে আসে। আমি তাদের দুজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। মনে হলো, বিনোদ যেন ভুবনের প্রতি কিছুটা উদাসীনতা দেখায়। আসলে সে রাজা-জমিদারদের অপছন্দ করে, সাম্যবাদী। রাজাদের যদি অপছন্দ করে, তাহলে তার মোসাহেবদের করবে না কেন? তার ধারণা,

এইসব ধনী-রঈসদের দরবারে যতসব খোসামুদে অকর্মার ধাড়ি, সিদ্ধান্তহীন এবং চরিত্রহীন লোকদেরই জমায়েত দেখা যায়। এসব ধনীদের প্রতিটি উচিত-অনুচিত ইচ্ছা পূরণ করা এবং প্রজাদের গলা কেটে নিজেদের আখের গোছানো ছাড়া এসব লোকেদের অন্য কোন কাজ নেই। খাবারের সময় কথাবার্তা হতে হতে আলোচনার ধারা বিবাহ এবং প্রেমের মত মহত্বপূর্ণ বিষয়ে মোড় নেয়।

বিনোদ বলে—'না, আমি বর্তমান বৈবাহিক-প্রথা সমর্থন করি না। মানুষ যখন সভ্যতার প্রথম স্তরে ছিল, তখন এই প্রথা আবিষ্কৃত হয়েছিল। তারপর পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেছে। অথচ, বিবাহ-প্রথার সামান্যতম পরিবর্তনও ঘটেনি। বর্তমানকালের পক্ষে এই প্রথা একেবারে উপযোগী নয়।'

ভুবন বলেন, 'আপনি—কি এমন দোষ দেখতে পেলেন?'

বিনোদ একটু ভেবে বলে—'সবচেয়ে বড়ো দোষ হলো, একটা সামাজিক প্রশ্নকে ধার্মিক রূপ দেওয়া হয়।'

'তাছাড়া?'

'ব্যক্তির স্বাধীনতায় এটা বাধাস্বরূপ। স্ত্রী-ব্রত এবং পাতিব্রত্যের ছলনা সৃষ্টি করে আমাদের আত্মাকে সঙ্কুচিত করে তোলে। বস্তুতঃ আমাদের বুদ্ধির বিকাশে এই প্রথা যতটা বাধা সৃষ্টি করেছে, তা কোন অতীত বা দৈনিক বিপ্লবেও ঘটেনি। আমাদের সামনে একটা মিথ্যা আদর্শ রেখে দিয়েছে এবং অদ্যাবধি আমরা সেই পুরনো, পচা, লজ্জাজনক এবং পাশবিক রেখা টেনে চলেছি। ব্রত শুধু একটা অর্থহীন বন্ধনের নাম মাত্র। এমন মহত্বপূর্ণ নাম দিয়ে আমরা বন্দীদের একটা একটা ধার্মিক নাম দিয়েছি। পুরুষ কেন ভাববে, স্ত্রী তাকে আপন ঈশ্বর, আপন সর্বস্ব মনে করুক? কেননা সে স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ করে? আবার, পুরুষের সম্পত্তির জন্য উত্তরাধিকারীর জন্ম দেয়াটাই কি স্ত্রীর একমাত্র কর্তব্য? সেই সম্পত্তি, হিন্দু-নীতিশাস্ত্র অনুযায়ী, স্বামীর মৃত্যুর পর তার কোন অধিকার থাকে না। সমাজে এই সমস্ত ব্যবস্থা, যাবতীয় সংগঠন—সবই সম্পত্তি-রক্ষার আধারে সৃষ্ট। যার ফলে, সম্পত্তিকে প্রধান এবং ব্যক্তিকে গৌণ করে তুলেছে। আমাদেরই বীর্যে পুষ্ট সন্তান আমাদের উপার্জিত সম্পত্তি ভোগ করবে—এই মনোভাবে কতখানি স্বার্থান্ধতা, কতখানি দাসত্ব লুকিয়ে আছে—এর অনুমান কেউ করতে পারে না। এই বন্দীত্বের শৃঙ্খলে জড়িত সমাজের সন্তানরা যদি আজ ঘরে, দেশে, সংসারে আপন ক্রুর স্বার্থের জন্য রক্তনদী বইয়ে দেয়—আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এই বৈবাহিক প্রথাকে আমি যাবতীয় অশুভের মূল বলে মনে করি।'

ভুবন বিস্মিত হন। আমিও বিস্ময় বোধ করি। এসব বিষয় নিয়ে বিনোদ

কখনও আমার সঙ্গে এত স্পষ্টভাবে আলোচনা করেনি। আমি জানতাম যে দু-একবার এই প্রসঙ্গে তার সঙ্গে তর্ক-আলোচনাও হয়েছে কিন্তু বৈবাহিক-প্রথার সে যে এত বিরোধী—তা আমার জানা ছিল না। ভুবনের চোখে মুখেও স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, সে এ ধরনের দার্শনিক ভাবধারার গন্ধও পায়নি। কিছুক্ষণ পরে বলেন—প্রোফেসর, আপনি আমায় দেখি বেশ ভাবনায় ফেললেন। আপনি কি এই প্রথার বদলে অন্য কোন প্রথা রাখতে চান, নাকি বিয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না ? পশু-পক্ষীরা যেভাবে আপসে মিলিত হয়, আমাদেরও কি সেভাবে করা উচিত ?

বিনোদ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়—অনেকটা! পশু-পক্ষীদের মধ্যে সকলের বিকাশ এক ধরনের নয়। কিছু এমন প্রাণী আছে, যারা যুগল নির্বাচনে কোন বাছ-বিচার করে না। কিছু এমন প্রাণী আছে, যাঁরা একবার সন্তান উৎপন্নের পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, আবার কিছু কিছু প্রাণী এমন আছে যারা জীবন পর্যন্ত একসঙ্গে বসবাস করে। তাছাড়া, নানান ধরনের শ্রেণী আছে। মনুষ্য হবার ফলে আমি সেই শ্রেণীকে শ্রেষ্ঠ মনে করি যারা আজীবন একসঙ্গে থাকে। কিন্তু স্বেচ্ছানুসারে। তাদের মাঝে কোন বন্দিত্ব নেই, কোন সাজা নেই। দুজনে নিজের নিজের খাই-খোরাকীর চিন্তা করে। দুজনে মিলে থাকার বাসা তৈরি করে, দুজনে একসঙ্গে সন্তানের প্রতিপালন করে। তাদের মাঝে তৃতীয় কোন 'নর' বা 'নারী' হাজির হতে পারে না, এমন কি তাদের মাঝে কোন একজন মারা গেলে, অন্যজন মৃত্যু পর্যন্ত একাকী থাকে। এই অন্ধকার মনুষ্যজাতির মধ্যেই আছে। স্ত্রী যদি পর-পুরুষের সঙ্গে হেসে কথা বলে, অমনি তার পুরুষের বুকে আগুন জ্বলতে শুরু করে, মনে মনে খুন-খারাপির পরিকল্পনা আঁটা শুরু করে দেয়। আর পুরুষ যদি অন্য স্ত্রীর সঙ্গে অনুরাগের দৃষ্টিতে দেখে, অমনি তার অর্ধাঙ্গিনীর ভঙ্গিমা পাল্টে যায়, স্বামীর প্রাণ নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়ে। এসব কি ? এমন মনুষ্য কোন্ মুখে সমাজ-সভ্যতার দাবি করতে পারে ?

ভুবন মাথা নাড়তে নাড়তে বলেন—মনুষ্য সমাজেও তো নানান শ্রেণীর লোক আছে। কেউ কেউ প্রতি মাসে নতুন জোড়ার অন্বেষণ করে বেড়ায়।

বিনোদ হেসে বলে উঠে—কিন্তু এটা এত সহজ কাজ নয়। হয় সে এমন স্ত্রী চাইবে যে সন্তান নিজে পালন করতে পারবে, নয় তাকে বেশ কিছুটা সময় এবং দাম দিতে হবে।

ভুবনও হেসে ওঠেন—আপনি তাহলে নিজেকে কোন্ শ্রেণীতে গণ্য করবেন ?

বিনোদ এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। প্রশ্নটা কিছুটা খাপছাড়া ধরনের। লজ্জা পেয়ে বলে—পরিস্থিতি যে শ্রেণীতে টেনে নিয়ে যাবে সেই মতো হবে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে স্ত্রী এবং পুরুষ দুজনের পক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী। কোন কারণ নেই, আমার মন কোন নবযৌবনার দিকে আকর্ষিত হতে পারে এবং সেও আমাকে কামনা করতে পারে, তবুও আমি সমাজ এবং নীতির ভয়ে তার প্রতি চাইতে না পারি। আমি একে পাপ মনে করি না।

ভুবন কোন জবাব দেবার আগেই বিনোদ উঠে দাঁড়ায়। কলেজে দেরি হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে এবং রওনা হয়। আমরা দুজনে বৈঠকখানায় এসে বসি, তারপর গল্প করতে থাকি।

ভুবন সিগার ধরিয়ে বলেন—শুনলেন কিছু, কোথায় গিয়ে থামল ?

লজ্জায় আমি মাথা ঝুঁকিয়ে নিই। কি জবাব দেব ! বিনোদের শেষ কথা আমার হৃদয়ে কঠিনভাবে আঘাত করে। আমার এমন মনে হতে থাকে, বিনোদ শুধু আমাকে শোনাবার জন্য বিয়ের এই নতুন দস্তাবেজ তৈরি করেছে। সে আমার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায়। সে হয়তো অন্য কোন রমণীর প্রতীক্ষায় আছে, আমার কাছে থেকে মন তার উত্যক্ত হয়ে উঠেছে। এটা ভাবতেই আমার খুব খারাপ লাগে, মনে দুঃখ বোধ হয়। চোখ দিয়ে অশ্রু বেয়ে পড়ে। একা থাকলে আমি কখনও কাঁদি না, কিন্তু ভুবনের উপস্থিতিতে নিজেকে সামলাতে পারি না। ভুবন আমায় অনেকক্ষণ ধরে সান্ত্বনা দিতে থাকেন—মিছিমিছি আপনি এত দুঃখ করছেন। মিস্টার বিনোদ আপনার মূল্য বোঝে না, কিন্তু পৃথিবীতে অন্ততঃ এমন একজন আছে যে আপনার ইঙ্গিতে প্রাণ অব্দি লুটিয়ে দিতে পারে। আপনার মত রমণী পেয়ে পৃথিবীতে এমন কোন্ পুরুষ আছে যে নিজের ভাগ্য ধন্য মনে করে না। আপনি কোন চিন্তা করবেন না।

ভুবনের এ-কথা আমার খুব খারাপ লাগে। রাগে ক্ষোভে আমার মুখ লাল হয়ে ওঠে। ধূর্ত লোকটা আমার এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমার সর্বনাশ করতে চায়। নিজের দুর্ভাগ্যে বার বার কান্না পেতে থাকে। বিয়ের এখনও বছর অতিক্রম করেনি, আমার অবস্থা এমন হয়ে উঠেছে যে অন্যরা আমার ক্ষতি-সাধন করতে, আমার ওপর মোহ বিস্তার করার সাহস পায়। বিনোদের সঙ্গে যখন আমার আলাপ-পরিচয় ঘটেছিল, আমার হৃদয় গর্বে ফুলে উঠেছিল। ভক্তিভরে আমার হৃদয় তার চারণে অর্পণ করেছিলাম। তখন কি আর জানতাম, এত তাড়াতাড়ি তার মন থেকে পতিত হবো এবং আমায় পরিত্যক্তা ভেবে লম্পট আমাকে বাঁধবার চেষ্টা করবে।

চোখের জল মুছে বলি—আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। আমায় একটু বিশ্রাম নিতে দিন।

'নিশ্চয়। নিশ্চয়। আপনি আরাম করুন। আমি বসে আছি।'

'না। আপনি দয়া করে আসুন। নইলে আমি আরাম করতে পারব না।'

'ভালো কথা, আপনি আরাম করুন। আমি সন্ধেবেলা এসে দেখে যাবো।'

'আজ্ঞে না, আপনাকে কষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই।'

'বেশ, আমি না হয় কাল আসবো। হয়তো মহারাজাও আসতে পারেন।'

'না, আপনারা আমার ডেকে পাঠানোর জন্য অপেক্ষা করবেন। না ডাকলে আসবেন না যেন।'

এই বলে আমি উঠে শোয়ার ঘরে ফিরে আসি। ভুবন মুহূর্ত খানিক আমার দিকে চেয়ে থাকেন, তারপর নিঃশব্দে ফিরে যান।

বোন, এ ঘটনা দুদিন হলো ঘটেছে। কিন্তু আমি আর ঘর থেকে বেরোই নি। ভুবন বার দুই-তিন এসে গেছেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা করা অস্বীকার করেছি। এরপর হয়তো তাঁর আর আসার সাহস হবে না। ঈশ্বর এক অভূত-পূর্ব মুহূর্তে আমায় সুবুদ্ধি দিয়েছেন, নইলে এতক্ষণ আমি নিজের সর্বনাশ করে বসতাম। বিনোদ প্রায় আমার পাশে বসে থাকে। কিন্তু, তার সঙ্গে কথা বলতে আমার ইচ্ছে করে না। যে পুরুষ ব্যভিচারের দার্শনিক সিদ্ধান্তকে সমর্থন করতে পারে, যার দৃষ্টিতে বিবাহের মত পবিত্র বন্ধনের কোন মূল্য নেই, যে আমার হতে পারে না, আমাকে আপন করতে পারে না, তার সঙ্গে আমার মত অহঙ্কারী মানিনী স্ত্রীর ক'দিন আর অতিবাহিত হতে পারে।

এখন বিদায় নিচ্ছি। বোন, ক্ষমা করো। তোমার অনেক অমূল্য সময় আমি নিলাম। কিন্তু মনে রেখো, তোমার দয়া নয়, কিছুটা সহানুভূতির আকাঙ্ক্ষী আমি।

তোমার পদ্মা

॥ ১০ ॥

কাশী

৫-১-২৬

প্রিয় বোন,

তোমার চিঠি পড়ে আমার এমন মনে হচ্ছে যেন কোন উপন্যাস পড়ে উঠলাম। যদি তুমি উপন্যাস লেখো, আমার ধ্রুব বিশ্বাস, একটা হৈ-চৈ ফেলতে পারবে। তুমি নিজেই তার নায়িকা হও। তুমি এতসব কথা কোথেকে শিখলে, আমি পড়তে পড়তে আশ্চর্য হয়েছি। সেই বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে একা কি

করে কথা বললে, আমার বুদ্ধিতে তা কুলোল না। আমি কক্ষণো তা পারতাম না। তুমি বিনোদকে ক্ষেপাতে চাইছো, তার মনকে অস্থির করতে চাইছো। হায়! সেই অসহায় লোকটার সঙ্গে তুমি ভয়ানক অন্যায় করছো। আচ্ছা, তুমি ভাবছো কেন—বিনোদ তোমাকে উপেক্ষা করছে। সে নিজের চিন্তা-ভাবনায় এমন মগ্ন যে তোমার দিকে নজর রাখার খেয়াল থাকে না। এটাও হতে পারে, কোন মানসিক চিন্তা তাকে খুব কাতর করে তুলেছে, কিংবা কোন সমস্যা তাকে ঘিরে ধরেছে যার ফলে জীবনের সাধারণ বিষয়ে তার কোন আগ্রহ বা রুচি নেই। এও সম্ভব, সে হয়তো কোন দার্শনিক তত্ত্বের খোঁজ করছে, বা কোন থিসিস লিখছে, কিংবা কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করছে। কে বলতে পারে? তোমার মত রূপসী স্ত্রী লাভ করে কেউ যদি চিন্তিত থাকে, তাহলে ধরে নেওয়া যায়—নিশ্চয়ই তার মনে বিশাল কোন ভার আছে। তার এখন প্রয়োজন তোমার সহানুভূতি। তুমিই একমাত্র তার ভার হাল্কা করতে পারো। তা না করে, উল্টে তুমিই তাকে দোষ দিচ্ছ। আমার বুদ্ধি অনুসারে তোমার উচিত, বিনোদের সঙ্গে একদিন খোলাখুলিভাবে কথা বলে নেয়া। যত দূর সম্ভব, সন্দেহকে দূর করে ফেলা দরকার। সন্দেহ সেই ধরনের ক্ষত, যার চিকিৎসা তাড়াতাড়ি না হলে পেকে যাওয়ার সম্ভাবনা; তারপর আর সেরে ওঠে না। দু-চারদিনের জন্যে তুমি এখানে এসে থেকে যাওনা কেন? তুমি হয়তো বলতে পারো, আমিই তোমার কাছে আসি না কেন। কিন্তু, আমি তো আর স্বাধীন নই, শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে জিজ্ঞেস না করে কোন কাজ করতে পারি না। তোমার তো কোন বন্ধন নেই।

ইদানীং আমার জীবন আনন্দ ও শোকের মিশ্রণে কাটছে। একা থাকলেই কাঁদি, আনন্দ বাড়ি এলে হাসি! কিন্তু রাত বারোটার আগে তার দেখা পাওয়া ভার। একদিন দুপুরে এসে হাজির, কি বলবো, শ্বাশুড়ী তাকে এমন বকুনি দিল যা কোন বাচ্চা ছেলেকেও দেয় না। আমার ভয় হয়, শ্বাশুড়ী হয়তো আমার ওপর রুষ্ট আছেন। আমি তাকে সবসময় প্রসন্ন রাখার চেষ্টা করি। যে-সব কাজ কখনও করিনি, সে-সব কাজও তার জন্য এখন করছি। তাঁর স্নানের জন্য জল গরম করি, তাঁর পুজোর আসন পাতা থেকে সব আয়োজন করি। স্নান করার পর তাঁর ধুতি কেচে দিই, শুয়ে থাকলে তাঁর পা টিপে দিই; যখন শুয়ে পড়েন, তাঁকে পাখা করি। তিনি আমার মাতৃসমা। তাঁর গর্ভ থেকে সেই রত্ন উৎপন্ন হয়েছে, যে আমার প্রাণাধার। আমি তাঁকে সেবা করতে পারবো, এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আমার পক্ষে আর কি হতে পারে। আমি শুধু এটুকু চাই, তিনি আমার সঙ্গে হেসে কথা বলুন, কিন্তু কেন জানি না, কথায়-কথায় তিনি আমাকে নিন্দে-মন্দ

করেন। হয়তো আমারই দোষ। তবে সেটা কি, এ আমার জানা নেই। আমার অপরাধ বলতে, আমি কেন ননদদের তুলনায় বেশী সুন্দরী, কেন লেখা-পড়া জানি, কেন আনন্দ আমায় এত ভালবাসে—এই যদি হয়, তাহলে বন্ধু, আমার কিছু করার নেই। এ আমার বশের বাইরে। আমার প্রতি শ্বাশুড়ীর এ ধরনের ব্যবহার দেখে আনন্দ প্রায়শঃ মার ওপর কিছুটা অখুশী থাকে। শ্বাশুড়ীর হয়তো ভুল ধারণা হয়েছে, বুঝিবা আনন্দকে আমি বিগড়ে দিচ্ছি। হয়তো তিনি পশ্চাত্তাপ করেন যে কেন আমাকে বৌ করে এনেছেন। তাঁর ভয় হয়, বুঝি বা আমি ছেলেকে তার সংসার থেকে ছিনিয়ে নেবো। দু-একবার আমায় যাদু-টোনার মায়ার কথাও বলেছিলেন। ননদ দুজন অকারণেই আমার ওপর রেগে-জ্বলে থাকে। বড় ননদ বিধবা, তার রাগ করার ব্যাপারটা বুঝতে পারি। কিন্তু ছোট ননদ এখনও কুমারী, তার রাগ করে থাকাটা বুঝতে পারি না। আমি যদি তার জায়গায় হতাম, তাহলে বৌদির কাছ কিছু শেখা, কিছু পড়ার চেষ্টা করতাম, তার চরণ ধুয়ে জল খেতাম। তা না করে, ঐ মেয়ে আমায় অপমান করে আনন্দ পায়। আমার বিশ্বাস, কয়েকদিনের মধ্যে দুই ননদ-ই লজ্জা পাবে। এখনও আমার প্রতি অপ্রসন্ন। আমার নিজের তরফ থেকে তাদের অখুশী করার কোন সুযোগ দিই না।

কিন্তু রূপ নিয়ে কি করি, বলতো? জানা ছিল না, একদিন এই রূপের জন্যই আমি অপরাধিনী ঠাওরাবো। সত্যি বলছি পদ্মা, আমি এখানে সাজগোজ-প্রসাধন করা এক রকম প্রায় ত্যাগ করেছি বলা চলে। ময়লা অপরিষ্কার থাকি। আমার লেখা-পড়া নিয়ে পাছে কেউ ভ্রূকুটি করে, এই ভয়ে আমি বই পর্যন্ত ছুঁয়ে দেখি না। বাড়ি থেকে আসার সময় বইয়ের একটা বাণ্ডিল বেঁধে এনে ছিলাম। তাতে বেশ কয়েকটা সুন্দর-সুন্দর বই আছে। সেগুলো পড়ার জন্য বার-বার ইচ্ছে হয়, কিন্তু ভয় হয়, পাছে কেউ আবার কথা না শোনায়। ননদ দুজন আমায় চোখে-চোখে রাখে, আমি কি করি, কি ভাবে বসি, কি ভাবে কথা বলি—যেমন দু-দুটো গোয়েন্দা আমার পেছনে লাগিয়ে রেখেছে? এই দুজন মহিলা যে আমার পেছনে লেগে কি মজা পায়, বলতে পারবো না। এ ছাড়া ওদের এখন অন্য কোন কাজ নেই। মাঝে মাঝে এমন রাগ ধরে, ইচ্ছে হয়—দু-চারটে শক্ত কথা শুনিয়ে দিই, কিন্তু মনকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে থেমে পড়ি। এ অবস্থা অনেকদিন ধরেই থাকবে। একজন নতুন লোকের সঙ্গে একাত্ম না হওয়াটা স্বাভাবিক। বিশেষ করে সেই নতুন লোকটি যদি শিক্ষায় বিচারে, ব্যবহারে আমাদের চেয়ে আলাদা হয়। আমাকে ধরো না কেন, এখন যদি কোন ফ্রেঞ্চ লেডির সঙ্গে থাকতে হয়, তাহলে আমিও হয়ত তার

প্রতিটি কথা সমালোচনা এবং কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখবো। এই কাশীবাসী লোকেরা কিন্তু খুব পূজো-পাঠ করে থাকে। আমার শ্বাশুড়ী রোজ গঙ্গা স্নান করতে যান। বড় ননদও তাঁর সাথে যায়। আমি কখনও পুজো করিনি। মনে পড়ে, আমরা দুজনে কি রকম উপহাস করতাম পুজো যারা করতো। যদি আমি তাদের চরিত্রে কিছুটা উন্নতি দেখতাম, তাহলে হয়তো একদিনে আমিও পুজো শুরু করে দিতাম। কিন্তু, এমন অভিজ্ঞতা আমার কখনও হয়নি। বরং দেখা গেছে যারা কখনো পূজো করে না—তারাও তেমনই অপরের নিন্দামন্দ করে, সেরকমই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করে। যাক্‌, এখন পুজোর প্রতি ধীরে ধীরে আমার শ্রদ্ধা হচ্ছে। আমার দাদাশ্বশুর একটা ছোট মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সেটা আমাদের বাড়ির সামনেই। আমি প্রায়শঃ শ্বাশুড়ীর সঙ্গে সেখানে যাই, এখন এটা প্রকাশ করতে বিন্দুমাত্র সংকোচ নেই যে, সেই বিশাল মূর্তি-দর্শনে আমার অন্তস্তলে এক জ্যোতির অনুভব হয়। যে শ্রদ্ধায় আমি রাম ও কৃষ্ণের জীবন সমালোচনা করতাম, তা অনেকাংশে মিশে গেছে।

কিন্তু রূপসী হওয়ার সাজা এখানেই থেমে নেই। আমার রূপ দেখে ননদেরা যদি ঈর্ষান্বিত হয়—তা স্বাভাবিক। দুঃখ এই কারণে, এই .সাজা আমাকে যে তরফ থেকে পেতে হচ্ছে, সেখান থেকে কোন সম্ভাবনার কারণ ছিল না—আমার আনন্দই আমাকে সেই সাজা দিচ্ছে। তার সাজা দেওয়ার রীতি অবশ্য আলাদা ধরনের! সে রোজ একটা-না-একটা উপহার নিয়ে আসে আমার জন্য। যতক্ষণ আমার কাছে বসে থাকে, তার মনে ক্রমাগত এই সন্দেহ হয় যে, তার উপস্থিতি আমার ভাল লাগে না। তার ধারণা, আমি শুধু 'দেখানোর' জন্য তার সঙ্গে প্রেম করি—এ আমার অভিনয়, চালাকি ছাড়া কিছু নয়। সে আমার কাছে কিছুটা সঙ্কুচিত, কিছুটা অস্বস্তি অনুভব করে, ফলে লজ্জায় আমি মরে যাই। আমাকে কোন কথা বলতে এমন সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে, যেন সে কোন অনধিকার চর্চা করছে। ময়লা-নোংরা কাপড়-পরা কোন লোক যেমন উজ্জ্বল বস্ত্র পরিহিত লোকের কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে চায়—তার অবস্থা কিছুটা সে রকম। সে হয়তো মনে করে, কোন রূপসী স্ত্রী তার রূপহীন স্বামীকে ভালবাসতে পারে না। হয়তো মনে-মনে পরিতাপ করে, কেন যে আমার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। হয়তো কিছুটা গ্লানিও হতে পারে। আমাকে যদি কখনও কাঁদতে দেখে, মনে-মনে ভাবে আমি বুঝি নিয়তি ভেবে কাঁদছি। কোন চিঠি লিখছি দেখতে পেলে ভাবে, আমি বুঝি তার রূপহীনতা নিয়ে সাতকাহন লিখছি। কি বলবো বোন, এই সৌন্দর্য এখন আমার বুকের সাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আনন্দের মন থেকে এই

আশঙ্কা দূর করার জন্য, তাকে আমার তরফ থেকে আশ্বাস দেয়ার জন্য, আমায় এমন সব কথা বলতে হয়, এমন সব আচরণ করতে হয়—নিজের ওপর প্রচণ্ড ঘৃণা হয়। যদি জানতাম এরকম অবস্থা হবে, তাহলে ঈশ্বরকে বলতাম—আমায় কুরূপা করে দিও। দারুণ সংকটে কাটাচ্ছি। যদি শ্বাশুড়ীর সেবা না করি, বড় ননদের মন রেখে কাজ না করি, তাহলে তাদের চোখ থেকে পতিত হবো। আবার আনন্দবাবুকে যদি নিরাশ করি, তাহলে হয়তো বিরক্ত হয়ে সরে যাবে। তোমাকে আমি মনের কথা বলছি। বোন, তোমার কাছে কিছু লুকোচ্ছি না, সত্যি বলতে কি আনন্দবাবুকে আমি তেমন ভালবাসি, যেমন একজন স্বামীকে স্ত্রী ভালবেসে থাকে, তার পরিবর্তে স্বর্গের রাজা ইন্দ্র হাজির হলেও আমি তার দিকে চোখ তুলেও দেখবো না। কিন্তু, এ কথা তাকে বিশ্বাস করাই কি করে? লক্ষ্য করি, সে নানান অজুহাতে বার বার বাড়ি আসে এবং চাপা লোভী দৃষ্টিতে আমার ঘরের দরজার দিকে বার বার দেখতে থাকে। তখন ইচ্ছে করে, বেরিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে ঘরের ভেতর টেনে আনি। কিন্তু ভয় হয়, কারো চোখে পড়লে বুক দাপড়ানো শুরু হয়ে যাবে। আরো ভয় হয়, পাছে আনন্দ এটাকে না-আবার অভিনয় ভেবে বসে। এখন তার উপার্জন খুব কম, কিন্তু দু-চার টাকা রোজই উপহারের পেছনে খরচ করে থাকে। ভালোবাসার উপহার হিসেবে যদি সে কাণা-কড়ির জিনিস দেয়, তা আমি বুকে জড়িয়ে নেবো, কিন্তু এসব উপহার সে কর-স্বরূপ দিয়ে থাকে, যেন ঈশ্বর তাকে এই সাজা দিয়েছে। কি করি বলো, এখন আমায় দেখছি প্রেমের অভিনয় করতে হবে। এ ধরণের ব্যবহার আমি বড় অপছন্দ করি। তোমার হয়তো মনে আছে, আমি একবার বলেছিলাম প্রেম হয় অন্তঃমনে থাকবে, নয় বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। একই সঙ্গে সমানভাবে ভেতরে—বাইরে দু-জায়গায় থাকতে পারে না। অভিনয় বেশ্যাদের প্রয়োজন পড়ে, কিন্তু গৃহবধূর প্রেম তার হৃদয়ে সঞ্চিত থাকে।

প্রিয় বোন, ক্ষমা করো, কাল চিঠি লেখার আর অবসর পাইনি। রাত্রে এমন এক ঘটনা ঘটে গেল, যার ফলে মন-মেজাজ দুই খারাপ। অনেক করে কিছুটা সময় বার করেছি। অদ্যাবধি আমি আনন্দের বাড়ির কোন প্রাণীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিনি। শ্বাশুড়ী হয়তো কটু কথা বলেছেন, ননদ ঠেস মেরে কথা বলেছে—তা বলে কি আমি আনন্দের কানে তুলেছি—এ নিয়ে গৃহ-কলহ ছাড়া আর কিই বা হতে পারে। এই সব সামান্য ব্যাপার যদি ধরে না রাখা যায়, তাহলে সংসার ছারখার হয়ে পড়ে ; নিজেদের মধ্যে ফাটল ধরে। দুর্ভাগ্যবশতঃ কাল আমারই মুখ থেকে এমন কথা বেরিয়ে পড়ে, যার জন্য এখনও আমি নিজেকে

বার বার শাপান্ত করছি, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি—যেন ব্যাপারটা আর বেশী দূর না গড়ায়। কাল রাত্তে আনন্দবাবু বেশ দেরি করে আমার ঘরে ঢোকে। আমি তার প্রতীক্ষায় থেকে বই পড়ছিলাম। সহসা শ্বাশুড়ী এসে জিজ্ঞেস করেন—এখনও বাতি জ্বলছে যে! সারারাত যদি না আসে, তুমিও কি সারারাত বাতি জ্বালিয়ে রাখবে?

সঙ্গে সঙ্গে আমি বাতি নিভিয়ে দিই। আনন্দবাবু কিছুক্ষণ পরেই আসে। তখন ঘর অন্ধকার, আমার যে কি মতি হলো! যদি তার পায়ের শব্দ পেয়ে উঠে বাতি জ্বালিয়ে দিতাম, তাহলে কিছুই ঘটতো না। কিন্তু আমি অন্ধকারে চুপচাপ পড়ে থাকি। সে জিজ্ঞেস করল—শুয়ে পড়েছো—অন্ধকার হয়ে আছে কেন?

হায়! সেই মুহূর্তে যদি বলে দিতে পারতাম—এইমাত্র আমি বাতি নিভিয়ে শুয়েছি। তাহলে আর কথা এগুতো না। কিন্তু আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়ে—শ্বাশুড়ীর হুকুম বাতি নিভিয়ে দাও, তাই আমি নিভিয়ে দিয়েছি। তুমি যদি সারারাত না আসো, তাহলে কি সারারাত বাতি জ্বলবে?

'বেশ তো. এখন জ্বালিয়ে দাও। আমি বাইরে আলো থেকে আসছি। অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না।'

'আমি আর সুইচে হাত দেবো না—দিব্যি গেয়েছি। দরকার হলে মোমবাতি ধরিয়ে নেবো। মিছিমিছি কথা শুনতে রাজী নই।'

আনন্দ বাতির সুইচ অন করে বলে—বেশ, আমিও তাহলে দিব্যি গালছি—সারারাত ঘরের বাতি জ্বালানো থাকবে। কারুর ভালো লাগুক বা মন্দ লাগুক। হুঁ, সব কিছুই আমার চোখে পড়ে, অন্ধ তো আর নই। অন্য বউ এসে কেমন সেবা করে, বেঁচে থাকলে তাও চোখে দেখবো। তোমার ভাগ্য খারাপ, নইলে এ সংসারে এলে কি করে! অন্য কোন শ্বাশুড়ীকে যদি এত যত্ন-ভক্তি করতে, তাহলে তোমায় মাথায় করে রাখতো, খুশীতে ভরে দিতো. কিন্তু এখানে খাটতে খাটতে মুখ দিয়ে রক্ত উঠুক না কেন, কারো মুখ দিয়ে ভাল করে কথাটুকুও বার হয় না।

আমার ভুল এখন স্পষ্ট বুঝতে পারি। তার রাগ ঠাণ্ডা করার জন্য বলি—ভুল আমারই, মিছিমিছি মাঝরাত অব্দি বাতি জ্বালিয়ে বসে আছি। মা আমাকে বাতি নেভাতে বলেছেন—এমন কি অন্যায় বলেছেন। আমাকে বোঝানো, আমাকে ভালো ব্যাপারটা শেখানো তাঁর ধর্ম! আমারও ধর্ম যথাশক্তি তাঁর সেবা করা, তার শিক্ষা অনুসরণ করা।

আনন্দ মুহূর্তখানিক দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে—'আমি

বেশ বুঝতে পারছি, এ বাড়িতে আমার আর থাকা চলবে না, তুমি আমায় বলো না বটে, কিন্তু আমি সব শুনতে পাই। সব বুঝতে পারি। তোমাকে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে। আমি কালকেই মাকে পরিষ্কার বলে দেবো—তোমার যদি এ রকম ব্যবহার থাকে, তাহলে রইলো তোমার ঘর-সংসার, আমি নিজের আলাদা উপায় বার করে নেবো।'

আমি হাতজোড় করে কাঁদ-কাঁদ গলায় বলি—'না, না। এমন কাজ কক্ষণো করো না। আমার মুখে আগুন, কেন যে আমি 'বাতির কথা তুলতে গেলাম। তোমার পা ধরে বলছি—শ্বাশুড়ী ননদের ওপর আমার কোন অভিযোগ নেই। তাঁরা দু'জনেই বয়সে বড়, মাতৃতুল্য তাঁরা। যদি কোন কটু কথাও বলে থাকেন, আমার রাগ করা উচিত নয়। তুমি তাঁদের কিছু বলো না, বললে কিন্তু আমি ভয়ানক দুঃখ পাবো।'

আনন্দ কণ্ঠরুদ্ধ স্বরে বলে—'তোমার মত বৌ পেয়েও মার মন ভেজে না, তবে কি স্বর্গের দেবী এসে হাজির হবে? তুমি ভয় পেও না, আমি খামোকা ঝগড়া বাঁধাবো না। তবে তাঁদের আমি বলবো—মেজাজটা যেন শান্ত রাখে। আজ যদি আমি দু-চারশ টাকা বাড়াতে পারতাম তাহলে কেউ টু শব্দটিও করতো না, উপায় করে কিছু আনতে পারি না বলেই এই সাজা পেতে হচ্ছে। সত্যি বলতে কি, আমার বিয়ে করার কোন অধিকার নেই। আমার মত মন্দবুদ্ধির লোকেরা একটা পয়সাও ঘরে আনতে পারে না, নিজের সঙ্গে কোন মহিলাকে ডুবোবার কি অধিকার ছিল, বলো? দিদির মনে যে কি আছে, জানি না, কেন যে তোমার পেছনে লেগে থাকে। শ্বশুরবাড়ী শেষ করে এসেছে, এখন এখানেও আগুন লাগাবার চেষ্টা। বাবাকে মান্য করি, নইলে একদিনেই দিদিকে ঠিক করে দিতে পারি।'

বোন, তখন তাকে কোন রকমে শান্ত করি, কিন্তু বলা যায় না কখন আবার ফেটে পড়ে। আমার জন্য সে সকলের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে বসতে পারে। আমি যে কি রকম পরিস্থিতিতে আছি, তুমি তার কিছুটা অনুমান করতে পারবে। আমার প্রতি যতই আঘাত আসুক না কেন, আমার কাঁদা উচিত নয়, জিভ পর্যন্ত নড়ানো উচিত নয়। যদি আমি কাঁদি, এই সংসার ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। আনন্দ আর কোন কথা শুনবে না, কিছু দেখবে না। হয়তো এই ধরনের পরিসমাপ্তিতে, তার ধারণা আমার হৃদয়ে প্রেমের অঙ্কুর জাগাতে পারে। আজ আমি বুঝতে পারি, সে ভয়ানক রাগী, এক রোখা। যদি আমি একটু সমর্থন করতাম, সেই রাতেই শ্বাশুড়ীর সঙ্গে তুলকালাম করে ছাড়তো। অনেক যুবতী এই অধিকার গর্বে

নিজেকে ভুলে যায়। আমি, ঈশ্বর না করেন, কখনও তা যেন না হই। আনন্দ আলাদা সংসার পাতবে, চলবে কি করে—এ নিয়ে আমার চিন্তা বা ভয় নেই। আমি তার সঙ্গে সব কিছু সহ্য করতে পারি। কিন্তু সংসার যে ছারখার হয়ে যাবে।

পদ্মা, আজ এই পর্যন্ত। চিঠির জবাব তাড়াতাড়ি দিও। ইতি—

তোমার চন্দ্রা

দিল্লী

৫-২-২৬

প্রিয় চন্দ্রা,

কি লিখি তোমায়, আমাব মাথায় যে বিপদের পাহাড় ভেঙে পড়েছে। হায়, সে চলে গেছে। আজ তিনদিন যাবৎ বিনোদের কোন খবর নেই—মোহহীন সে চলে গেছে, কোন কিছু না-বলে না-শুনে আমায় ছেড়ে চলে গেছে—এখনও কাঁদি নি আমি। যারা তার খোঁজ করতে আসে, তাদের অজুহাত করে বলে দিই—দু-চার দিনে ফিবে আসবে, একটা জরুরী কাজে কাশী গিয়েছে। কিন্তু কাঁদতে শুরু করলে এই শরীর কান্নায় ডুবে যাবে। এই অশ্রুনদীতেই প্রাণ বিসর্জিত হবে। সে আমাকে কিছু বলে যায় নি, রোজকার মত উঠেছে, খাবার খেয়েছে, তারপর কলেজ গেছে, ঠিক সময়ে রোজকার মত হেসে আমার কাছে এসেছে। আমরা দুজনে জলখাবার খেয়েছি, তারপর সে খবরের কাগজ নিয়ে পড়তে বসেছে, আমি টেনিস খেলতে চলে গেছি। ইদানীং, কয়েক দিন ধরে টেনিসের প্রতি তার তেমন আগ্রহ ছিল না, আমি একাই খেলতে যেতাম। ফিরে এসে, তাকে রোজকার মত বারান্দায় সিগার টানতে টানতে পায়চারি করতে দেখি। আমায় দেখতে পেয়ে রোজকার মত সে ওভারকোট নিয়ে আসে, তারপর আমার গায়ে জড়িয়ে দেয়। বারান্দা থেকে নীচে নেমে আমরা দুজন খোলা মাঠে কিছুক্ষণ পায়চারি করি। কিন্তু সে বেশী কথা বলে না। কিসের ভাবনায় মগ্ন থাকে। শিশির পড়তে শুরু করলে আমরা দুজনে আবার ফিরে আসি। ভেতরে গিয়ে বসি। ঠিক সেই সময়ে সেই বাঙালী ভদ্রমহিলা এসে হাজির হলেন, তাঁর কাছে আমি ইদানীং বীণাবাদন শিখছিলাম। বিনোদও আমার পাশে বসে ছিল। সঙ্গীতে তার যে রুচি আছে, সে-কথা আমি তোমায় লিখেছিলাম। কোন নতুন কথা আর হয় না। ভদ্রমহিলা চলে যাবার পর আমরা একসঙ্গে রাতের খাবার খাই, তারপর আমি নিজের ঘরে শুতে যাই। সে রোজকার মত নিজের ঘরে

লেখাপড়া করতে চলে যায়। আমি তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ি কিন্তু সে যখন আমার ঘরে ফিরে আসে, হঠাৎ আমার চোখ খুলে যায়। যতই গভীর ঘুমে আমি থাকি না কেন, তার শব্দ পেতেই চোখ আপনা থেকেই খুলে যায়। দেখি, সে তার সবুজ শাল গায়ে জড়িয়ে আছে। তার দিকে আমি হাত এগিয়ে দিয়ে বলি—এই শোনো, দাঁড়িয়ে আছো কেন, এসো। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ি। জানো বোন, সেটাই আমার শেষ দেখা। জানিনা, সে খাটে এসে শুয়েছিল কিনা। এই চোখ দুটিতে না-জানি কোন্ মহানিদ্রা এসে জমেছিল। ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠি, বিনোদকে কাছে পাই না। শালও নেই। ভাবলাম হয়তো নিজের ঘরে গেছে। বাথরুমে যাই। আধ ঘণ্টা পরে বাইরে বেরোই, তবু তাকে দেখা যায় না। তার ঘরে ঢুকি, না, সেখানেও সে নেই। আশ্চর্য হই, এত সকালে গেল কোথায়? সহসা আলনায় চোখ পড়ে—সেখানে তার পোশাক নেই। কারো সঙ্গে দেখা করতে গেল নাকি? নাকি, স্নান করার আগে বেড়াতে যাবার ইচ্ছে হয়েছে। অন্ততঃ আমাকে বলে যেতে পারতো, তাহলে মিছিমিছি সংশয়ে কাটাতে হতো না। রাগে শরীরে জ্বলতে শুরু করে—আমায় দাসী ভেবেছে নাকি···

টেবিলে হাজির হবার সময় হয়। বেয়ারা টেবিলে চা রেখে যায়। বিনোদের প্রতীক্ষায় চা ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। আমি বার বার বিরক্ত বোধ করতে থাকি। কখনও ভেতরে যাই, কখনও বাইরে আসি। ঠিক করে নিই, আজ সে যেই ফিরবে, এমন ঝগড়া শুরু করবো যে সেও মনে রাখবে। আজ স্পষ্ট বলে দেবো, তুমি নিজের ঘর সামলাও। তোমার সংসার তোমার মাথায় থাকুক, আমি বাপের বাড়ি চলে যাবো। সেখানে একরকম দিন গুজরানো চলবে। শীতকালে ন'টা বাজতে আর কত দেরি লাগে! বিনোদের তখনও কোন খবর নেই। রেগে-মেগে ঘরে ঢুকি, ভাবি একটা চিঠি লিখে টেবিলে রেখে দিই—স্পষ্ট করে লিখে দিই, যদি এভাবে থাকতে হয়, আপনি থাকুন, আমি থাকতে পারবো না। আমি যতই ছাড় দিই, তুমি ততই আমার ওপর হম্বি-তম্বি করো। বোন, সেই রাগের সময় সন্তপ্ত ভাবনার নদীর মত মনের ভেতর ফুলে ফুলে আছড়ে পড়ছিল। যদি লিখতে বসতাম, তাহলে হয়তো পাতার পর পাতা লিখে ফেলতাম। কিন্তু, আহা! আমি চলে যাবার ভয় দেখাচ্ছিলাম, অথচ তার আগেই সে চলে গেছে। টেবিলের ধারে যেই গিয়ে বসেছি অমনি তার প্যাডে একখানা চিঠি দেখতে পাই। তাড়াতাড়ি সেই চিঠিটা টেনে বার করি, দ্রুত অস্থির দৃষ্টিতে আগাগোড়া পড়ে ফেলি, আমার হাত কাঁপতে থাকে, পা থরথর করতে শুরু করে, মনে হয় ঘর যেন দুলতে শুরু করেছে। একটা

হিম-শীতল, দীর্ঘ হৃদয় চিরে ফেলার মত আর্তনাদ করে সোফার ওপর এলিয়ে পড়ে যাই। চিঠিতে লেখা ছিল—

প্রিয়তম, ন মাস আগে তোমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সৌভাগ্য ঘটেছিল। তখন আমি নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম। আজ তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদের দুর্ভাগ্য বয়ে আনছে, তবুও আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। এখান থেকে সরে যাবার বিন্দুমাত্র দুঃখ আমার নেই, কেননা জানি তুমি সুখী হবে। তুমি যখন আমার সঙ্গে সুখী থাকতে পার না, কেন আমি জোর করে এখানে পড়ে থাকবো। এর চেয়ে আমি আর তুমি আলাদা হয়ে যাওয়াটা অনেকগুণ শ্রেয়। আমি যেমন আছি, তেমনই থাকবো। তুমিও যেমন আছো, তেমনই থাকবে। তাহলে সুখী জীবনের সম্ভাবনা কই! বিয়েটাকে আমি আত্মবিকাশের সাধন মনে করি। স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কে যদি কোন অর্থ থাকে, তাহলে এটাই একমাত্র অর্থ, নইলে বিবাহের কোন প্রয়োজন মনে করি না। মানব-সন্তান বিবাহ ছাড়া জীবিত থাকতে পারে, হয়তো এর চেয়ে ভালভাবে। কামনা-বাসনাও বিয়ে না করে পূরণ করা যায়, ঘর-সংসারের ব্যবস্থার জন্য বিয়ে করাটা তেমন প্রয়োজনীয় নয়। জীবিকা একটা নিতান্ত গৌণ প্রশ্ন। ঈশ্বর যাকে দুই হাতে দিয়েছেন, সে কখনও না-খেয়ে থাকতে পারে না। বিবাহের উদ্দেশ্য, একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, স্ত্রী-পুরুষ একে অপরের আত্মোন্নতির সহায়ক হোক। যেখানে অনুরাগ আছে, সেখানেই বিবাহ, এবং অনুরাগই আত্মোন্নতির মুখ্য সাধন। যদি অনুরাগ না থাকে, তাহলে বিবাহও থাকে না। অনুরাগ ছাড়া বিবাহের কোন অর্থ থাকে না।

যে মুহূর্তে আমি তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম, অনুরাগের সজীব মূর্তির মত তুমি আমায় দেখা দিয়েছিলে। তোমার মাঝে সৌন্দর্য ছিল, শিক্ষা ছিল, প্রেম ছিল, উৎফুল্লতা ছিল, উজ্জ্বলতা ছিল। আমি বস্তুতঃ মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। সে সময় আমার অন্ধ চোখে এ ধরা পড়েনি, যেখানে তোমার এত গুণের সমাহার, সেখানে যে চঞ্চলতাও আছে—যা এইসব যাবতীয় গুণকে আড়াল করে দিতে পারে। তুমি চঞ্চল, অদ্ভুত চঞ্চল—যা সে সময় আমার চোখে ধরা পড়েনি। তুমি ঠিক সে রকমই, যেমন তোমার অন্যান্য বোনেরা—না কম, না বেশি। আমি তোমাকে স্বাধীন করতে চেয়েছিলাম, কেননা আমার ধারণায় নিজের পরিপূর্ণ উচ্চতায় পৌঁছনোর জন্য এরই প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। গোটা পৃথিবীতে পুরুষদের বিরুদ্ধে এত আলোড়ন কেন? কেননা, আমরা স্ত্রীদের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছি, এবং তাদের আমরা নিজেদের ইচ্ছা-অভিলাষের দাসী তৈরি করে রেখেছি। আমি তোমায় স্বাধীন করে দিয়েছি। তোমার ওপর আমার আর কোন অধিকার নেই।

তুমি নিজেই তোমার কর্ত্রী। যতদিন আমি ভেবেছি তুমি আমার সঙ্গে স্বেচ্ছায় আছো, আমার কোন চিন্তা ছিল না। এখন আমি টের পাচ্ছি, স্বেচ্ছায় নয়, তুমি সংকোচে বা ভয়ে বা বন্ধনের কারণে আমার সঙ্গে আছো। দিন কয়েক আগে এ ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট ধরা পড়ে। এই কারণে আমি এখন তোমার সুখের পথে বাধা দিতে চাই না। আমি অবশ্য পালিয়ে কোথাও যেতে চাই না। কেবল তোমার পথ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি, এবং এত দূরে সরে যাচ্ছি যাতে আমার তরফ থেকে তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারো। যদি আমায় বাদ দিয়ে তোমার জীবন আরও সুন্দর হয়ে ওঠে, আমি তোমায় আটকে রাখতে চাই না। যদি আমি বুঝতাম, তুমি আমার সুখের পথে বাধা হয়ে আছো, তাহলে আমি স্পষ্ট করে বলে দিতাম, ধর্ম ও নীতির ছল-চাতুরী আমি সমর্থন করি না, শুধু আত্মা সন্তুষ্ট রাখতে চাই—নিজের জন্য, তোমার জন্যও। জীবনের তত্ত্ব এটাই, মূল্যও এটাই। ডেস্কের ওপর আমাদের ডিপার্টমেন্টের প্রিন্সিপালের নামে একটা চিঠি লিখে রেখেছি। তার কাছে সেটা পাঠিয়ে দিও। টাকার কোন চিন্তা করো না। আমার অ্যাকাউণ্টে এখনও এত টাকা আছে, যা তোমার অন্ততঃ ক'মাসের জন্য যথেষ্ট; এবং টাকাটা ততদিন পাবে, যতদিন তুমি নিতে চাইবে। আমি মনে করি, আমার বক্তব্য স্পষ্ট করে বলতে পেরেছি। এর চেয়ে স্পষ্ট আমি বলতে চাই না। যদি তোমার ইচ্ছে হয় আমার সঙ্গে দেখা করার, ব্যাঙ্কে আমার ঠিকানা খুঁজে নিও। কিন্তু দু-চারদিন পর। চিন্তিত হবার কারণ নেই। আমি নারীকে অবলা বা অসহায় মনে করি না। তারা নিজের রক্ষা নিজেরাই করতে পারে—যদি করতে চায়। যদি এখন বা আজ থেকে দু-চার মাস, বা দু-চার বছর পরে আমার কথা তোমার মনে পড়ে, এবং তুমি যদি মনে করো আমার সঙ্গে সুখী থাকতে পারো, তাহলে আমায় শুধু দু-একটা শব্দে লিখে জানিও। আমি সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আঁসবো, কেন না, তোমার প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই। তোমার সঙ্গে আমার জীবনের যে কটা দিন কেটেছে, তা আমার কাছে স্বর্গ স্বপ্নের দিন। যতদিন বেঁচে থাকবো, এই জীবনের আনন্দ-স্মৃতি হৃদয়ে সঞ্চয় করে রাখবো। আহা! এতক্ষণ ধরে মনকে শক্ত রাখার পর, এই মুহূর্তে চোখ বেয়ে দু-ফোঁটা অশ্রু অবশেষে গড়িয়ে পড়ল। ক্ষমা করো, আমি তোমায় 'চঞ্চল' বলেছি। অচঞ্চল কে আর? জানি, তোমার হৃদয় থেকে আমাকে তুমি বের করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছো, তবুও এই এক ঘণ্টায় তোমাকে যে কতবার দেখে ফিরে এসেছি, ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এসব কথায় আমি তোমার দয়া জাগাতে চাই না। তুমি তাই করেছো, আমার নীতির ওপর যা তোমার অধিকার ছিল, আছে এবং থাকবে। বিবাহ ব্যাপারে আমি আত্মাকে সর্বোচ্চ স্থানে

রাখতে চাই। স্ত্রী এবং পুরুষদের মাঝে আমি সেই প্রেম চাই, যা দুই স্বাধীন ব্যক্তির মাঝে হয়ে থাকে। সেই প্রেম প্রেম নয়—যার আধার পরাধীনতা।

আর কিছু লিখতে চাই না। তোমায় একটা সাবধান-বাণী দেওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু দেব না, কেন না তুমি নিজের ভাল-মন্দ নিজেই বুঝতে পারো। তোমাকে পরামর্শ দেয়ার অধিকার আমার কাছ থেকে তুমি কেড়ে নিয়েছো। তবুও এটা না বলে থাকতে পারছি না, পৃথিবীতে প্রেমের নাটক করার প্রেমিক অভিনেতার অভাব নেই, তাদের কাছ থেকে দূরে সরে থেকো। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, তুমি যেখানেই থাকো, সুখে থেকো। যদি কখনও আমার দরকার পড়ে, স্মরণ করো। তোমার একখানা ছবি অপহরণ করে নিয়ে গেলাম। ক্ষমা করো। এটুকু অধিকার কি আমার নেই? হায়, ইচ্ছে করছে, একবার গিয়ে তোমায় আবার দেখে আসি, কিন্তু যাবো না।

তোমার প্রত্যাখ্যাত

বিনোদ

বোন, এই চিঠি পড়ে আমার মনের যে কি অবস্থা হয়েছে, তা তুমি অনুমান করতে পারো। না, কাঁদিনি, কিন্তু মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। বার বার মন চায়, বিষ খেয়ে শুয়ে পড়ি। দশটা বাজতে এখন বেশি দেরি নেই। আমি তাড়াতাড়ি কলেজে যাই, দর্শন-বিভাগের অধ্যক্ষকে বিনোদের চিঠি দিই। মাদ্রাজী ভদ্রলোক। আমায় শ্রদ্ধাভরে বসান, তারপর চিঠি পড়ে বলেন—আপনি জানেন কি, উনি কোথায় গেছেন, কবে ফিরে আসবেন? চিঠিতে উনি এক মাসের ছুটি চেয়েছেন। আমি মিথ্যে কথা বলি—উনি একটা দরকারি কাজে কাশী গেছেন। তারপর নিরাশ হয়ে ফিরে আসি। আমার অন্তরাত্মা সহস্র জিহ্বা হয়ে আমাকে ধিক্কার দিতে থাকে। ঘরে তার ছবির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে যত অনুতাপভরা শব্দে ক্ষমা চাই, যদি তা কোন প্রকারে তার কাছে গিয়ে পৌছাতো, তাহলে অন্ততঃ জানতে পারতো আমার সম্পর্কে তার কত ভুল ধারণা। সেই থেকে এখন পর্যন্ত আমি কিছু খাইনি, এক মিনিট শুতেও পারিনি। বিনোদ তার সঙ্গে আমার ক্ষুধা-নিদ্রা নিয়ে গেছে, যদি এভাবে পাঁচ-দশদিন তার কোন সংবাদ না পাই, তাহলে প্রাণও বেরিয়ে যাবে। আজ আমি ব্যাঙ্কেও গিয়েছিলাম, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে সাহস হলো না বিনোদের কোনও চিঠি এসেছে কিনা। তারা হয়তো কি ভাববে, তার স্ত্রী হয়ে আমাদের কাছে জানতে এসেছে।

বোন, বিনোদ যদি না আসে, আমার কি হবে? ভাবতাম, সে বুঝি আমার

প্রতি উদাসীন, আমাকে বিন্দুমাত্র কেয়ার করে না, আমার কাছে তার মনের কথা লুকোয়, আমি হয়তো তার কাছে ভার-স্বরূপ। এখন বুঝতে পেরেছি, কি সাংঘাতিক ভুল ধারণা করেছিলাম। তার মন যে এত কোমল, এ যদি জানতাম, তাহলে কি আমি সেদিন ভুবনের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা দেখাতাম। হতভাগার মুখ দর্শন করতে চাই না আর। এই মুহূর্তে যদি ওকে দেখি, হয়তো আমি ওকে গুলি করে বসবো। বিনোদের চিঠিটা তুমি আরেকবার পড়ে দেখো, হুঁ, উনি আমায় স্বাধীন করতে চলেছেন। যদি স্বাধীনই করতে চান, তাহলে ভুবনের সঙ্গে সামান্য কথাবার্তায় এত রাগ কেন? তার এই অবিচলিত শান্তির মুখোশ ব্যবহারে আমার ভয়ানক রাগ ধরে। বস্তুতঃ সামান্য ব্যাপারে তার হৃদয়ে যত অশান্তি সৃষ্টি করে, আমার মাঝে তা করে না। কোন রমণীর প্রতি তার আকর্ষণ দেখে আমি হয়তো মুখ ভার করে থাকতাম, কথা শোনাতাম, কাঁদতাম, তাকেও কাঁদাতাম, কিন্তু এত সহজে পালিয়ে যেতাম না। পুরুষেরা বাড়ি ছেড়ে যে পালিয়ে যায়, আজ অব্দি কখনো শুনিনি। বরং মেয়েরাই বাড়ি ছেড়ে পিতৃগৃহে পালিয়ে যায়, কিংবা ডুবতে যায় কোথাও, কিংবা আত্মহত্যা করে। পুরুষেরা দ্বন্দ্বহীন বসে গোঁফে তা দেয়, কিন্তু আমার এখানে উল্টো ব্যাপার—পুরুষ পালিয়ে গেল। এই অশান্তির তল কে ধরতে পারে? কে বুঝতে পারে এই প্রেমের গভীরতা? যদি এই মুহূর্তে বিনোদের পায়ের কাছে পড়ে মারা যাই, তাহলে মনে করবো, আমি স্বর্গ লাভ করেছি। এছাড়া এখন আমার কোন ইচ্ছা নেই। এই অগাধ-প্রেম আমায় তৃপ্ত করে দিয়েছে। সশরীরে বিনোদ আমার কাছ থেকে দূরে চলে গেছে, কিন্তু আমার হৃদয় থেকে সরে যেতে পারেনি, বরং আমার ধারণায় সে এত কাছাকাছি কখনও ছিল না। আমি এখনও তাকে আমার সামনে বসে থাকতে দেখছি। হুঁ উনি একজন বড় ফিলসফার হতে চলেছিলেন? কোথায় গেল তোমার দার্শনিক গভীরতা? নিজেকে এভাবে প্রতারণা করছো তুমি? নাকি, আত্মাকে সংকুচিত করছো? এবারে তুমি পালিয়ে গেছ বটে কিন্তু এরপর পালালে দেখবে। তুমি যে এত চতুর, বহুরূপী—জানা ছিল না আমার। এবার বুঝতে পেরেছি, হয়তো তোমার দার্শনিক গভীরতাও বুঝতে পারবে—প্রেম যত খাঁটি, যত আন্তরিক হয়, ঠিক তত কোমল হয়। সে বিপদের উন্মত্ত সমুদ্রে ঢেউয়ের আছাড় খেতে পারে; কিন্তু অবহেলার সামান্যতম আঘাত সহ্য করতে পারে না। বোন, ব্যাপারটা বিচিত্র, সত্যি, আমি এ সময়ে আপন অন্তঃস্থলে যতখানি উচ্ছলতা, যতখানি আনন্দ অনুভব করছি, মনে পড়ে না বিনোদের হৃদয়ে জড়িয়েও এমন কখনও পেয়েছে কিনা। তখন একটা আড়াল

ছিল মাঝখানে, এখন সেই আড়াল আর নেই। তার প্রচলিত প্রেম-ব্যবহার আমি কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখতে চাইছিলাম। এটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে, পুরুষ বাড়িতে ফিরলেই স্ত্রীর জন্য কিছু-না কিছু উপহার আনবে। যে পুরুষ রাতদিন স্ত্রীর জন্য গহনা গড়ায়, পোশাক তৈরি করায়, লেস ফিতে টয়লেট কেনায় ব্যস্ত থাকে, তার বিরুদ্ধে স্ত্রীর তরফ থেকে কোন অভিযোগ নেই ; সে একেবারে আদর্শ পতি, তার প্রেমে কার সন্দেহ হতে পারে? কিন্তু সেই প্রেয়সীর মৃত্যুর তিন মাস যেতে না যেতে আবার নতুন বিয়ে করে বসে। স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রেম চিতায় পুড়িয়ে আসে। আবার সেই একই অভিনয় এই নতুন প্রেয়সীর সঙ্গে ঘটতে থাকে, আবার সেই একই লীলা শুরু হয়। আমি সেই প্রেম লক্ষ্য করছিলাম, তাই কাষ্টপাথরে বিনোদকে যাচাই করছিলাম। সত্যি, কি মন্দবুদ্ধি আমি! ছ্যাবলামিকে প্রেম মনে করে বসেছিলাম। অনেক স্ত্রী জানে, অধিকাংশ পুরুষ যারা এমন গয়না, পোশাক এবং হাসি-খুশি ভরা ফুর্তিবাজ থাকে, সে-সব জীব লম্পট হয়ে থাকে। নিজের লাম্পট্য লুকোবার জন্য এইসব ছল-চাতুরি আশ্রয় করে। কুকুরকে চুপ করে থাকার জন্য তার সামনে হাড়ের টুকরো ছুঁড়ে দেয়া হয়। বেচারি সরল ভালো স্ত্রী নিজের সর্বস্ব দিয়ে খেলনা লাভ করে এবং তাতেই সে সুখ-মগ্ন থাকে। বিনোদকে আমি ঐ নিশ্চিন্তে নিরিখ করেছিলাম—হীরেকে শাক-সব্‌জির দাড়ি-পাল্লায় রেখেছিলাম। আমি জানি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে বিনোদের দৃষ্টি কোন পরস্ত্রীর ওপর পড়তে পারে না। তার জন্য শুধু আমি আছি, একমাত্র আমিই —ভালো অথবা মন্দ! বোন, গর্ব এবং আনন্দের চোটে আমার বুক ফুলে উঠেছে। এত বিশাল সাম্রাজ্য, এত অটল, এত সুরক্ষিত, কোন হৃদয়েশ্বরীর ভাগ্যে কি ঘটেছে? আমার সন্দেহ আছে। আর আমি কিনা এতে অসন্তুষ্ট ছিলাম। জানা ছিল না, বুদবুদ ওপরে ভাসে, মুক্তো সমুদ্রে অতল স্তরেই থাকে। হায়, আমার এই মূর্খামির দরুণ, প্রিয়তম বিনোদের না জানি কত মানসিক বেদনা ঘটেছে! আমার জীবনসঙ্গী, আমার জীবন-সর্বস্ব না জানি কোথায় ঘুরে মরছে, জানিনা কি দশায় আছে, এখন আমার প্রতি তার মনে কি যে শঙ্কা জেগে উঠছে—তাও জানি না। প্রিয়তম! তুমি আমার প্রতি কিছুমাত্র অন্যায় করনি। যদি আমি তোমায় নিষ্ঠুর মনে করে থাকি, তুমি আমায় তার চেয়েও খারাপ মনে করছো। এখনও কি তোমার মন ভরেনি? তুমি কি আমায় এত হীন-নীচ মনে করছো যে হতভাগ্য ভুবন……আমি অমন লাখ লাখ ভুবনকে তোমার পায়ের কাছে এনে হাজির করতে পারি। এমন কোন প্রাণী আমার চোখে পড়ে না, যার প্রতি আকর্ষণ বোধ করি। না, তুমি আমাকে এত নীচ, এত কলঙ্কিনী ভাবতে

পারো না—তাহলে হয়তো এমন অবস্থা এসে দাঁড়াতো, যখন তোমার ও আমার মাঝে কোন একজন কে পৃথিবীতে থাকতে হতো না।

বোন, বিনোদকে ডাকার জন্য, তাকে টেনে আনার জন্য, তাকে ধরার জন্য একটা উপায় বার করেছি। প্রথম দিনেই কেন যে এই উপায় বার করিনি! খবরের কাগজ না-পড়া অব্দি বিনোদের স্বস্তি নেই, সে কোন্ খবরের কাগজ পড়ে —তা আমার জানা। কালকের কাগজে ব্যক্তিগত কলমে এটা ছাপা হবে—'পদ্মা মৃত্যুশয্যায়', এবং পরশু বিনোদ যেখানেই থাকবে—সে না এসে থাকতে পারে না। তারপর কোমর বেঁধে ঝগড়া করবো, প্রচণ্ড কলহ।

এবার তোমার সম্পর্কে লিখি। তুমি সুন্দরী, শিক্ষিতা বলে কি তোমার বুড়ী-শ্বাশুড়ী খুব জ্বালাতন করেন? বাহ্, বেশ! তোমার আনন্দকে বিচিত্র জীব বলে মনে হয়। আমি শুনেছি, পুরুষ যত কুশ্রী হোক না কেন, তার দৃষ্টি সবসময় সুন্দরীর দিকেই পড়ে। তবে, আনন্দবাবু তোমার প্রতি এত হৃদয়হীন কেন? একটু ভালো করে নজর রাখো, রাধা ও কৃষ্ণের মাঝে কোন কুব্জার আবির্ভাব ঘটেনি তো! যদি শ্বাশুড়ী এ রকম পেছনে লেগে থাকেন, তাহলে আমার পরামর্শ, নিজের আলাদা কুঁড়েঘর পেতে নাও। এও জানি, তুমি আমার এই পরামর্শ গ্রহণ করবে না। এই সহিষ্ণুতার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। তাড়াতাড়ি চিঠি দিও। হয়তো তোমার চিঠি আসার আগেই আমার চিঠি গিয়ে হাজির হবে।

তোমার

॥ ১২ ॥

কাশী

১-২-২৬

প্রিয় পদ্মা,

কয়েকদিন ধরে তোমার চিঠির প্রতীক্ষায় থাকার পর আজ এই চিঠি লিখতে বসেছি। বিনোদবাবু বাড়ি ফিরে এসেছেন, যদি এখনও না ফিরে থাকেন, এবং তুমি কেঁদে-কেটে চোখ ফুলে লাল করে ফেললেও, আমার এতটুকু দুঃখ নেই। তুমি তার প্রতি যে অন্যায় করেছো, এ তারই সাজা। তোমার প্রতি আমার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই। তুমি গৃহিণী হয়েও কুটিল ক্রীড়া করতে চলেছিলে, যা কেবল প্রেমের ব্যবস্থা-করা স্ত্রীদেরই শোভা দেয়। বিনোদ যদি তোমায় গলা টিপে মারত, আমি খুশী হতাম এবং ভুবনের কুসংস্কার চিরকালের মত স্তব্ধ

করে দিত। আমার ওপর যতই তুমি রাগ করো, তবুও আমি এটা নিশ্চয়ই বলবো—তুমি বিনোদের যোগ্য নও। সম্ভবতঃ তুমি তেমন স্বামীকে পছন্দ করো, যারা নিত্য-নতুন প্রেমের ছলনা হাজির করে তোমায় উপহার দিত। হয়তো তুমি ইংরেজী উপন্যাসে পড়ে থাকবে, নারীরা ছলনাময় রসিককে মন প্রাণ সঁপে দেয়, আর তাই পড়ে পড়ে তোমার মাথা ঘুরে গেছে। তোমার নিত্যি-নতুন রহস্য চাই, নইলে তোমার জীবন শুষ্ক হয়ে উঠবে। তুমি ভারতের পতি-পরায়ণা রমণী নও, ইওরোপের আমোদ-প্রিয় যুবতী। বস্তুতঃ তোমার প্রতি আমার অনুকম্পা জাগে। তুমি এখন পর্যন্ত রূপকেই আকর্ষণের মূল ভেবে আছো। স্বীকার করি, রূপে আকর্ষণ আছে। কিন্তু সে আকর্ষণের নাম মোহ—তা স্থায়ী নয়, প্রতারণার মুখোশ। প্রেমের একটাই মূলমন্ত্র, তা হলো সেবা। তুমি এটা ভেবো না, যে পুরুষ তোমার কাছে ভ্রমরের মত ঘোরাঘুরি করে, সে তোমাকে প্রেম করে। তার এই রূপের প্রতি আসক্তি বেশী দিন টিকে থাকে না। অবশ্য প্রেম অঙ্কুর রূপেই প্রকাশ পায়, কিন্তু একে পল্লবিত এবং পুষ্পিত করাটা সেবার কাজ। আমার বিশ্বাস হয় না, বাইরে থেকে ক্লান্ত-শ্রান্ত, ঘামে জবজবে অবস্থায় বিনোদকে আসতে দেখে কখনও পাখার বাতাস করেছো কিনা! সম্ভবতঃ টেবিল ফ্যানের ব্যবস্থার কথাও তুমি পারতপক্ষে মনে করো নি। সত্যি বলো, আমার অনুমান ঠিক কিনা! বলো, তুমি কখনও কি তার পা টিপে দিয়েছো? কখনও কি তার মাথায় তেল মেখে দিয়েছো? তুমি হয়তো বলবে, এসব খিদমতগারদের কাজ, স্ত্রী এসব কাজ করে না। সত্যি, সেই আনন্দ তুমি অনুভব করতে পারনি। বিনোদকে নিজের অধিকারে রাখতে চাও বটে, কিন্তু তার সাধন কর না। বিলাসিনী রমণী মনোরঞ্জন করতে পারে, কিন্তু চিরসঙ্গিনী হতে পারে না। পুরুষের গলায় জড়িয়ে থাকা অবস্থায়ও সে বহুদূরে তফাতে থাকে। স্বীকার করি, রূপের মোহ মানুষের স্বভাব, তা বলে রূপ দিয়ে তো হৃদয়ের তৃষ্ণা মেটে না, আত্মা তৃপ্ত হয় না। সেবা-বিশ্বস্ত রূপহীনা স্ত্রীর স্বামী যদি অন্য কোন রমণীর রূপের মোহে ধরা পড়ে, সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে। কেন জানো? সেবার স্বাদ পাওয়া মন, শুধু ন্যাকামি ও ঢঙে বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারে না। যাক্, আমি তোমায় যেন উপদেশ দিতে বসেছি, তুমি অবশ্য আমার চেয়ে দু-চার মাসের বয়সে বড়। ক্ষমা করো বোন, এটা উপদেশ নয়। এসব কথা আমি-তুমি-আমরা সবাই জানি। শুধু মাঝে-মাঝে ভুলে যাই। আমি শুধু তোমায় মনে করিয়ে দিলাম। উপদেশে যদিও হৃদয় হয় না, কিন্তু আমার উপদেশ হৃদয়ের সেই ব্যথা—যা তোমার এই নতুন বিপত্তিতে জাগরিত হয়েছে।

এবার আমার বৃত্তান্ত শোনো। এই এক মাসে এখানে অনেক কিছু ঘটনা ঘটে গেছে। তোমায় ইতিপূর্বে লিখেছিলাম, আনন্দবাবু ও মার মধ্যে মন কষাকষি চলছিল। ভেতরে-ভেতরে সেই আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিল। প্রায় রোজই দু-একবার করে মা ও ছেলের মধ্যে বচসা হতো। একদিন আমার ছোট ননদ আমার ঘর থেকে একটা বই তুলে নিয়ে যায়। ওর আবার পড়ার রোগ আছে। ঘরে আমি বই না পেয়ে, ওকে জিজ্ঞেস করি। এই সামান্য কথায় সে আমার ওপর ফেটে পড়ে, বলতে শুরু করে—আমায় তুমি চোর বলছো। শ্বাশুড়ীও তার পক্ষ নিয়ে আমায় বেশ কয়েকটা কথা শোনায়। অদ্ভুত যোগাযোগ, মা যখন আমায় মুখ করছিলেন, ঠিক তখন আনন্দবাবু ঘরে ঢোকে। মা তাকে দেখে আরও জোরে-জোরে বকতে শুরু করেন—অ্যাঁ, বৌমার এত সাহস—তুই একে মাথায় তুলে দিয়েছিস, এত লাই পায় কি করে। বই কি ওর বাপের ছিল। মেয়ে না হয় এনেছে, কি এমন অপরাধ করেছে? এতটুকু সবুর সয় না, ছুটে এসে ওর মাথায় চেপে বসেছে। ওর হাত থেকে বই কেঁড়ে নিয়েছে।

বোন, আমি স্বীকার করছি, বইয়ের জন্য আমার অতটা উতলা না হলেই চলত। পড়া শেষ হলে ননদ নিজেই ফেরত দিয়ে যেত। যদিও বা না-দিত, এমন কি বই যে না-পড়লে আমার প্রভূত ক্ষতি হতো। কিন্তু তিনি উল্টে আমার পক্ষ নিয়ে গলা উঁচু করে বলে ওঠেন—কারো জিনিস জিজ্ঞেস না করেই বা আনলো কেন? এ তো সামান্য ভদ্রতা।

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মার মাথায় যেন ভূত চেপে বসে। আনন্দবাবুও মাঝে মাঝে কথা শোনাতে থাকে। আর এদিকে আমি ঘরে বসে কাঁদছি, মনে মনে নিজেকে দোষ দিচ্ছি—কেন যে আমি চাইতে গেলাম। মা-আর ভাত খেলেন না, আনন্দবাবুও খেল না। আমার বার বার ইচ্ছে করছিল বিষ খেয়ে জ্বালা জুড়োই। রাত্রে যখন মা শুতে যান, আমি রোজকার মত তার পা টিপতে যাই। আমায় দেখতে পেয়েই দূর দূর করে দেয়, তবুও আমি তার পা জড়িয়ে থাকি। আমি পায়ের দিকে বসেছিলাম, মা আমায় পা দিয়ে ধাক্কা দিতেই, সামলাতে না পেরে খাট থেকে নীচে পড়ে যাই। মেঝেতে কয়েকটা ঝুড়ি রাখা ছিল। সেই ঝুড়ির ওপর আমি পড়ি, কোমরে ও পিঠে বেশ আঘাত লাগে। যদিও আমি চেঁচাতে চাইনি, কিন্তু জানি-না মুখ থেকে কি করে যে আর্তস্বর বেরিয়ে পড়ে। আনন্দবাবু তার ঘরে ঢুকছিল, আমার আর্তস্বর শুনেই ছুটে আসে। মার দরজার কাছে এসে বলে—তুমি কি চাও, মা? ওকে কি মেরে ফেলতে চাও? অপরাধী

আমিই, কেন ওর প্রাণ নিয়ে টানাটানি করছো ? এই বলে ঘরে ঢুকে পড়ে, তারপর আমার হাত ধরে জোর-জবস্তি টানতে টানতে নিয়ে যায়। আমি অনেক চেষ্টা করি হাত ছাড়িয়ে নিতে, কিন্তু আনন্দ আমার হাত শক্ত করে ধরে রাখে। সত্যি বলতে কি এ সময় আমাদের মাঝে তার এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়াটা আমার ভালো লাগে না। সে যদি না আসতো, আমি কেঁদে-কেটে ক্ষমা চেয়ে মাকে মানিয়ে নিতাম। এমনিতেই, আমি পড়ে যাওয়ায় মার রাগ অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছিল। আনন্দের মাথা গলানোয় ব্যাপারটা ভয়ানক হয়ে উঠল। মা ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন, তারপর মুখ ভেংচে বলেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ, ভাল করে দেখ। মলম-পট্টি বেঁধে দে। কোন হাড়-টাড় ভাঙ্গেনি তো ?

আনন্দ উঠোনে দাঁড়িয়ে পড়ে, বলে—'তুমি যাকে ইচ্ছে মেরে ফেলবে, অথচ আমি কিছু বলবো না ; এই কি তুমি চাও ?'

'হ্যাঁ, আমি যে ডাইনি। লোকেদের মেরে ফেলাই তো আমার কাজ। আশ্চর্য, তোকে কেন মেরে ফেলিনি !'

'তা আফসোস করছো কেন ? একজন না হয়, আরেকজনকে হাতের কাছে পাচ্ছ।'

'যদি তুই বৌকে মাথায় তুলে রাখতে চাস, তাহলে অন্য কোথাও গিয়ে রাখ। এই বাড়িতে তোর আর জায়গা হবে না।'

'আমি নিজে সেটা ভাল করে বুঝি। তোমার বলার দরকার নেই।'

'হ্যাঁ, আমিও মনে করবো আমার কোনও ছেলে নেই।'

'আমিও ধরে নেবো, আমার মা মারা গেছে।'

আনন্দবাবুর হাত ধরে আমি জোরে টানতে থাকি, যাতে সেখান থেকে তাকে সরিয়ে আনি ; কিন্তু সে বার বার আমার হাত আছড়ে ফেলে দেয়। শেষে মা যখন তাঁর ঘরে ঢুকে যান, তখন সে ঘরে আসে, তারপর দু' হাতে মাথা চেপে বসে পড়ে।

আমি বলি—'এ তুমি কি করলে ?'

আনন্দ মেঝের ওপর দৃষ্টি রেখে বলে—'মা আজ স্পষ্ট বলে দিয়েছে।'

'তুমি নিজে থেকে এই ঝামেলা বাঁধালে, উনি তো কিছু বলেননি।'

'আমি ঝামেলা বাঁধিয়েছি ?'

'নয়তো কি। আমি কি তোমায় অভিযোগ করেছি ?'

'তোমায় যদি টেনে না আনতাম, মা হয়তো মারধোর করে আধমড়া করে ফেলতো। ওঁর রাগ তো তোমার জানা নেই।'

'তোমার এটা ভুল ধারণা। উনি আমায় মারেন নি, পা সরিয়ে নিচ্ছিলেন। আমি খাটের ধারে বসেছিলাম। সামান্য ধাক্কা লাগতেই বেসামাল হয়ে পড়ে গেছি। মা তারপরেই আমাকে তুলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তুমি গিয়ে হাজির।'

'হুঁ, মার কাছে মামাবাড়ির গল্প! মা-কে আমি ভাল করেই জানি। কালকেই অন্য বাসা ভাড়া করবো—আমি ঠিক করে ফেলেছি। চাকরি একটা কোথাও না-কোথাও জুটে যাবে। এরা ভাবে আমি এদের ভাত কাপড়ে নিভর করে আছি। তাই তো এদের এমন মেজাজ।'

আমি যতই তাকে বোঝাই, সে তত গোয়ার্তুমি করে। শেষে আমি রেগে-মেগে বিরক্তির স্বরে বলি—'ঠিক আছে, তুমি একা অন্য বাসায় গিয়ে থাকো। আমি যাবো না। আমায় এখানে পড়ে থাকতে দাও।'

আনন্দ আমার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে বলে—'এখানে লাথি-ঝাঁটা খেতে ভাল লাগে ?'

'হ্যাঁ, আমার এখানে ভাল লাগে।'

'তাহলে তুমি খাও, আমি খেতে চাই না। তোমার দুর্দশা চোখে দেখবো না একি কম লাভ ? আমার মন খারাপ হবে না।'

'আলাদা থাকলে লোকেরা কি বলবে।'

'লোকের কথায় পরোয়া করি না। লোকেরা অন্ধ।'

'হুঁ, লোকেরা বলবে, বৌয়ের আঁচলের তলায় থাকে।'

'এর পরোয়াও করি না। এই ভয়ে নিজের জীবন সংকটে ফেলতে চাই না।'

আমি তখন কেঁদে কেঁদে বলি—'তুমি আমায় ফেলে রেখে যাবে ? আমার ওপর তোমার সামান্যতম ভালবাসা-টান নেই।'

বোন, অন্য কোন সময়ে এই ভালবাসা-ভরা কথা-আবেদন শুনে না-জানি কত কি করে ফেলতো। এমন কথা, এমন আবেদনে রাজ্যপাট লুটিয়ে পড়ে, সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়, রমণীর কাছে এর চেয়ে বড় অস্ত্র আর নেই। আনন্দের গলা দু হাতে জড়িয়ে ধরি, ওর কাঁধে মাথা রেখে কাঁদতে থাকি। কিন্তু এসময় আনন্দবাবু এত কঠোর হয়ে পড়েছে, যে এই আবেদনও তার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। যে মাতা তাকে জন্ম দিয়েছে, তাঁর প্রতি এত রোষ! আমি নিজের মার কড়া কথা সহ্য করতে পারতাম না, এই আত্মাভিমানের কোন অর্থ হয় না। আশা, আশা—এই তো সেই আশা, যার প্রতি মা তার জীবনের যাবতীয় সুখ-বিলাস অর্পণ করে দেয়, দিনের সুখ-শান্তির, রাতের ঘুম সব নিজের ওপর দিয়ে কাটায়। ছেলের ওপর কি মার এতটুকু অধিকার নেই!

আনন্দ ঠিক সেরকম অবিচলিত কঠোরতায় বলে—যদি ভালবাসার অর্থ এই হয়, আমার জন্য এই সংসারে তোমার দুর্গতি হয়, তাহলে এমন ভালবাসা আমি স্বীকার করি না।

ভোরবেলায় ঘুম থেকে বাইরে বেরোবার আগে আমাকে বলে—'শোনো, আমি গিয়ে বাসা ঠিক করে আসছি। টাঙা সঙ্গে নিয়ে আসবো, তুমি তৈরি থেকো।'

আমি দরজায় বাধা দিয়ে বলি—'এখনও কি তোমার রাগ পড়েনি?'

'রাগের কথা নয়, অপরের ঘাড় থেকে আমার বোঝা সরিয়ে নেয়ার কথা হচ্ছে'

'এটা তুমি কিন্তু একেবারে ভালো করছো না। ভেবে দেখো, মার কত কষ্ট হবে। বাবাকে তুমি জিজ্ঞেস করেছো?'

'তাঁকে জিজ্ঞেস করার কোন দরকার নেই। কর্তা-টর্তা যাই বলো, মা-ই এ সংসারে। বাবা মাটির পুতুল ছাড়া আর কিছু নয়।'

'সংসারের কর্তা তিনি।'

'তুমি যাবে, নাকি যাবে না? পরিষ্কার করে বলো।'

'আমি এখন যাবো না।'

'ঠিক আছে, এখানে থেকে লাথি ঝাঁটা খাও।'

আমি আর কোন কথা বলি না। আনন্দ মুহূর্তখানিক থেমে আবার বলে—'তোমার কাছে কিছু টাকা হবে, দাও তো!'

আমার কাছে টাকা ছিল, কিন্তু আমি অস্বীকার করি। ভাবলাম, হয়তো দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে থেমে পড়বে। কিন্তু তিনি যে মনে মনে একেবারে ঠিক করে নিয়েছেন। খিন্ন হয়ে বলে ওঠে—ঠিক আছে, তোমার টাকা ছাড়াও আমার কাজ চলবে। এই বিলাস ভবন, এই সুখভোগ, এই চাকর-ঠাকুর, এই ঠাট-ঠমক তোমার অক্ষয় হোক। আমার সঙ্গে থেকে কেন উপোসে মরবে? সুখ কোথায় সেখানে। আমার ভালবাসার দামই বা কি?

এই বলে সে বেরিয়ে যায়। বোন, কি বলবো, সে সময় নিজের অসহায়তা ভেবে যে কি দুঃখ হতে থাকে। মনে মনে ভাবছিলাম, মৃত্যু যদি আমায় তুলে নিয়ে যায়। আমার মত কলঙ্কিনীর জন্য মা ও ছেলের মাঝে মতনৈক্য ঘটলো। তক্ষুণি গিয়ে মা'র পায়ের কাছে আছড়ে পড়ি, কেঁদে কেঁদে আনন্দবাবুর বাড়ি ত্যাগের কথা বলি। কিন্তু মার হৃদয় এতটুকু গলে না। আজ আমি টের পাই, মা-ও এমন বজ্রহৃদয়া হতে পারেন। আনন্দবাবুর হৃদয়ই বা কঠোর হবে না কেন? মায়েরই সন্তান সে।

মা বেশ নির্মমভাবে বলেন—'তুমি ওর সঙ্গে চলে গেলে না কেন? ও যখন

বলছিল, তোমার চলে যাওয়াই উচিত ছিল। কে জানে, আমি কোনদিন না বিষ দিয়ে বসি।'

আমি কাঁদতে কাঁদতে বলি—'মা, ওঁকে ডেকে পাঠান। আপনার পায়ে পড়ি। নইলে কোথায় চলে যাবে।'

মা ঠিক সেই রকম নির্মম স্বরে বলে—যাক কিংবা থাকুক—আমার কে সে! এখন যা কিছু, তুমিই সব, আমায় ধর্তব্যের মধ্যে গোনে না। আজ সামান্য ব্যাপারে কি মেজাজ দেখালো, আর আমার শ্বাশুড়ী যে.কত মার মেরেছেন। আমি তেমন বাচ্চা মেয়ে ছিলাম না, তোমারই বয়সী ছিলাম, কিন্তু সাহস কী যে তোমার শ্বশুরের সঙ্গে আর সকলের সামনে কথা বলি। কাঁচাই খেয়ে ফেলতো আমাকে। মার খেয়ে সারা রাত ঘরে পড়ে কাঁদতাম, তা বলে এই রকম ঘর ছেড়ে কেউ চলে যেত না। আজকালকার ছেলেরা ভালবাসতে জানে না, আমাদের মাঝেও ভালবাসা ছিল, তা বলে এই নয় যে মা-বাবা, ছোট-বড় কাউকে কোন গেরাহ্যি করিনি।

এই বলে মা পুজো করতে চলে গেলেন। আমি ঘরে ঢুকে নিজের ভাগ্যের পরিহাস দেখে কাঁদতে থাকি। আনন্দ আবার কোন্ রাস্তা ধরে—এই আশঙ্কায় মন কাঁপতে থাকে। বারবার মন উদ্বেল হয়ে উঠছিল, তাকে টাকা দিই নি বলে। বেচারা এদিক-ওদিক : ঘুরে বেড়াবে। মুখ-হাতও ধোয়া হয়নি, জলখাবারও খায়নি। সময় মতো জলখাবার না খেলে শরীর খারাপ হতে পারে। চাকরকে বলি—গিয়ে দেখতো, ছোটবাবু ঘরে আছে নাকি! সে দেখে এসে বলে—ঘরে কেউ নেই, আলনায় জামা-কাপড়ও দেখলাম না।

আমি জিজ্ঞেস করি—হ্যাঁরে, এর আগেও কি কখনও মার সঙ্গে এমন রাগ করেছে?

চাকর বলে—না গো বৌমা, এমন সরল সহজ ছেলে আমি দেখিনি। কর্ত্রীমার সামনে কখনও মাথা তোলেনি। আজ কেন যে চলে গেল।

আশা ছিল, দুপুরে খাবার সময় সে ফিরে আসবে। কিন্তু দুপুর পার হলো, বিকেল গেল, তবুও তার কোন খোঁজ নেই। সারা রাত জেগে কাটালাম। দরজায় কান পেতে রইলাম। তুমি যদি তখন আমায় দেখতে, তাহলে চিনতে কষ্ট হতো। কেঁদে কেঁদে চোখ আমার লাল হয়ে গেছিল। এই তিনটে দিন এক মিনিটের জন্য চোখের পাতা এক করতে পারিনি, ক্ষিধের কথা মনে নেই, জল পর্যন্ত স্পর্শ করিনি। তেষ্টাই পেত না। মনে হতো, দেহে যেন প্রাণ নেই। গোটা বাড়িতে শোক ছেয়ে আছে। মা দু'-বেলা খাবার খেতে যেতেন বটে, শুধু মুখে কুটোটি

নেড়ে উঠে পড়তেন। ননদ তুজনের হাসি, বিদ্রূপ গায়েব হয়ে গেছিল। ছোট ননদ অপরাধী মুখে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছিল।

চারদিনের দিন ভোরবেলায় ঠাকুর এসে আমায় বলে—ছোটবাবুর সঙ্গে আজ দশাশ্বমেধ ঘাটে দেখা হয়েছে। তাকে দেখতে পেয়েই আমি এক লাফে তার কাছে গিয়ে বলি—ছোটবাবু, বাড়ি যাচ্ছেন না কেন। সকলেই চিন্তা করছে। বৌমা তিনদিন যাবৎ এক ফোঁটা জলও খাচ্ছেন না। তার অবস্থা খারাপ। আমার কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপচাপ ভাবলো। তারপর বললেন—বৌমা, খাওয়া বন্ধ করেছে কেন? গিয়ে বলে দিস, যে আরামের জন্য বাড়ি ছাড়তে পারেনি, এত তাড়াতাড়ি তাতে মন ভরে গেছে?

এ সময় মা-ও অঙ্গনে এসে হাজির। ঠাকুরের কথার হুল কানে গিয়ে বিঁধেছে। বলেন—কি রে অলগু, আনন্দের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

ঠাকুর—আজ্ঞে হ্যাঁ, বড়বৌমা, এইমাত্র দশাশ্বমেধ ঘাটে দেখা হয়েছে। আমি বললাম—ছোটবাবু, বাড়ি যাচ্ছেন না কেন, তা বললেন—ঐ বাড়িতে আমার কে আছে?

মা—বললি না কেন, আর কেউ নিজের না থাকুক, বৌ তো নিজের, তার প্রাণ জ্বালাচ্ছে কেন?

ঠাকুর—আমি অনেক করে বোঝালাম বড়বৌমা, কিন্তু কিছুতেই মচকায় না।

মা—করে কি এখন?

ঠাকুর—তা তো আমি জিজ্ঞেস করিনি, কিন্তু চোখ-মুখ শুকিয়ে একসা হয়ে গেছে।

মা—বয়স যতই বাড়তে থাকে, ততই যেন ভিমরতিতে ধরে। ওকে জিজ্ঞেস করতে কি হয়েছিল, বাবু থাকেন কোথায়, খাওয়া-দাওয়া কোথায় সারেন। তোর উচিত ছিল, ওর হাত শক্ত করে ধরে টানতে টানতে বাড়ি নিয়ে আসা। এক একটা নেমকহারামের দল জুটেছে, শুধু হালুয়া-লুচির সঙ্গে মতলব, কেউ বাঁচুক বা মরুক। তু-বেলা হাত বড় করে খাওয়া, আর গোঁফে তা দেওয়া। বাড়িতে আর কেউ খেল কিনা, তা দিয়ে তোদের সম্পর্ক কি। সে আসুক বা না আসুক; আমার তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। আমার ধর্ম পালন-পোষণ, তা আমি পালন-পোষণ করে বড় করে দিয়েছি। এখন যেখানে ইচ্ছে যাক। কিন্তু বৌমার কি করি, কেঁদে-কেটে প্রাণ দিতে বসেছে। তোকে ভগবান যদি চোখ দিয়ে থাকে, ভাল করে ওর অবস্থা দেখ। বলি, মুখ থেকে কি তুটো কথা বেরোয় নি, বৌমা অন্নজল ত্যাগ করে পড়ে আছে।

ঠাকুর—বড়বৌমা, বাবা বিশ্বনাথ জানেন, আমি তাকে অনেক করে বুঝিয়েছি, কিন্তু সে পালিয়ে যেতে চায়। আমি তাহলে কি করি।

মা—বুঝিয়েছিস আমার মাথা। তুই ওকে বোঝালে, ও এমনিই পালিয়ে যাবে। এইসব মনগড়া কথা বলার লোক আমাকে পেয়েছিস? বৌমাকে আমি কি জবাব দিই। আমার স্বামী যদি এমন ব্যবহার করতো, তাহলে আর তার মুখদর্শনও করতাম না। কিন্তু, ও যে বৌমার ওপর কি যাদু করে বসেছে। এমন বিবাগী লোকের দরকার কুলটা রমণী, যারা নাকে দড়ি বেঁধে নাচাতে পারে।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে চাকর এসে বলে—ছোটবাবু ঘরে এসে বসে আছেন।

আমার বুক ধড়াস্ করে কেঁপে ওঠে। ইচ্ছে করছিল গিয়ে তার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে আসি, কিন্তু মার মন সত্যি শক্ত। বললেন—গিয়ে বলে দে, বাড়িতে ওর কে আছে, এসে হাজির হয়েছে যে।

আমি হাতজোড় করে বলি—মা, ওকে ভেতরে ডেকে নিন, নইলে আবার চলে যাবে।

মা—কেন? ওর এখানে কে আছে যে আসবে। ভেতরে পা রাখতে আমি দেবো না।

মা এদিকে রাগ করছেন, ওদিকে ছোট ননদ গিয়ে আনন্দবাবুকে ভেতরে নিয়ে আসে। সত্যি, চেহারা একেবারে শুকিয়ে গেছে—যেন মাসাধিক কাল রোগে ভুগছে। ননদ তাকে এমনভাবে ধরে আনছিল, যেন কোন মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে। মা স্মিত হেসে বলে—ওকে এখানে আনলি কেন? ওর কে আছে এখানে?

আনন্দ মাথা ঝাঁকিয়ে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে থাকে। মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। মা আবার জিজ্ঞেস করেন—চারদিন ধরে কোথায় থাকা হয়েছিল?

'কোথাও না। এখানেই ছিলাম।'

'বেশ মজায় থাকা হয়েছিল নিশ্চয়ই।'

'হ্যাঁ, কোন অসুবিধে হয়নি।'

'তা তো চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।'

ননদ জলখাবারের জন্য মিষ্টি আনে। আনন্দ মিষ্টি খেতে এমন লজ্জা পাচ্ছিল যেন শ্বশুরবাড়ি এসেছে। তারপর মা তাকে সঙ্গে করে নিজের ঘরে নিয়ে যান। সেখানে মা-ছেলে মিলে আধ-ঘণ্টা ধরে কথাবার্তা হতে থাকে। আমি উৎকর্ণ ছিলাম, কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু শোনা যায়নি। তবে মনে হচ্ছিল, কখনও মা কাঁদছেন, কখনও বা আনন্দ। পূজো করার জন্য মা যখন বের হলেন,

তাঁর চোখ জোড়া লাল হয়েছিল। আনন্দ সে-ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা আমার ঘরে ঢোকে। তাকে দেখতে পেয়ে, আমি তাড়াতাড়ি মুখ ঢেকে খাটের ওপর শুয়ে পড়ি, যেন অগাধ ঘুমে ডুবে আছি। সে ঘরে ঢুকে আমায় খাটের ওপর শুয়ে থাকতে দেখে, তারপর কাছে এসে একবার খুব ধীর স্বরে ডাকে। তারপর শুয়ে পড়ে। আমায় জাগাতে সাহস হয় না, আমার যা কষ্ট হচ্ছিল, তার একমাত্র কারণ আমি নিজে, এটা ভেবে মনে মনেই দুঃখ বোধ করতে থাকি। অনুমান করেছিলাম, সে আমায় জাগিয়ে তুলবে, আমি তখন অভিমান করবো, সে আমার মান ভাঙ্গাবে—কিন্তু সমস্ত পরিকল্পনা ছাই হয়ে গেল। তাকে শুয়ে পড়তে দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারি না। আমি অস্থিরভাবে উঠে বসি, তারপর খাট থেকে নিচে নামতে যাই। কিন্তু কেন জানি সহসা পা টলতে থাকে, মনে হয়, এই বুঝি আমি পড়ে যাবো। এমন সময় আনন্দ পেছন থেকে আমায় সামলে ধরে, তারপর বলে—শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো। আমি চেয়ারে বসছি। এ তুমি কি দশা করে রেখেছো ?

আমি নিজেকে সামলে নিয়ে বলি—আমি ভালই আছি। তুমি কেমন কষ্ট করলে ?

'আগে তুমি কিছু খেয়ে নাও, তারপর কথা বলবে।'

'আমার খাওয়ার জন্য তোমার এত চিন্তা কিসের। তুমি তো বেড়াচ্ছ-খাচ্ছ-দাচ্ছ।'

'আমি যে কেমন বেড়িয়েছি, খেয়েছি, তা আমার মনই জানে। যাক্, পরে বলবো। এখন তুমি হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নাও। চারদিন ধরে জল পর্যন্ত মুখে তোলনি। হায়।'

'তোমাকে কে বলেছে আমি চারদিন ধরে জল পর্যন্ত মুখে তুলিনি। তুমি যখন আমার কোন খোঁজখবর করো না, আমি কেন মিছিমিছি খাওয়া-দাওয়া ছাড়বো ?'

'তা তো তোমার চেহারায় ধরা দিচ্ছে। ফুল···ঝরে পড়েছে।'

'তুমি নিজের চেহারাটা আয়নায় দেখে এসো।'

'হুঁ, আমি আগেই বা কি এমন সুন্দর ছিলাম।'

'জল পেলেই বা কি, না পেলেই বা কি। জানা ছিল না তুমি এভাবে অনশন গ্রহণ করবে, নইলে ঈশ্বরই জানেন, মা শত প্রহার দিয়ে তাড়ালেও, আমি যেতাম না।'

আমি তিরস্কারের দৃষ্টিতে চেয়ে বলি—তোমার কি সত্যি এ ধারণা ছিল, আমি আরামের লোভে এখানে রয়ে গেছি ?

আনন্দ দ্রুত তার ভুল সংশোধন করে—না, না, আমি এতটা গাধা নই। কিন্তু আমি কখনও ভাবিনি, তুমি সত্যি সত্যি একেবারে খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করবে। ভালই হয়েছে, ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, নইলে তুমি হয়তো প্রাণ দিয়ে দিতে। আর কখনও এমন ভুল হবে না। এই নাও কান ধরছি। মা তোমার বৃত্তান্ত বলে খুব কাঁদলেন।

আমি খুশি হয়ে বলে উঠি—তাহলে আমার তপস্যা সফল হয়েছে।

'একটু দুধ খেয়ে নাও, তারপর কথা বলবো। কত কথা যে জমে আছে।'

'পরে খাবো। এমন কি জরুরী।'

'যতক্ষণ না তুমি খাবে, আমি মনে করবো, তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা করো নি।'

'ন্‌না! আগে প্রতিজ্ঞা করো, আর কখনও তুমি এমন রাগ করে যাবে না—তাহলেই খাবো।'

'বেশ তো। আমি কায়মনোবাক্যে প্রতিজ্ঞা করছি।'

বোন, তিনদিন খুব কষ্টে গেছে, কিন্তু তার জন্য আমার কোন পরিতাপ নেই। এই তিনদিনের অনশনে অন্তঃস্থলে যে পরিচ্ছন্নতা এনেছে, তা অন্য কোন উপায়ে কখনই হতো না। এবার আমার বিশ্বাস, আমাদের জীবন শান্তিতে অতিবাহিত হবে। তোমার খবরাখবর শীঘ্র, অতি শীঘ্র লিখবে।

তোমার

চন্দ্রা

॥ ১৩ ॥

দিল্লী

২০-২-২৬

প্রিয় বোন,

তোমার চিঠি পেয়ে বস্তুতঃ দয়া হলো তোমার প্রতি। আমার এ-ব্যাপারে তুমি যতই মন্দ বলো না কেন, আমি কিন্তু এত দুর্গতি সইতে পারতাম না, কোন মতেই নয়। হয় আমি প্রাণ বিসর্জন দিতাম, নয় ঐ শ্বাশুড়ীর আর কোনদিন মুখদর্শন করতাম না। তোমার সারল্য, তোমার সহিষ্ণুতা, তোমার শ্বাশুড়ী-ভক্তি বহাল তবিয়তে বেঁচে থাক। আমি হলে সেই মুহূর্তে আনন্দের সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তাম। ভিক্ষে করেও যদি দিন কাটাতে হয়, তবুও ও বাড়িতে আর পা রাখতাম না। তোমার ওপর শুধু যে দয়া উপচে উঠেছে তাই নয়, রাগ

হচ্ছে প্রচুর—তোমার মাঝে স্বাভিমান বোধ নেই আসলে, তোমাদের মত নারীরাই শ্বাশুড়ী ও পুরুষদের মেজাজ সপ্তমে তুলে দেয়। গোল্লায় যাক তেমন সংসার—যেখানে আত্মসম্মান থাকে না। হ্যাঁ, আমি এই মূল্যে প্রতি-প্রেম দিতে রাজী নই। তোমার উচিত ছিল উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করা। তখন তোমার এসব গুণের প্রভূত প্রশংসা হতো। এই স্বাধীনতা, অধিকার এবং নারী-জাগরণকালে তুমি স্রেফ একটা প্রাচীন ইতিহাস। মনে রেখো, এটা সীতা ও দয়মন্তীর যুগ নয়। পুরুষেরা বহুকাল রাজত্ব করে এসেছে। এখন নারী জাতির রাজত্ব করার সময়। আমি অবশ্য তোমায় আর গাল-মন্দ করবো না।

এবার আমার অবস্থা শোনো। ভেবেছিলাম, সংবাদপত্রে আমার অসুস্থতার খবর ছাপতে দিই। পরে ভেবে দেখলাম, সংবাদপত্রে এ খবর ছেপে বেরোলেই বন্ধু-বান্ধবদের তৎপরতা বেড়ে যাবে, কেউ আসবে আমার শরীরের অবস্থা জানতে, কেউবা আসবে মেজাজের খোঁজ নিতে। তাছাড়া, আমি তো আর কোন রাণী নই যে, আমার অসুখের বুলেটিন রোজ ছাপা হয়ে বেরোবে। লোকেদের মনে না-জানি কত রকম ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। এই ভেবেই সংবাদপত্রে খবর ছাপানোর ভাবনা ত্যাগ করি। সারাদিন আমার মনের অবস্থা যে কি ছিল, লিখে বোঝাতে পারবো না , কখনও ইচ্ছে হতো, বিষ খেয়ে শরীর জুড়োই। কখনও ইচ্ছে হতো, উড়ে কোথাও চলে যাই। বিনোদের সম্পর্কে নানান ধরণের আশঙ্কা বার বার হতে থাকে। এমন কত ভাবনা এ সময় মনে পড়ল, যখন আমি বিনোদের প্রতি উদাসীনতাব ভাব দেখিয়েছি। তার কাছ থেকে আমি সর্বস্ব নিতে চেয়েছি, অথচ দিতে চাইনি কিছু। আমি চাইতাম, সে অষ্টপ্রহর আমার চারধারে ভ্রমরের মত গুণগুণ করে ঘুরে বেড়াক, কিংবা প্রজাপতির মত। বই আর কাগজপত্রের মাঝে তাকে মগ্ন থাকতে দেখে আমার রাগ ও বিরক্তি হত। আমার অধিকাংশ সময় সাজ-সজ্জা ও প্রসাধনেই কাটতো, তার সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ভাবনা থাকতো না। এখন আমি বুঝতে পারছি, সেবার মহত্ব-রূপের চেয়ে অধিক। রূপ মনকে মুগ্ধ করতে পারে, কিন্তু আত্মাকে আনন্দ দিতে পারে অন্য কোন বস্তু।

এভাবে সপ্তাহখানিক পেরিয়ে যায়। সকালবেলায় পিত্রালয়ে যাবার জন্য আমি তৈরি হচ্ছি—এই সংসারে আমার কিসের মোহ—সহসা ডাক-পিওন আমায় একটা চিঠি দিয়ে যায়। আমার বুক ধড়াস ধড়াস করে কাঁপতে শুরু করে দেয়। কাঁপা-কাঁপা হাতে আমি চিঠিটা নিই, কিন্তু শিরোনামে বিনোদের পরিচিত হস্তাক্ষর নয়, মেয়েলী হাতের লেখা—এ ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল

না। এবং হস্তাক্ষর আমার একেবারে অপরিচিত। সঙ্গে সঙ্গে আমি চিঠিটা খুলে ফেলি, চিঠির শেষে তলায় নাম পড়তে চমকে উঠি—এ যে কুসুমের চিঠি! এক নিঃশ্বাসে আমি গোটা চিঠিটা পড়ে ফেলি। সে আমায় লিখেছে—বোন, বিনোদবাবু তিনদিন এখানে থেকে বোম্বে চলে গেছেন। সম্ভবতঃ উনি বিলেতে যেতে চান। তিন চারদিন বোম্বে থাকবেন। আমি অনেক চেষ্টা করেছি তাকে দিল্লীতে ফেরাবার, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না। নীচে তাঁর ঠিকানা দিলাম, তাঁকে টেলিগ্রাম করে দিও। তাঁর কাছ থেকে এ ঠিকানা আমি জেনে নিয়েছি। অবশ্য বার বার আমায় বারণ করে দিয়েছেন যেন আমি এ ঠিকানা গোপন রাখি, কিন্তু তোমার কাছে আমার গোপন কি! তুমি দ্রুত টেলিগ্রাম করে দিও। হয়তো যাবেন না। কি এমন ব্যাপার ঘটলো! বহুবার জিজ্ঞেস করেও বিনোদ কিছুতেই বলেন নি, কিন্তু তিনি খুবই বিষণ্ণ। এমন লোককেও তুমি আপন করতে পারোনি, খুব আশ্চর্যের কথা। আমার মনে কিন্তু আগেই আশঙ্কা জেগেছিল। রূপ ও গর্বের সঙ্গে প্রদীপ ও আলোর সম্পর্ক। গর্ব রূপেরই আলো।

আমি চিঠি পড়ে রেখে দিই, তারপব সেই মুহূর্তে বিনোদেব নামে টেলিগ্রাম করে দিই, খুবই অসুস্থ, দ্রুত ফিরে এসো। আশা ছিল, বিনোদ টেলিগ্রামেই রিপ্লাই দেবে, কিন্তু সারা দিন পেরিয়ে গেল, অথচ তার কোন জবাব এলো না। বাংলোর পাশ দিয়ে কোন সাইকেল গেলেই আমি সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে চেয়ে দেখি, হয়তো টেলিগ্রামের পিওন। রাত্রেও আমি টেলিগ্রামের প্রতীক্ষা করে কাটাই। তখন আমি নিজের মনকে প্রবোধ দিই হয়তো বিনোদ আসছে, তাই টেলিগ্রাম করার প্রয়োজন বোধ করে নি।

এবার আমার মনে অন্য ধরনের আশঙ্কা জাগে। বিনোদ কুসুমের কাছে গিয়েছে কেন, কুসুমের সঙ্গে ওর প্রেম নেই তো? সেই প্রেমের কারণেই কি আমার প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠেছে? কে জানে, কুসুম কোন চালাকি করছে কি না? বিনোদকে নিজেদের বাড়িতে রাখার অধিকার তার আছে কি না—এই সব নানান ভাবনায় আমার মন বড় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কুসুমের প্রতিও তীব্র রাগ জমে। নিশ্চয়ই তাদের দুজনের মাঝে চিঠি বিনিময় হতো। আমি আবার কুসুমের চিঠিটা বার করে পড়ি, এবার প্রতিটি শব্দে আমার জন্য বেশ কিছু চিন্তা-ভাবনার সামগ্রী ধরা দেয়। মনে মনে স্থির করি, কুসুমকে একটা চিঠি লিখে প্রচুর গাল-মন্দ করি। অর্ধেক চিঠি লিখেও ফেলেছিলাম, তারপর সেটাকে ছিঁড়ে ফেলি—সেই মুহূর্তে বিনোদকে একটা চিঠি লিখি। তোমার সঙ্গে কখনও দেখা হলে,

সেই চিঠিটা দেখাবো ; যা কিছু মুখে এসেছে, বক্‌বক্‌ করে গেছি। কিন্তু এই চিঠিটার গতিও সেরকম হলো, যা কুসুমকে লেখার গতি হয়েছে। লেখা শেষ করার পর বুঝতে পারি, এটা একটা বিক্ষিপ্ত হৃদয়ের ডিলিরিয়াম। আমার মনে শুধু এ ব্যাপারটা আরও গভীরভাবে গেঁথে বসছিল যে, বিনোদ এখন কুসুমের কাছেই আছে। ঐ ছলনাময়ী তার ওপর যদি টোনা করে থাকে।

এই দিনটাও এভাবে পার হয়। ডাকপিওন কয়েকবার আসে, কিন্তু আমি তার দিকে চোখ তুলেও দেখি না। চন্দ্রা আমি বলতে পারছি না, আমার হৃদয় কেমন রাগে কাঁপছিল ; যদি এ সময় কুসুমের দেখা পেতাম, তাহলে না জানি কি কাণ্ডই করে বসতাম।

রাত্রে শুয়ে থাকতে থাকতে ভাবি, বিনোদ ইউরোপে রওনা হয়নি তো। মন একেবারে অস্থির হয়ে ওঠে। মাথা এমন ঘুরতে থাকে, যেন আমি জলে ডুবে যাচ্ছি। যদি সে ইউরোপের পথে রওনা দেয়, তাহলে আর কোন আশা নেই—আমি সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছেড়ে উঠে বসি। ঘড়ির দিকে নজর দিই—রাত তখন দুটো। চাকরকে জাগিয়ে তুলি। তারপর আমি টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে হাজির হই। টেলিগ্রাফবাবু চেয়ারেই আধশোয়া অবস্থায় ঘুমোচ্ছিল। অনেক ডাকাডাকিতে চোখ খোলে। আমি তাকে রিপ্লাই টেলিগ্রাম করতে দিই। সে যখন টেলিগ্রাম করে দেয়, আমি তাকে জিজ্ঞেস করি—এর জবাব কখন আসবে ?

টেলিগ্রাফ বাবু বললেন—জ্যোতিষীর কাছে এ প্রশ্ন করুন গে। কে জানে, উনি কখন জবাব দেবেন। টেলিগ্রামের পিওন তো আর তার কাছ থেকে জোর করে জবাব লিখিয়ে নিতে পারে না। যদি অন্য কোন কারণ না থাকে, তাহলে আটটা ন'টার ভেতরে জবাব এসে পড়া উচিত।

দুশ্চিন্তায় মানুষের বুদ্ধি স্থির থাকে না। বোকার মত অর্থহীন একটা প্রশ্ন করে আমি নিজেই ভয়ানক লজ্জায় পড়ি। ভদ্রলোক না জানি মনে মনে আমায় বোকা ঠাউরেছে। যা হোক, আমি সেখানেই একটা বেঞ্চের ওপর বসে প্রতীক্ষা করতে থাকি। বিশ্বাস করবে না, সকাল ন'টা অব্দি আমি সেখানে ঠায় বসে থাকি। ভেবে দেখো, ক'ঘণ্টা। পাকা সাত ঘণ্টা। কত লোক এল গেল, কিন্তু আমি সেখানে ঠায় বসে থাকি। টেলিগ্রাফের যন্ত্র যেই খট্‌খট্‌ শব্দ করে উঠতো, আমার বুকে ধড়াস ধড়াস করে কাঁপন শুরু হতো। ভদ্রলোক পাছে আবার রেগে ওঠেন, এই ভয়ে তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না। অফিসের ঘড়িতে যখন ন'টা বাজে, ভয়ে ভয়ে আমি ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করি—এখনও কি জবাব আসে নি ?

ভদ্রলোক বললেন—আপনি তো আগাগোড়া এখানেই বসে আছেন, জবাব এলে কি আমি না দিয়ে থাকি ?

আমি লজ্জার মাথা খেয়ে আবার জিজ্ঞেস করি—তাহলে কি এখন আর আসবে না ?

ভদ্রলোক মুখ ফিরিয়ে বললেন—আরও দু' চার ঘণ্টা অপেক্ষা করে দেখুন।

বোন, তার সেই কথা তীরের মত আমার হৃদয়ে এসে বেঁধে। তবুও আমি জায়গা ছেড়ে কোথাও যাই না। তখনও আশা ছিল, হয়তো উত্তর আসার পথে। দু' ঘণ্টা সময় আরও পেরিয়ে যায়, তখন আমি নিরাশ হয়ে পড়ি। হায়, বিনোদ আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে নিয়েছে।

সহসা পিছনে মোটরগাড়ির হর্ণ শোনা যায়। রাস্তা থেকে আমি একটু সরে দাঁড়াই। সেই মুহূর্তে মনে হলো, এই গাড়ির তলায় শুয়ে পড়ে জীবন বিসর্জন দিই। চোখ মুছে গাড়ির দিকে চাইতে দেখি, ভুবন বসে আছেন, তাঁর পাশে কুসুম! কুসুম! মনে হলো, একটা আগুনের দহন যেন আমার পা বেয়ে চড়াৎ করে মাথা ভেদ করে বেরিয়ে যায়। ওঁদের দৃষ্টি থেকে আমি সরে থাকতে চাইছিলাম, কিন্তু ততক্ষণে গাড়ি থেমে পড়েছে। গাড়ি থেকে নেমেই কুসুম আমাকে জড়িয়ে ধরে। ভুবন চুপচাপ গাড়ির ভেতরেই বসে থাকেন, যেন আমায় জানে না সে। কি নির্মম, কি ধূর্ত!

কুসুম জিজ্ঞেস করে—তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম। ওখান থেকে কোন খবর এসে পৌঁচেছে ?

কথাটা এড়িয়ে যাবার জন্য আমি বলি—তুমি কবে এসেছো ?

ভুবনের উপস্থিতিতে আমার বিপদের কথা তাকে বলতে চাই না।

কুসুম—এসো, গাড়িতে এসে বসো।

'না, আমি যাচ্ছি ; সময় পেলে একবার এসো।'

কুসুম আর কোন আগ্রহ প্রকাশ করে না। গাড়িতে বসে রওনা দেয়।

বাড়ির পথে যেতে যেতে ভাবতে থাকি—ভুবনের সঙ্গে এর পরিচয় হলো কি করে ?

বাড়িতে পৌঁছে সবে বসেছি, এমন সময় কুসুম এসে হাজির। এবার সে গাড়িতে একা নয়—সঙ্গে বিনোদও বসে রয়েছে। তাকে দেখে আমি থমকে যাই। আমার উচিত ছিল, তাকে দেখে ছুটে গিয়ে হাত ধরে গাড়ি থেকে নামিয়ে আনা ;

কিন্তু আমি জায়গা থেকে এতটুকুও নাড়ি না। প্রস্তর মূর্তির মত স্থির বসে থাকি।

পরমুহূর্তে কুসুম বিনোদকে গাড়ি থেকে নামায়, তারপর তার হাত ধরে ধীরে ধীরে নিয়ে আসে। লক্ষ্য করি, বিনোদের চেহারা একেবারে ফ্যাকাশে-হলুদ হয়ে পড়েছে এবং এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, নিজের পায়ে ভর রেখে দাঁড়াতে পারছে না। আমি ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করি, কি হয়েছে, তোমার এই অবস্থা কেন?

কুসুম বলে—অবস্থা পরে জেনো। এখন তাড়াতাড়ি তক্তপোশে বিছানা পেতে দাও। শোনো, একটু দুধের ব্যবস্থা করো।

সঙ্গে সঙ্গে আমি বিছানা পেতে দিই, বিনোদকে ধরাধরি করে শোয়ানো হয়। দুধ রাখাই ছিল। কুসুম এ সময় নিপুণ গৃহকর্ত্রীর ভূমিকা নেয়। ওর কথা মত, ইশারা মাফিক আমি কাজ করে চলি। চন্দ্রা, সত্যি বলছি, এ সময়ে আমি টের পাই, কুসুমের প্রতি বিনোদের যতটা বিশ্বাস, আমার প্রতি তার সামান্যতম নেই।

বিনোদ ঘুমিয়ে পড়লে, অশ্রুভরা চোখে আমি কুসুমকে জিজ্ঞেস করি—কুসুম, ব্যাপারটা কি? কিসের রাগ আমার ওপর? টেলিগ্রাম করলাম, তার কোন জবাব নেই। রাত দুটোর সময় একটা আরজেণ্ট ও রিপ্লাই-পেইড টেলিগ্রাম পাঠালাম। সকাল দশটা অব্দি টেলিগ্রাম অফিসে বসে উত্তরের প্রতীক্ষায় কাটালাম। সেখানে থেকে ফেরার পথে, রাস্তায় তোমার সঙ্গে দেখা। একে তুমি কোথায় পেলে?

কুসুম আমার হাত ধরে টানতে টানতে পাশের ঘরে নিয়ে যায়, তারপর জিজ্ঞেস করে—আচ্ছা, ভুবনের সঙ্গে তোমার কি ব্যাপার ঘটেছে বলো ত? সত্যি করে বলবে।

আমি বাধা দিয়ে বলি—কুসুম, এ প্রশ্ন করে তুমি আমার প্রতি অন্যায় করছো। তোমার নিজেরই বোঝা উচিত ছিল এসব ব্যাপার একেবারে অন্তঃসারশূন্য। বিনোদ নিঃসন্দেহে ভুল বুঝেছেন।

'কোন কারণ ছাড়াই?'

'আমার যতদূর ধারণা, এতে কোন কারণ ছিল না।'

'আমি কিন্তু সহজে মানতে রাজী নই। আসলে তুমি বিনোদকে রাগাবার জন্য, ওর মনে ঈর্ষা জাগাবার জন্য, কিছুটা নাড়া দেবার জন্য, তুমি এসব কাণ্ড-কারখানা করেছিলে।'

কুসুমের অনুমান শুনে আমি বিস্মিত হই; বলি—না, না, ওটা ঠাট্টা মাত্র।

'তোমার কাছে যা ছিল ঠাট্টা, বিনোদের কাছে সেটাই ছিল বজ্রাঘাত। ওর সঙ্গে এতদিন বাস করেও চিনতে পারনি। আশ্চর্য।'

আমি নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়ে বলি—বিনোদের উচিত ছিল আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করা।

কুসুম হেসে বলে—হ্যাঁ, এটাই সে করতে পারে না। তোমাকে এমন কথা জিজ্ঞেস করা তার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। স্ত্রীর দৃষ্টি থেকে পতিত হয়ে বেঁচে থাকা এমন ধরনের পুরুষ নয় সে। যাক্—আমার ঠিকানা তার জানা ছিল, এখান থেকে সোজা সে আমার কাছে গিয়ে হাজির হয়। বুঝতে পারি তোমার সঙ্গে ওর মিল হয়নি। সত্যি বলতে কি, তোমার ওপর সন্দেহ হয়।

আমি জিজ্ঞেস করি—'কেন ? আমাব ওপর সন্দেহ হলো কেন ?'

'কেননা, আমি তোমায় আগে থেকে জানি।'

'এখনও কি আমার ওপর সন্দেহ আছে ?'

'নেই। তবে এর কারণ তোমার সংযম নয়—পরম্পরা বলা চলে। এই সময়ে আমি তোমাকে স্পষ্ট কথা বলছি, তুমি আমায় ক্ষমা করো।'

'তোমার কি ধারণা, আমি বিনোদকে ভালবাসি না।'

'না, তা নয়। আসলে বিনোদকে তুমি যত ভালবাস, তার চেয়ে বেশি ভালবাসো নিজেকে। অন্ততঃ দশদিন পূর্বেও এ ব্যাপারটা স্পষ্ট ছিল। নইলে, এ রকম সংকটময় অবস্থা এসে হাজির হতো না। বিনোদ এখান থেকে সোজা আমার কাছে গিয়ে হাজির হয়, দু-দিন থেকে সোজা বোম্বে চলে যায়। আমি তাকে অনেকবার জিজ্ঞেস করি, কিন্তু সে ব্যাপারটা বলেনি। সেখানে গিয়ে একদিন বিষ খেয়ে নেয়।'

আমার মুখ সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে।

'বোম্বে পৌঁছেই সে আমায় একখানা চিঠি দিয়েছিল। তাতে এখানকার যাবতীয় খবরাখবর লিখেছিল, শেষে আমায় জানিয়েছিল—এই জীবন সম্পর্কে আমি একেবারে তিত-বিরক্ত, মৃত্যু ছাড়া আমার আর নিস্তার নেই।'

আমি একটা হিম নিঃশ্বাস নিই।

'এই চিঠি পেয়ে আমি ভয় পেয়ে যাই এবং সঙ্গে সঙ্গে তক্ষুণি বোম্বে রওনা হয়ে পড়ি। বোম্বে পৌছে দেখি, বিনোদের মরণাপন্ন অবস্থা। জীবনের কোন আশা নেই। আমার সম্পর্কিত একজন সেখানে ডাক্তার। তাকে তাড়াতাড়ি ডেকে এনে দেখাতে উনি বললেন—ও বিষ খেয়েছে। দ্রুত চিকিৎসা আরম্ভ হয়, ওষুধ দেয়। তিন দিন তিন রাত ডাক্তার সাহেবের কাছে একাকার হয়ে যায়।

আর আমি ? একটি মুহূর্তের জন্য বিনোদের কাছছাড়া হইনি। তিনদিন পর তার চোখ খোলে। তোমার প্রথম টেলিগ্রাম আমি পেয়েছিলাম, কিন্তু জবাব দেবার সময় ছিল না। আরো তিনদিন বোম্বেতে থাকতে হয়। বিনোদ এত-দূর দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, তার পক্ষে এত দীর্ঘ জার্নি অসম্ভব ছিল। চতুর্থ দিনে, তাকে যখন এখানে আসার প্রস্তাব দিই, সে বলে ওঠে—আমি আর সেখানে ফিরবো না। তাকে আমি অনেক করে বোঝাই, তখন সে এই শর্তে রাজী হয়—আমি যেন আগে এসে এখানকার পরিস্থিতি দেখে যাই।'

আমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে—'হা ঈশ্বর! আমি সত্যি হতভাগিনী।'

'হতভাগিনী নও তুমি। শুধু বিনোদকে বুঝতে পারনি। সে চাইছিল, আমি যেন একা আসি এখানে, কিন্তু তাঁকে এই অবস্থায় ফেলে আসা উচিত মনে করিনি। গত পরশু আমরা সেখান থেকে রওনা দিই। এখানে পৌঁছে বিনোদ ওয়েটিংরুমে ওঠে, আমি ঠিকানা খোঁজ করে ভুবনের কাছে যাই। দেখা পেয়েই ভুবনকে আমি এমন ধমক দিই, বেচারা একেবারে কেঁচো হয়ে যায়। সে বেচারা আমাকে এও বলে, তুমি নাকি ওকে গালমন্দ করেছো। লোকটাকে দেখতে খারাপ লাগে, কিন্তু মন তেমন খারাপ নয়। অথচ দেখো, রূপ বা সৌন্দর্যের তুলনায় আমি তোমাব নখের যুগ্যি নই। রূপ ও সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি তুমি সেবার ভাবনাও গ্রহণ করো, তাহলে তোমার মত সুখী আর কে আছে……'

আমি কুসুমের পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। কাঁদতে কাঁদতে বলি—বোন, তুমি আমার যা উপকার করেছো, আমৃত্যু আমি তোমার কাছে ঋণী রইলাম। তোমার সাহায্য—সহযোগিতা যদি আজ না পেতাম, তাহলে কি যে আমার গতি হতো……

বোন, কুসুম কালই ফিরে যাবে। তাকে দেবীপ্রতীম মনে হচ্ছে। মন চায় তার চরণ ধুয়ে জল খাই। তার মারফত শুধু যে বিনোদকে পেয়েছি, তাই নয়, বরং সেবার প্রকৃত কর্তব্যজ্ঞানও লাভ করেছি। আজ থেকে আমার জীবনের নতুন যুগ শুরু হল—যাতে ভোগ-বিলাস নয়, বরং সহৃদয়তা এবং আন্তরিকতার প্রাধান্য থাকবে। ইতি—

তোমার

পদ্মা

মুক্তিমার্গ

সেপাইর যেমন নিজের লাল পাগড়ীর ওপর, সুন্দরীর যেমন নিজের গয়নার ওপর এবং কবিরাজের যেমন সম্মুখে উপবিষ্ট রোগীর ওপর গর্ব হয়, ঠিক তেমনি গর্ব চাষীর হয় নিজ ক্ষেত আন্দোলিত অবস্থায় দেখে। ঝীংগুর যখন নিজের আখ-ক্ষেত দেখে, তার মাঝে যেন নেশা ছেয়ে যায়। তিন বিঘের আখ। ছ'শ টাকা অনায়াসেই পাওয়া যাবে। আর ভগবান যদি পাল্লা ভারি করে, তাহলে তো কথাই নেই। বলদ জোড়া বুড়ো হয়ে গেছে। এবার বটেসর মেলা থেকে নতুন গাই নিয়ে আসবে। যদি বিঘে দুই ক্ষেত কোথাও পাওয়া যায়, তাহলে লিখিয়েও নেবে। টাকার জন্য ভাবনা কিসের। বেনে এখন থেকেই খোসামোদ করতে শুরু করেছে। হুঁ, এমন কেউ নেই, যার সঙ্গে সে গাঁয়ে ঝগড়া-বিবাদ করে নি। নিজের সমকক্ষ সে কাউকে মনে করে না।

একদিন সন্ধ্যের সময় সে তার ছেলেকে কোলে নিয়ে মটরশুটি তুলছিল। এমন সময় একটা ভেড়ার পালকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল, মনে মনে সে বলে ওঠে—এদিকে ভেড়া নিয়ে যাবার রাস্তা নেই। ক্ষেতের আল বেয়ে কি ভেড়াগুলোকে নিয়ে যাওয়া যায় না? ক্ষেত মুড়োবে, চরে নষ্ট করবে। এর ক্ষয়-ক্ষতি দেবে কে? মনে হচ্ছে, এগুলো বুদ্ধু মেষপালকের। বাছাধনের বড্ড দেমাক হয়েছে; তাই ক্ষেতের মাঝ-বরাবর ভেড়া নিয়ে এগিয়ে আসছে। ওর ঠ্যাটামি দেখ! আমি দাঁড়িয়ে আছি দেখছে, তবুও ভেড়াগুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না। কেউই আমাকে যখন রেয়াৎ করেনি, আমিই বা ওকে খাতির করবো কেন? একটা ভেড়া যদি কিনতে যাই, অমনি পাঁচ টাকা চেয়ে বসবে। দুনিয়াভর চার টাকায় কম্বল পাওয়া যায়, আর ও পাঁচ টাকার নীচে কথাই বলতে চায় না।

এরিমধ্যে ভেড়ার পাল ক্ষেতের ধারে এসে পৌঁছয়। ঝীংগুর উঁচু গলায় বলে ওঠে—অ্যাই, ভেড়াগুলোকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

বুদ্ধু নম্রভাবে বলে—মহতো, আলের ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাবে। ঘুরে যেতে গেলে ক্রোশখানিক পথ পাক খেতে হবে।

ঝীংগুর—তা, তোমার পাক খাওয়া বাঁচাতে গিয়ে আমার ক্ষেত তছনছ করি, কেমন? আলের ওপর দিয়ে যদি যেতেই হয়, আরো অন্যের ক্ষেতের আল আছে, তা দিয়ে যাচ্ছ না কেন? বলি আমাকে কি হাড়ি-মুচি ভেবেছো? নাকি টাকার খুব গরম হয়েছে? যাও, ফিরিয়ে নিয়ে যাও বলছি!

বুদ্ধু—মহতো, আজ যেতে দাও। আর কোনদিন যদি এদিক দিয়ে যাই, তাহলে যা ইচ্ছে সাজা দিও।

ঝীংগুর—বললাম না ফিরিয়ে নিয়ে যাও এদের। যদি একটাও ভেড়া আলের এপারে উঠে আসে, তাহলে মনে রেখো—তোমার নিস্তার নেই।

বুদ্ধু—মহতো, তোমার একটা আখও যদি ভেড়ার পায়ে ক্ষতি হয়, তাহলে আমায় বসিয়ে একশটা গালাগাল দিও।

বুদ্ধু বেশ বিনয়ের সঙ্গে কথা বলছিল, কিন্তু ফিরে যাবার ব্যাপারে সে নিজের পরাজয় বলে ধরে নিয়েছিল, মনে-মনে ভাবে, সামান্য চোটপাটে যদি এভাবে ভেড়া ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে আর ভেড়া চরানো হয়েছে। আজ ফিরে গেলে, কাল আর যাবার কোন রাস্তাই পাওয়া যাবে না। সকলেই তখন নিজের নিজের জোর খাটাবে।

বুদ্ধুও পোড় খাওয়া লোক। বারো কুড়ি ভেড়া। সেগুলো ক্ষেতে চরানোর জন্য ফি-রাত আট আনা কুড়ি মজুরী পায়, তাছাড়া দুধ বিক্রি করে; লোম দিয়ে কম্বল তৈরি করে। ভাবে—খুব যে গরম দেখাচ্ছে, আমার করবেটা কি? আমি ত আর ওর তাবেদারীতে নেই।

ভেড়ার পাল সবুজ পাতা দেখতে পেয়ে অধীর হয়ে ওঠে। ক্ষেতের ভেতরে ঢুকে পড়ে। বুদ্ধু ওদের লাঠির প্রহারে ক্ষেতের ধার থেকে সরাতে থাকে, আর ওরা এদিক-ওদিক ছিটকে সরে আবার ক্ষেতের ভেতরে ঢুকে পড়ে।

ঝীংগুর রেগে আগুন হয়ে ওঠে—তুই আমার ওপর গাজোয়ারী করছিস, তোর সা মজা বার করে দেবো।

বুদ্ধু—তোমাকে দেখে ওরা ঘাবড়াচ্ছে। তুমি একটু সরে দাঁড়াও, আমি সব কটাকে বার করে নিচ্ছি।

ঝীংগুর ছেলেকে কোল থেকে নামায়, তারপর লাঠি নিয়ে ভেড়ার পালে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ধোপাও সম্ভবতঃ এমন নিষ্ঠুর ভাবে গাধাকে মারধোর করে না। কোন ভেড়ার পা ভাঙ্গে, কোনটার কোমর। সব কটা ব্যা-ব্যা শব্দে আর্ত-চিৎকার শুরু করে। বুদ্ধু চুপচাপ তার সেনানীর বিধ্বংস স্বচক্ষে দেখতে থাকে। সে ভেড়াগুলোকে হাঁকায় না, ঝীংগুরকেও কিছু বলে না; কেবল চুপচাপ দাঁড়িয়ে এই তামাশা দেখতে থাকে। মিনিট দুয়ের মধ্যেই ঝীংগুর অমানুষিক পরাক্রমে এই সেনানীদের মেরে তাড়ায়। মেষদল সংহার করে বিজয়গর্বে বলে ওঠে—এবার সোজা চলে যাও। আর কোনদিন এ পথ মাড়াবে না।

বৃদ্ধু আহত ভেড়াগুলোর দিকে তাকিয়ে বলে—ঝীংগুর, কাজটা তুমি ভাল করলে না। পরে কিন্তু আফসোস করতে হবে।

॥ ২ ॥

কদলী কর্তনও ততটা সহজ নয়, যতটা সহজ চাষীর ওপর প্রতিশোধ নেওয়া। তার সমস্ত উপার্জন ক্ষেতে অথবা গোলায়। কত না দৈব ও প্রাকৃতিক আপদ-বিপদের পর চাষের ফসল ঘরে ওঠে। আর যদি এই আপদ-বিপদের সঙ্গে বিদ্রোহ সন্ধি করে বসে, তাহলে বেচারা চাষীর পায়ের তলায় জমি থাকে না। ঝীংগুর বাড়ি ফিরে এসে অন্যান্যদের এই সংগ্রামের বৃত্তান্ত শোনায়, তারা বোঝাতে শুরু করে—ঝীংগুর, ভয়ঙ্কর কাণ্ড করেছো। এখন জেনেশুনে না-জানার ভান করলে চলবে না। বৃদ্ধুকে ত জানো, কেমন ঝগড়াটে লোক। এখনও কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি। এক্ষুণি গিয়ে ওর সঙ্গে মিটমাট করে এসো। নইলে তোমার সঙ্গে সঙ্গে গোটা গাঁয়ের বিপদ এসে হাজির হবে। ঝীংগুর গুরুত্বটা বুঝতে পারে। অনুশোচনা করতে থাকে এই ভেবে কেন যে আমি পথ রোধ করলাম। না-হয় ভেড়া কিছুটা চরতো, কি আর এমন দেউলে হতাম। আসলে চাষীদের নত হয়ে থাকাতেই মঙ্গল। আমাদের মাথা উঁচু করে চলাটা সম্ভবতঃ ভগবানেরও ভাল লাগে না। মন সায় দেয় না বৃদ্ধুর বাড়ি যেতে, কিন্তু অন্যান্যদের আগ্রহে বাধ্য হয়ে সে রওনা দেয়। অঘ্রাণ মাস। কুয়াশা জমতে শুরু করেছে। চারদিকে অন্ধকার ছেয়ে গেছে। সবে সে গাঁয়ের সীমানার বাইরে পা রেখেছে, এমন সময় সহসা আখ-ক্ষেতের দিকে আগুনের আলো দেখে চমকে ওঠে। হৃদপিণ্ড কেঁপে ওঠে তার। ক্ষেতে আগুন ধরেছে, উদ্‌ভ্রান্তের মত সে দৌড়ায়। মনকে প্রবোধ দেয়, আমার ক্ষেতে যেন না হয়। কিন্তু, যতই নিকটে এগোতে থাকে, তার আশার ছলনা ক্রমশঃ শান্ত হতে থাকে। অবশেষে অনর্থ ঘটে গেল, যা নিবারণের জন্য সে ঘর থেকে বেরিয়েছিল। হারামিটা শেষে আগুন ধরিয়েই ছাড়ল। আমার সবনাশের সঙ্গে সঙ্গে গোটা গাঁয়ের সর্বনাশ করল। এমন মনে হতে থাকে, তার ক্ষেত যেন খুব কাছে এসে পড়েছে—মাঝখানে পড়তি ক্ষেতের কোন অস্তিত্বই নেই। পরিশেষে সে যখন সত্যি-সত্যি নিজের ক্ষেতে গিয়ে হাজির হল, আগুন ততক্ষণে প্রচণ্ড রূপ ধারণ করেছে। ঝীংগুর 'হায়-হায়' আর্তচিৎকার শুরু করে। গাঁয়ের সব লোকেরা দৌড়ে আসে, আশেপাশের ক্ষেত থেকে অড়হরের চারাগাছ তুলে আগুনের ওপর আছড়াতে শুরু করে। অগ্নি ও মানব সংগ্রামের এক ভীষণ দৃশ্য তখন। এক প্রহর পর্যন্ত হাহাকার ছড়িয়ে থাকে।

কখনও এপক্ষ প্রবল হয়ে ওঠে, কখনও বা অপর পক্ষ। অগ্নি-পক্ষের যোদ্ধারা মরতে-মরতে বেঁচে ওঠে, তারপর দ্বিগুণ শক্তিতে রণোন্মত্ত হয়ে শস্ত্র প্রহার করতে থাকে। মানব-পক্ষে যে যোদ্ধার কীর্তি সর্বোজ্জ্বল, সে হলো বুদ্ধু। কোমর পর্যন্ত ধুতি তুলে, প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে, অগ্নিরাশিতে বার বার ঝাঁপিয়ে পড়ছিল, এবং শত্রুকে পরাস্ত করে কোনরকমে নিজেকে বাঁচিয়ে ফিরে আসছিল। অবশেষে মানবপক্ষের জয় হয়। হায়, এমন জয়—যা দেখে পরাজয়েরও হাসি পাবে। গোটা গাঁয়ের আখ পুড়ে ছাই ছাই হয়ে গেছিল, এবং আখের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের সমস্ত অভিলাষ—আকাঙ্ক্ষাও।

॥ ৩ ॥

আগুন যে কে ধরিয়েছে তা কারো অজানা নয়। কিন্তু কারো বলার সাহস নেই। কোন প্রমাণ নেই। প্রমাণহীন তর্কের মূল্যই বা কি! ঝীংগুরের পক্ষে ঘর থেকে বার হওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে। যেদিকে যায় গঞ্জনা সইতে হয়। লোকেরা তাকে সামনা-সামনি বলতে থাকে—তুমিই আগে আগুন দিয়েছো। আমাদের সর্বনাশ করেছো তুমিই। দেমাকে পা রাখতে মাটিতে? এখন? নিজে তো ডুবলেই, সেই সঙ্গে গাঁ-কে ডোবালে। বুদ্ধুকে যদি না চটাতে, এমন দিন কি তাহলে আজ দেখতে হতো? নিজের সর্বনাশের জন্য ঝীংগুরের তত দুঃখ হয় না, যতটা এসব জ্বালাধরা বাক্যে। সারাদিন সে ঘরে বসে থাকে। পৌষমাস আসে। সারারাত যেখানে কলুর ঘানি ঘুরতো, গুড়ের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়তো, উনুন জ্বলতো, লোকেরা উনুনের ধারে বসে হুঁকো টানতো—এখন সেখানে একেবারে চুপচাপ। শীতের প্রকোপে লোকেরা সন্ধ্যে থেকেই দরজায় কুলুপ এঁটে পড়ে থাকে, আর ঝীংগুরকে অভিসম্পাত করে। মাঘ মাস আরও কষ্টদায়ক। আখ শুধু ধনদাতাই নয়, চাষীদের জীবনদাতাও। ওরই সহায়তায় চাষীদের শীত কাটে। গরম রস খায়, আখের পাতায় আগুন সেঁকে, আখের ছিবড়ে জনারদের খাওয়ায়। গাঁয়ের কুকুরগুলো রাতে উনুনের ধারে ছাইয়ের ওপর শুয়ে থাকত, এখন ঠাণ্ডায় সবগুলো মারা গেল। বহু জন্তু জানোয়ার খাদ্যাভাবে শেষ হল। শীতের প্রকোপ বাড়তেই, গাঁয়ে জ্বর কাশি অসুখ চাড়া দিয়ে উঠলো। আর এসব বিপত্তি ঝীংগুরের দরুণ—হতভাগা, খুনী ঝীংগুরের জন্য।

ভাবতে-ভাবতে ঝীংগুর স্থির করে, হ্যাঁ, বুদ্ধুর দশাও আমার মত করে তুলবো। ওর জন্যই আজ আমার এই সর্বনাশ, আর ও কিনা শান্তিতে বাঁশি বাজাবে। আমি ওর সর্বনাশ করে ছাড়বো।

এই ঘাতক কলহের বীজ যেদিন রোপণ হয়, বুদ্ধুও সেদিন থেকে এদিকে আসা ছেড়ে দেয়। ঝীংগুর ওর সঙ্গে মেলামেশা বাড়াতে শুরু করে। বুদ্ধুকে দেখাতে চাইতো, তোমার ওপর আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। একদিন কম্বল আনার অজুহাতে যায়, পরে আবার দুধ আনার অজুহাতে। বুদ্ধু তাকে খুব সম্মান আপ্যায়ণ করে। মানুষ তার শত্রুকেও তামাক খেতে দেয়, সে তাকে দুধ-শরবত না খাইয়ে ছাড়ে না। ঝীংগুর ইদানীং একটা পাট-কলে দিন-মজুরী করতে যায়। সেখানে বেশীর ভাগ সময়ে কয়েকদিনের মজুরী একসঙ্গে দেয়। বুদ্ধুর তৎপরতায় ঝীংগুরের রোজকার খোরাকি চলত। তাই ঝীংগুর আরো মেলামেশা বাড়ায়। একদিন বুদ্ধু জিজ্ঞেস করে—ঝীংগুর, আখ-ক্ষেতে আগুন ধরানো লোকটাকে যদি আজ পাও, তাহলে কি করবে? সত্যি করে বলো।

ঝীংগুর গম্ভীরভাবে বলে—তাকে আমি এই কথাই বলবো, ভাই, তুমি যা করেছো, খুব ভাল করেছো। আমার সমস্ত অহঙ্কার ভেঙ্গে দিয়েছো; আমায় মানুষ করে তুলেছো।

বুদ্ধু—আমি যদি তোমার জায়গায় হতাম, তাহলে তার ঘর না জ্বালিয়ে ছাড়তাম না।

ঝীংগুর—কটা দিনের জীবন; ঝগড়া-শত্রুতা বাড়িয়ে লাভ কি ভাই? আমার যা সর্বনাশ হবার হয়েছে, এখন তার সর্বনাশ করে আমি কি পাবো বলো?

বুদ্ধু—হ্যাঁ, এটাই তো মানুষের ধর্ম। কিন্তু ভাই, রাগের বশেই মানুষের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে।

॥ ৪ ॥

ফাল্গুন মাস। চাষীরা আখ চাষের জন্য ক্ষেতে নিড়েন দিচ্ছিল। বুদ্ধুর এখন বাজার গরম। ভেড়ার যেন লুঠ শুরু হয়েছে। রোজই দু-চারজন লোক দরজায় দাঁড়িয়ে খুব খোসামোদ করে। বুদ্ধু কারও সঙ্গে সোজা মুখে কথা বলে না। ভেড়ার দর দ্বিগুণ করে দিয়েছে। কেউ আপত্তি করে উঠলে, সে সরাসরি বলে দেয়—ভাই, তোমার গলায় তো আর ভেড়া বেঁধে দিচ্ছি না। ইচ্ছে না হলে রেখো না। তবে যা বলেছি, তা থেকে এক কানাকড়িও কম হবে না। তা, লোকেদের গরজ, এমন রুক্ষ-মেজাজের পরেও তাকে ঘিরে থাকে, যেন পাণ্ডারা কোন তীর্থযাত্রীর পেছনে পড়ে আছে।

মা-লক্ষ্মীর আকার খুব একটা বড় নয়, সময়ানুসারে তাও ছোট-বড় হতে থাকে। এমন কি কখনও কখনও নিজের বিশাল আকৃতি গুটিয়ে কাগজে ছোট

অক্ষরের মধ্যে সীমিত করে ফেলেন। কখনও বা মানুষের ভিড়ে গিয়ে বসেন, তখন আবার আকার লোপ পায়। কিন্তু, তাঁর বসবাসের জন্য অনেকটা জায়গার দরকার পড়ে। তিনি আসেন, ঘর তখন বাড়তে শুরু করে। তাঁর পক্ষে তখন আর ছোটঘরে থাকা সম্ভব হয় না। বুদ্ধুর ঘরও বাড়তে থাকে। দরজার সামনে বারান্দা তৈরি হয়, দুটোর বদলে ছ'টা কামরা তৈরি হয়। বরং বলা চলে, নতুন ভাবে ঢেলে বাড়ি তৈরী হয়। কোন চাষীর কাছ থেকে কাঠ নেয়, কারো কাছ থেকে খাপরায় আঁচ দেয়ার জন্য ঘেঁষ, কারো কাছ থেকে বাঁশ, আবার কারো কাছ থেকে দরমা। দেয়াল তৈরি করার মজুরী দিতে হয়। অবশ্য নগদ টাকায় নয় ; ভেড়ার বাচ্চার পরিবর্তে। মা-লক্ষ্মীর এমনই প্রতাপ। যাবতীয় কাজ বেগারেই হয়। বিনি-মাগনায় ভাল-খাসা বাড়ি তৈরি হয়ে ওঠে। 'গৃহ প্রবেশ' উৎসবের প্রস্তুতি চলে।

এদিকে ঝীংগুর সারাদিন জন-মজুরী করে। বড়জোর আধপেটা খাবার জোটে। আর ওদিকে বুদ্ধুর ঘরে সোনা উপচে পড়ে। ঝীংগুর যদি ঈর্ষায় জ্বলতে থাকে, অন্যায়টা কোথায় ? কে সহ্য করবে এই অন্যায় ?

একদিন হাঁটতে-হাঁটতে সে চামার পাড়ার দিকে যায়। হরিহরকে ডাকে। হরিহর এসে তাকে 'রাম-রাম' করে, তারপর তামাক সাজায়। দুজনে তামাক টানতে থাকে। চামারদের এই মোড়ল ভয়ঙ্কর দুষ্ট প্রকৃতির, সব চাষীরাই ওর নামে থরথরি কাঁপে।

ঝীংগুর তামাক টানতে টানতে বলে—আজকাল গান-হুল্লোর হয় না বুঝি ? শুনতে পাই না।

হরিহর—আর গান ! বলে পেটের ধান্ধায় ফুরসত মেলে না। তারপর, তোমার আজকাল কাটছে কেমন ?

ঝীংগুর—কাটবে আর কি। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। দিন-ভর গাট-কলে মজুরগিরি করি, তবে গিয়ে উনুনে আগুন ধরে। টাকা-পয়সা আজকাল বুদ্ধুর কাছে। রাখার জায়গা ঠাহর করতে পারছে না। নতুন বাড়ি হয়েছে, আরও ভেড়া কিনেছে। এখন গৃহপ্রবেশের ধুম। সাত গাঁয়ে সুপারি বিলি হবে।

হরিহর—মা-লক্ষ্মী যখন আসেন, লোকের চোখে শান্তি নেমে আসে। অথচ ওকে দেখো, মাটিতে যেন পা পড়ে না। সবসময় মেজাজ দেখিয়ে কথা বলে।

ঝীংগুর—কেন দেখাবে না ; এ গাঁয়ে ওর সমকক্ষ আছেই বা কে ? কিন্তু

বন্ধু, এই অন্যায় যে আর চোখে দেখা যায় না। ভগবান যখন দেন, মাথা ঝুঁকিয়ে চলা উচিত। এই নয় যে, নিজের যোগ্য আর কাউকে ভাববে না। ওর জাঁক যখন শুনি, শরীরে আগুন ধরে ওঠে। কালকের যুগী আজ মহাজন। আমার সঙ্গে এসেছে পায়তাড়া কষতে। গতকালও লেংটি বেঁধে ক্ষেতে কাক তাড়াতো, আর আজ আকাশে ওর পিদিম জ্বলে।

হরিহর—তাহলে কোন উদ্‌যোগ করি?

ঝীংগুর—করবে আর কি! সেই ভয়েই তো ও আর গাই-মোষ রাখে না।

হরিহর—ভেড়া আছে তো?

ঝীংগুর—হুঁ, ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ!

হরিহর—বেশ, তাহলে তুমিই ভাবো।

ঝীংগুর—এমন উপায় বার করো, যাতে আর লাফালাফি করতে না পারে।

এরপর ফিস্-ফিস্ করে অনেক কথা হয়। এ এক রহস্য—ভাল'র মাঝে যত বিদ্বেষ দেখা যায়, মন্দের মাঝে ততই প্রেম। বিদ্বান বিদ্বানকে দেখে, সাধু সাধুকে দেখে এবং কবি কবিকে দেখে ঈর্ষান্বিত হয়। একে অপরের মুখ দর্শন করতে চায় না। কিন্তু জুয়াড়িকে দেখে জুয়াড়ি, মদ্যপকে দেখে মদ্যপ, চোরকে দেখে চোর সহানুভূতি দেখায়, সাহায্য করে। কোন পণ্ডিত যদি অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে পড়েন, তাহলে অন্য পণ্ডিত তাঁকে ওঠানোর পরিবর্তে আরও দু-ঘা দিয়ে বসবেন—যাতে সে আর উঠে দাঁড়াতে না পারেন। কিন্তু, কোন চোরের বিপদ দেখলে অন্য চোর তার সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। মন্দকার্যকে সকলেই ঘৃণা করে, তাই মন্দলোকেদের পরস্পরের মাঝে প্রেম হয়। ভালো লোকের প্রশংসা সারা সংসার করে, তাই সজ্জনদের মাঝে বিরোধ বেশী দেখা যায়। চোরকে মারধোর করে চোর কি পায়? ঘৃণা ছাড়া আর কিছু নয়। অথচ বিদ্বানকে অপমান করে বিদ্বান কি পায়। প্রশংসা।

ঝীংগুর এবং হরিহর শলা-পরামর্শ করে। ষড়যন্ত্র রচনার নিয়ম-প্রক্রিয়া নিয়ে ভাবে। তার স্বরূপ, সময় ও সূচী তৈরি হয়। ঝীংগুর যাবার সময় যেন চিতিয়ে চলে। আর কি, শত্রুকে তো ঘায়েল করে ফেলেছে, এবার যাবে কোথায় বাছাধন।

পরদিন ঝীংগুর কাজে যাবার আগে বুদ্ধুর বাড়ি যায়। বুদ্ধু জিজ্ঞেস করে—আজ যাওনি যে?

ঝীংগুর—এই তো যাচ্ছি। তোমাকে বলতে এসেছি, আমার বাছুরটাকে

যদি তোমার ভেড়ার সঙ্গে চরাতে! -বেচারা সারাদিন খুঁটোর সঙ্গে বাঁধা থাকে। না ঘাস, না চারা—কি খাওয়াই?

বুদ্ধু—ভাই, আমি আর গরুমোষ রাখি না। চামারদের তো জানই, ওদের বধ্য একটাই। ওই হরিহরটা আমার দু' দুটো গাইকে মেরে ফেলেছে। কি জানি কি সব খাইয়ে দেয়। তারপর থেকে কান মলেছি, আর কখনও গরুমোষ রাখবো না। কিন্তু, তোমার একটাই বাছুর, কে আর কি করবে! ঠিক আছে যখন ইচ্ছে পৌছে দিও।

এই বলে বুদ্ধু তার গৃহ উৎসবের সামগ্রী দেখাতে থাকে। ঘি, চিনি, ময়দা, তরি-তরকারী সব আনিয়ে রেখেছে। শুধু ৺সত্যনারায়ণ পুজোর দেরী। দেখে-শুনে ঝীংগুরের চক্ষুস্থির। এমন আয়োজন সে নিজে কখনও করেনি, না কাউকে করতে দেখেছে! মজুর-গিরি সেরে বাড়ি ফিরে সর্বপ্রথম কাজ হলো বাছুরটাকে বুদ্ধুর বাড়িতে পৌছে দেয়া। সেই রাতেই বুদ্ধুর বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজো। ব্রাহ্মণ ভোজণও। সারারাত কাটে লোকজনের সমাদর-অভ্যর্থনায়। ভেড়ার পালে যাবার আর অবকাশ মেলে না। সকালে সবে ভোজন শেষ করে উঠেছে (কেননা, রাতের খাবার সকালেই জোটে), এমন সময় কে-একজন এসে খাবার দেয়—বুদ্ধু, তুমি এখানে বসে আছো, ওদিকে যে ভেড়ার পালে বাছুরটা মরে পড়ে আছে। অদ্ভুত লোক তো তুমি, ওর দড়িটাও খুলে দাওনি।

কথাটা শুনে বুদ্ধুর বুকে যেন শেল এসে লাগে। ঝীংগুরও সেখানেই খেয়ে-দেয়ে বসে ছিল। সে বলে ওঠে—হায়, হায়, আমার বাছুর। চলো, গিয়ে দেখে আসি। আমি কিন্তু ওর গলায় দড়ি বাঁধিনি। ভেড়ার পালে রেখে সোজা বাড়ি ফিরে এসেছি। তুমি কখন দড়ি বেঁধেছো?

বুদ্ধু—ভগবান জানেন, আমি যদি ওর দড়ি দেখে থাকি। আমি সেই থেকে ভেড়ার পালের দিকে যাই-ই নি।

ঝীংগুর—না গেলে দড়ি বাঁধল কে? গিয়ে থাকবে, মনে পড়ছে না হয়তো।

একজন ব্রাহ্মণ—যাই বলো, মরেছে ঐ ভেড়ার পালের মধ্যে? দুনিয়া শুদ্ধু লোকেরা এই কথাই বলবে, বুদ্ধুর অসাবধানিতে বাছুরের মরণ হয়েছে—দড়ি যারই হোক না কেন!

হরিহর—আমি ওকে গতকাল রাতে ভেড়ার পালে বাছুর বাঁধতে দেখেছি।

বুদ্ধু—আমাকে?

হরিহর—কাঁধে লাঠি রেখে তুমি বাছুর বাঁধছিলে না?

বুদ্ধু—কি আমার সত্যবাদীরে! তুই আমায় বাছুর বাঁধতে দেখেছিস?

হরিহর—আমার উপর রাগ করছো কেন ভাই? যদি না বেঁধে থাকো, নাই বেঁধেছো—।

ব্রাহ্মণ—না-না এর বিহিত করতে হবে। গো-হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এ তো আর হাসি-তামাশা নয়।

ঝীংগুর—ঠাকুর, জেনে শুনে তো আর বাঁধেনি।

ব্রাহ্মণ—তাতে কি হয়েছে? হত্যার দায় এভাবেই লাগে; কেউ আর গরুকে মারতে যায় না।

ঝীংগুর—হ্যাঁ, গরুকে খোলা-বাঁধা বিপদেরই কাজ বটে।

ব্রাহ্মণ—শাস্ত্রে একে মহাপাপ বলে। গো-হত্যা ব্রহ্ম-হত্যার চেয়ে কম নয়।

ঝীংগুর—তা ঠিক, গরু তো বটেই। এইজন্য এত সম্মান। যিনি মাতা, তিনিই গরু। কিন্তু ঠাকুর, ভুল হয়ে গেছে। এমন কোন উপায় বার করুন, যাতে সামান্যের ওপর দিয়ে বেচারা রেহাই পায়।

বুদ্ধু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনছিল, কি সহজেই আমার মাথায় গো-হত্যার দায় চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। ঝীংগুরের কূটনীতিও সে বুঝতে পারছিল। এখন যদি আমি হাজার বার বলি, বাছুর আমি বাঁধিনি, মানবে কে? লোকেরা বলাবলি করবে, প্রায়শ্চিত্ত না করার জন্য এইসব বলছে।

ওকে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করাতে ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরও লাভ আছে। এমন সুযোগ কি কখনও হাতছাড়া করা যায়। ফলে, বুদ্ধুকে হত্যার দায়ে পড়তে হয়। ব্রাহ্মণেরও রাগ ছিল ওর প্রতি। আক্রোশ মেটানোর সুযোগ মেলে। তিন-মাসের ভিক্ষা-দণ্ড, তারপর সপ্ততীর্থ যাত্রা: উপরন্তু ৫০০ জন বিপ্রদের ভোজন এবং ৫টি গো-দান। শুনে বুদ্ধুর মাথা ঠিক থাকে না। কান্নাকাটি শুরু করে, দণ্ড কমিয়ে দিয়ে দু-মাস করে। এছাড়া আর কিছুতে রেহাই দেয় না। না কোন আপীল, না কোন ফরিয়াদ। এই দণ্ড বেচারাকে স্বীকার করে নিতে হয়।

ভেড়াগুলোকে বুদ্ধু ঈশ্বরের নামে সমর্পণ করে। ছেলেটা ছোট। স্ত্রী একা কি আর করে। সে বেচারা লোকেদের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়, মুখ আড়াল করে বলে—'বাছুরকে দিয়েছি বনবাস।' ভিক্ষা পায় বটে, তবে ভিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে দু-চারটে কঠোর অপমানজনক শব্দও তাকে শুনতে হয়। দিনমানে যা কিছু জোটে, তাই নিয়ে সাঁঝবেলায় কোন গাছতলায় কিছু রেঁধে খায়, তারপর সেখানেই পড়ে কাটায়। কষ্টের তেমন কোন পরোয়া ছিল না, ভেড়ার সঙ্গে দিনভর ঘুরে বেড়াতো, গাছতলায় শুয়ে কাটাতো, তবে খাবার এর চেয়ে কিছু

ভালই জুটতো ; কিন্তু লজ্জা হতো ভিক্ষে চাইতে। বিশেষতঃ কোন কর্কশ-মুখরা ব্যঙ্গ করে যখন বলতো, উপায় করার বেশ ভাল রাস্তা বার করেছো, তখন তার বক্ষ বিদীর্ণ হতো। কিন্তু, করবেই বা কি ?

দু মাস পর সে বাড়ি ফেরে। চুল অনেক বড় হয়ে গেছিল। এত দুর্বল, যেন ষাট বছরের বুড়ো হয়ে গেছে। তীর্থযাত্রার জন্য টাকা-পয়সা যোগাড় করা দরকার, কিন্তু মেষপালককে ধার দেয় কোন্ মহাজন ? ভেড়ার ওপর ভরসাই বা কতটুকু ? মাঝে-মাঝে রোগ যখন ছড়ায়, রাতারাতি দল-কে-দল একেবারে সাবাড় হয়ে যায়। তার ওপর জ্যৈষ্ঠ মাস, ভেড়া থেকে কোন আমদানী হবার আশা নেই। যদি বা এক তেলি রাজী হয়, তাও টাকায় দু আনা সুদে। আট মাসে সুদ মূলধনের সমান হয়ে দাঁড়াবে। বুদ্ধুর টাকা ধার করার সাহস হয় না সেখানে। এদিকে দু'মাসে বহু ভেড়া চুরি হয়ে যায়। ছেলে নিয়ে যেত চরাতে। অন্য গাঁয়ের লোকেরা চুপি-চুপি দু-একটা ভেড়া ক্ষেতের ভেতর কিম্বা বাড়ির ভেতর লুকিয়ে ফেলত, পরে সেটাকে মেরে খেয়ে ফেলত। ছেলে বেচারা ধরতে পারত না, যদি বা দেখতে পেত, ঝগড়া করবে কিসের ভরসায়। গোটা গাঁ এক হয়ে দাঁড়াত। এভাবে চললে এক মাসে ভেড়া আর অর্ধেক থাকবে না। ভয়ঙ্কর সমস্যা। বিফল হয়ে অগত্যা বুদ্ধু এক কসাইকে ডেকে সবকটা ভেড়া ওর কাছে বিক্রি করে দেয়। পাচশ টাকা হাতে পায়। তা থেকে দু'শ টাকা নিয়ে তীর্থযাত্রা করতে বেরোয়, আর বাকি টাকাটা ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য রেখে যায়।

বুদ্ধু চলে যাবার পর তার বাড়িতে দু-দুবার সিঁদ কাটে। কিন্তু সৌভাগ্য যে, হৈচৈ করার ফলে টাকাটা রক্ষে পায়।

॥ ৫ ॥

শ্রাবণ মাস। চারদিকে সবুজ ছেয়ে আছে। ঝীংগুরের বলদ নেই, ক্ষেত ভাগ-চাষীকে দিয়েছে। বুদ্ধুও প্রায়শ্চিত্ত থেকে নিবৃত্ত হয়েছে, সেই সঙ্গে মায়ার ফাঁস থেকেও। এখন ঝীংগুরের কাছেও কিছু নেই, বুদ্ধুর কাছেও নেই। কে কাকে দেখে হিংসেয় জ্বলবে ? আর কেনই বা জ্বলবে ?

পাট কল বন্ধ হবার ফলে ঝীংগুর এখন বেলদারীর কাজ করে। শহরে এক বিশাল ধর্মশালা তৈরি হচ্ছিল। হাজার-হাজার কুলি-মজুর কাজ করছিল। ঝীংগুরও তাদের মাঝে একজন। সাতদিনের মজুরী হপ্তা নিয়ে বাড়ী ফেরে, সারারাত থেকে পরদিন সকালে আবার কাজে ফিরে যায়।

বুদ্ধুও কাজের খোঁজে সেখানে গিয়ে হাজির হয়। জমাদার দেখে, দুর্বল লোক, কঠিন কাজ এর দ্বারা হবে না। মিস্ত্রীদের জোগাড়ির জন্য রাখে। বুদ্ধু মাথায় কড়া রেখে গাঁথুনির মশলা আনতে যায়, ঝীংগুরকে দেখতে পায়। 'রাম রাম' করে। ঝীংগুর তাকে মশলা ভরে দেয়, বুদ্ধু তুলে আনে। সারাদিন তারা দুজনে চুপ-চাপ নিজের কাজ করতে থাকে।

রাত্রে ঝীংগুর জিজ্ঞেস করে—কিছু রাঁধবে না?

বুদ্ধু—নইলে খাবো কি?

ঝীংগুর—আমি একবেলা চিঁড়ে-ছোলা চিবিয়ে কাটাই। এ বেলা ছাতু দিয়ে চালিয়ে নিই। কে আর ঝামেলা করে?

বুদ্ধু—এদিক-ওদিক কাঠ পড়ে আছে, কুড়িয়ে আনো। বাড়ি থেকে আটা নিয়ে এসেছি। বাড়িতেই পেষানো। এখানে বড় আক্রা। এই পাথরের চাতালে আমি মেখে দিচ্ছি। তুমি তো আমার গড়া খাবে না, তাই তুমি রুটি সেঁকো, আমি গড়ে দিচ্ছি।

ঝীংগুর—চাটু নেই যে!

বুদ্ধু—চাটু অনেক আছে। ঐ মশলা বইবার কড়া মেজে ধুয়ে নিচ্ছি।

আগুন ধরায়, আটা মাখে। ঝীংগুর কাঁচা-পোড়া রুটি তৈরি করে। বুদ্ধু জল নিয়ে আসে। দুজনে শুকনো লঙ্কা আর নুন দিয়ে রুটি খায়। তারপর কলকেয় তামাক ভরে। দুজনেই পাথরের চাতালে শুয়ে-শুয়ে তামাক টানতে থাকে।

বুদ্ধু বলে—তোমার আখ ক্ষেতে আমিই আগুন ধরিয়েছিলাম।

ঝীংগুর খুব সহজভাবে বলে—জানি।

কিছুক্ষণ পরে ঝীংগুর বলে—বাছুরের দড়ি আমিই বেঁধেছিলাম, হরিহর ওকে কিছু খাইয়ে দিয়েছিল।

বুদ্ধুও সেই রকম ভাবে বলে—জানি।

তারপর দুজনে শুয়ে পড়ে।

সময় বিকেল। ডাক্তার চচ্‌চা গলফ্‌ খেলার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। গেটের সামনে তার কার দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় দুজন বেহারাকে একটা ডুলি বয়ে আনতে দেখা গেল। ডুলির পেছনে একজন বুড়ো লোক লাঠি ঠুকতে-ঠুকতে আসছে। ডিসপেন্সারির সামনে এসে ডুলি থামে। বুড়ো লোকটি আস্তে আস্তে দরজায় ঝুলন্ত চিকের ফাঁকে উঁকি মারে। এমন পয়-পরিষ্কার মেঝের ওপর পা রাখতেও ভয় হয়, পাছে কেউ কিছু বলে না বসে। ডাক্তার সাহেবকে টেবিলের সামনে দাঁড়ানো দেখেও তাকে কিছু বলতে সাহস হয় না।

ডাক্তার সাহেব চিকের ভেতর থেকে গর্জে ওঠেন—কে? কি চাই?

বুড়ো লোকটি হাত জোড় করে বলে—হুজুর, আমি গরীব লোক। আমার ছেলে কদিন ধরে…

ডাক্তার সাহেব সিগারে আগুন ধরিয়ে বলেন—কাল সকালে এসো, কাল সকালে। এ সময়ে আমি কোন রুগী দেখি না।

বুড়ো হাঁটু গেড়ে মেঝের ওপর মাথা ঠেকায়, বলে—দোহাই ডাক্তারবাবু, ছেলে আমার মরে যাবে। হুজুর, চারদিন ধরে চোখ খুলছে না…

ডাক্তার চচ্‌চা কব্জির ওপর দৃষ্টি ফেলেন। দশ মিনিট সময় বাকি। গলফ-স্টিক খুঁটি থেকে নামিয়ে বলে—কাল সকালে এসো, কাল সকালে। এখন আমার খেলার সময়।

বুড়ো মাথার পাগড়ি খুলে চৌকাঠের ওপর রাখে, তারপর কেঁদে ওঠে—হুজুর, একবার দেখুন। শুধু একবার চোখে দেখে দিন। ছেলেটা শেষে হাত থেকে বেরিয়ে যাবে হুজুর, সাত ছেলের মধ্যে এই একটাই বেঁচে আছে। আমরা দুজনে কেঁদে-কেটে মরে যাবো হুজুর। আপনার উন্নতি হোক, দীনবন্ধু!

এ ধরনের অভব্য গোঁয়ার লোকেরা প্রায় আসে। ডাক্তার সাহেব তাদের স্বভাবের সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত। যাই বলুক না কেউ, তারা শুধু নিজেদের কথা আউড়ে যাবে। কারোর কথা শোনো না। ডাক্তার আস্তে চিক তোলেন, তারপর বাইরে বেরিয়ে মোটর গাড়ীর দিকে এগিয়ে যায়। বুড়ো তার পেছনে দৌড়তে-দৌড়তে বলে—হুজুর! আপনার বড় ধর্ম হবে। হুজুর, একটু দয়া করেন, বড় দীন-দুঃখী আমি; সংসারে আর কেউ নেই, ডাক্তারবাবু।

কিন্তু ডাক্তার সাহেব তার দিকে মুখ ফিরিয়েও দেখেন না। গাড়ীতে বসে বলে—কাল সকালে এসো।

গাড়ী রওনা দেয়। বুড়ো কয়েক মিনিট পাথরের প্রতিমূর্তির মত স্থির-নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে। সংসারে এমন মানুষও আছে, যারা নিজেদের আমোদ-প্রমোদের সামনে কারো জীবনের পরোয়াও করে না,—সম্ভবতঃ সে এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না। সভ্য সংসার এতখানি নির্মম, এতখানি কঠোর—এমন মর্মভেদী অভিজ্ঞতা তার এযাবৎ হয়নি। সে ঐ পুরনো আমলের জীবেদের মধ্যে একজন, যারা আপদে-বিপদে অর্থাৎ আগুন নেভানো, মৃতদেহ কাঁধে বয়ে নিয়ে যাওয়া, কারো ঘরের চাল তুলে দেয়া, বা কারো ঝগড়া-বিবাদ মেটানোর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে। যতক্ষণ ঐ মোটর গাড়ী দেখা যায়, সে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে সেদিকে চেয়ে থাকে। সম্ভবতঃ তার মনে এখনও ডাক্তার সাহেবের ফিরে আসার আশা ছিল। তারপর, সে বেহারাদের ডুলি তুলতে বলে। ডুলি যে-পথে এসেছিল, সেদিকে রওনা দেয়। চারদিকে নিরাশ হয়ে বুড়ো অবশেষে ডাক্তারের কাছে এসেছিল। বহু প্রশংসা শুনেছিল তাঁর। এখান থেকে নিরাশ হয়ে সে আর অন্য কোন ডাক্তারের কাছে যায় না। ভাগ্যকে মেনে নেয়।

সেই রাতেই তার হাসি-খুশী ভরা সাত বছরের ছেলে শৈশব-লীলা শেষ করে ইহ-সংসার ত্যাগ করে যায়। বুড়ো মা-বাবার একমাত্র অবলম্বন। এর মুখ চেয়েই বেঁচে থাকত। এই প্রদীপ নিভে যেতেই তাঁদের জীবনের অন্ধকার রাত খাঁ-খাঁ করতে থাকে। বার্ধক্যের বিশাল মমতা দীর্ণ-হৃদয় থেকে বেরিয়ে সেই অন্ধকারে আর্তস্বরে কেঁদে ওঠে।

॥ ২ ॥

কয়েক বছর পেরিয়ে যায়। ডাক্তার চঢ্ঢা প্রচুর খ্যাতি ও অর্থ-উপার্জন করেন; সেই সঙ্গে তার নিজের স্বাস্থ্যও অটুট রাখেন—যা এক অসাধারণ ব্যাপার। এ তাঁর নিয়মিত জীবনের আশীর্বাদ স্বরূপ—পঞ্চাশ বছর বয়সেও তাঁর তৎপরতা ও উজ্জ্বলতা যুবকদেরও লজ্জায় ফেলে। তাঁর প্রতিটি কাজের সময় নির্দিষ্ট ছিল, এবং নিয়মের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রমও হত না। অধিকাংশ লোকেরা স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন সেই সময়ে করে, যখন সে রোগী হয়ে পড়ে। ডাক্তার চঢ্ঢা উপচার ও সংযমের রহস্য ভাল করে বুঝতেন। তাঁর সন্তান-সংখ্যাও এই নিয়মেরই অধীন। তাঁর দুটি সন্তান, একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। তৃতীয় সন্তান আর হয়নি; ফলে শ্রীমতি চঢ্ঢাকে আজও যুবতীই মনে হয়। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে।

ছেলে কলেজে পড়ে। সে-ই মা-বাবার জীবনের অবলম্বন। নম্র ও বিনয়ের প্রতিমূর্তি, ভদ্র, সভ্য, উদার মনোভাবাপন্ন, বিদ্যালয়ের গর্ব, যুব সমাজের শোভা। চোখে-মুখে উজ্জ্বলতা ফুটে বেরুতো। আজ তার বিশংতিতম জন্ম দিবস।

সন্ধেবেলা। সবুজ ঘাসের ওপর সাজানো চেয়ার। শহরের ধনী নাগরিক এবং অফিসাররা একধারে, কলেজের ছাত্ররা অন্য ধারে বসে খাচ্ছে। বিদ্যুতের আলোয়-আলোয় গোটা জায়গা জমজমাট। আমোদ-প্রমোদের উপকরণও রাখা আছে। ছোট্ট একটা প্রহসন অনুষ্ঠিত হবে। প্রহসনটা কৈলাসনাথের নিজেরই লেখা। সে আবার মুখ্য অভিনেতা। এই সময়ে সে শিল্কের সার্ট পরনে, নগ্ন মস্তকে, নগ্ন পায়ে, ইতঃস্ততঃ বন্ধুদের আপ্যায়নে ব্যস্ত। কেউ ডাকে—কৈলাস, এদিকে এসো ; কেউ ওধারে ডাকে—কৈলাস, ওদিকেই থাকবে নাকি ? সকলেই ওর পেছনে লাগছিল, ঠাট্টা-তামাসা করছিল। বেচারা নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পাচ্ছিল না। সহসা একজন রমণী তার কাছে এগিয়ে এসে বলে—কি হে কৈলাস, তোমার সাপ কোথায় ? আমায় একটু দেখাও না।

কৈলাস তার দিকে হাত এগিয়ে দিয়ে বলে—মৃণালিনী, এ সময়ে ক্ষমা করো, কাল তোমায় দেখাবো।

মৃণালিনী আগ্রহ প্রকাশ করে—না, না, তোমায় দেখাতেই হবে, আমি তোমার কথা শুনবো না। তুমি রোজ 'কাল-কাল' করো।

মৃণালিনী ও কৈলাস দুজনেই সহপাঠি, পরস্পর প্রেমে আবদ্ধ। কৈলাসের সখ সাপ পোষা, সাপ খেলানো-নাচানো। নানান ধরনের সাপ সে পুষেছে। সাপের স্বভাব ও চরিত্র পরীক্ষা করতো। কিছুদিন হলো, কলেজে সর্প সম্পর্কে সে এক জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়েছে। সাপের নাচও সে দেখিয়েছিল। প্রাণীশাস্ত্রে বড়-বড় বিশেষজ্ঞরা এই বক্তৃতা শুনে বিস্মিত হয়েছেন। এই বিদ্যা সে এক বৃদ্ধ সাপুড়ের কাছ থেকে শিখেছে। সাপেদের বিষঝাড়ার শেকড়-মূল জড়ো করা তার রোগ ছিল। যদি সে কোনক্রমে জানতে পারে—অমুক লোকের কাছে একটা ভাল জাতের শেকড় আছে, তাহলে সে আর স্থির থাকতে পারত না। সেটা সে সংগ্রহ করেই ছাড়তো। এই একটা ব্যসন তার। এ ব্যাপারে হাজার-হাজার টাকা উড়িয়েছে ও। মৃণালিনী বহুবার এসেছে, কিন্তু সাপ দেখার জন্য কখনও এত উৎসুক হয় নি। কে জানে, আজ তার ঔৎসুক্য বাস্তবিক জেগে উঠেছিল, নাকি কৈলাসের প্রতি তার অধিকার দেখাতে চাইছিল ; কিন্তু তার আগ্রহ বড় অসময়ে ফুটেছে। ঐ কুঠুরিতে ভিড় জমে উঠবে, ভিড় দেখে সাপ চমকে উঠবে ;

তাছাড়া রাত্তে সাপেদের নাড়াচাড়া করা যে কত ভয়ঙ্কর, এসব বিষয়ে মৃণালিনীর সামান্যতম বোধ নেই।

কৈলাস বলে—না, কাল তোমায় নিশ্চয়ই দেখাবো। এ সময় ভালো করে দেখাতেও পারবো না। ঘরে তিল রাখার জায়গাও পাওয়া যাবে না।

একজন মাঝপথে বলে ওঠে—দেখাচ্ছো না কেন কৈলাস, সামান্য ব্যাপারের জন্য এত টাল-বাহানা করছো? মিস গোবিন্দ, কিছুতেই শুনবেন না। দেখি, ও কি করে না দেখিয়ে যায়।

অন্য আরেকজন আরও ওপরে তোলে—মিস গোবিন্দকে এত সরল আর ভালো পেয়ে, আপনি মেজাজ নিচ্ছেন; অন্য কোন সুন্দরী মেয়ে হলে, এই সামান্য ব্যাপারে চটে যেতো।

তৃতীয়জন বিদ্রূপ করে—কথা বলাই বন্ধ করে দিতেন। এ কি সামান্য ব্যাপার। উপরন্তু আপনি দাবি করেন মৃণালিনীর জন্য জীবন দিতে পারেন।

মৃণালিনী লক্ষ্য করে এই বিলাসীবাবুরা তাকে খুব তুলে দিচ্ছে, তাই সে বলে ওঠে—শুনুন, আমার হয়ে আপনাদের ওকালতি করতে হবে না, আমি নিজেই ওকালতি করতে পারবো। এখন আমি সাপের তামাশা দেখতে চাই না। হলো ত, এবার আপনারা আসুন—।

এ কথা শুনে বন্ধুরা অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে। একজন বলে ওঠে—আপনি দেখতে চাইছেন বটে, কিন্তু কেউ দেখালে তবেই তো!

মৃণালিনীর লজ্জাতুর চেহারা দেখে কৈলাসের মনে হয়, এ সময় তার অস্বীকার করাটা বাস্তবিক খুব খারাপ লাগছে। সবে প্রীতিভোজ শেষ হয়েছে, তারপর গান শুরু; সে তখন মৃণালিনী এবং অন্যান্য বন্ধুদের সাপ-খোপের সামনে নিয়ে গিয়ে সাপুড়ে-বাঁশী বাজাতে শুরু করে। তারপর এক-একটা খোপ খুলে এক-একটা সাপ বার করতে থাকে। বাহ্। কি অপূর্ব! এমন মনে হয়, যেন ঐসব সরীসৃপ তার প্রতিটি কথা, প্রতিটি ইশারা, মনের ভাব বুঝতে পারে। কাউকে সে তুলে ধরে, কাউকে বা ঘাড়ের ওপর রাখে, কাউকে আবার হাতে জড়িয়ে নেয়। মৃণালিনী বার বার বারণ করে, এদের ঘাড়ে রেখো না। দূর থেকেই দেখাও। বরং একটু নাচ করাও। কৈলাসের ঘাড়ে সাপ জড়ানো দেখে তার প্রাণ যেন বেরিয়ে পড়তে চায়। অনুশোচনা করে, খামোকা সে ওকে সাপ দেখাতে বলেছে; কিন্তু কৈলাস মোটেই তার কথা শোনে না। প্রেমিকার সামনে নিজের সর্প-কলা প্রদর্শনের এমন সুযোগ কি সে হাত-ছাড়া করে! একজন বন্ধু টিপ্পনী কেটে ওঠে —দাঁত ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে হয়তো?

কৈলাস হেসে বলে—দাঁত ভেঙে ফেলাটা মাদারীদের কাজ। না, কারো দাঁত ভাঙ্গা হয় নি। দেখাবো নাকি? বলেই সে একটা কালো সাপ খপ্ করে ধরে, তারপর বলে—আমার কাছে এর চেয়ে বড় আর বিষাক্ত সাপ দুটি নেই। কাউকে যদি কামড়ায়, তাহলে চোখের নিমেষে মরে যাবে। এর বিষ ঝাড়ার কোন মন্ত্র নেই।' এর দাঁত দেখাবো?

মৃণালিনী ওর হাত ধরে বলে ওঠে—না না, কৈলাস। ঈশ্বরের দিব্যি, তুমি একে ছেড়ে দাও। আমি তোমার দুটি পায়ে পড়ি।

এ কথা শুনে অন্য এক বন্ধু বলে—মোটেই বিশ্বাস হয় না, তবে তুমি যখন বলছো, তাহলে ধরে নিচ্ছি।

কৈলাস সাপের ঘাড় ধরে বলে—না মশাই, আপনি নিজের চোখেই দেখে নিন। দাঁত ভেঙ্গে যদি বশে আনি, তাহলে আর কি করলুম! সাপ কিন্তু বেশ বুদ্ধিমান প্রাণী। যদি সে বিশ্বাস করে অমুক লোকের দ্বারা তার কোন ক্ষতি হবে না, সে কখনও তাকে কামড়াবে না।

মৃণালিনী যখন দেখল, ওর মাথায় ভূত চেপে বসেছে, তখন সে তামাশা না দেখানোর জন্য ভেবে বলে—বেশ! এবার ওঠো ত এখান থেকে। ওদিকে আবার গান শুরু হয়েছে। আজ আমিও তোমাদের কিছু একটা শোনালো! এই বলে সে কৈলাসের কাঁধ ধরে যাবার জন্য ইশারা করে, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যায়. কিন্তু কৈলাস যে বিরোধীদের মনে সন্দেহ-শঙ্কা সমাধান করে নিঃশ্বাস ফেলতে চায়। সে সাপের ঘাড় ধরে বেশ জোরে চাপ দেয়, এত জোরে যার ফলে তার মুখ লাল হয়ে ওঠে, শরীরের শিরা-উপশিরা ফুলে ওঠে। এ যাবৎ সাপ তার হাত থেকে এ ধরনের ব্যবহার পায় নি। হয়তো বুঝতে পারছিল না, আমার কাছ থেকে কৈলাস কি চায়! হয়তো তার ভ্রম হয়, এ বুঝি আমায় মেরে ফেলতে চায়; তাই আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়ে।

কৈলাস সাপের ঘাড় বেশ জোরে চাপ দিয়ে মুখ খুলে ধরে, তারপর বিষাক্ত দাঁত দেখিয়ে বলে—যাদের মনে সন্দেহ, তারা যেন এগিয়ে এসে দেখে। বিশ্বাস হয়েছে? নাকি এখনও সন্দেহ আছে? বন্ধুরা এগিয়ে এসে সাপের দাঁত দেখে, তারা বিস্মিত হয়! প্রত্যক্ষ প্রমাণের সামনে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বন্ধুদের সন্দেহ নিরসন করে কৈলাস সাপের ঘাড় আলগা করে দেয়, তারপর মেঝের ওপর রাখতে যায়; কিন্তু কালো গোখরো ইতিমধ্যে ক্রোধে পাগল হয়ে উঠেছিল। ঘাড় আলগা হতেই সে ফণা তুলে কৈলাসের আঙুলে ছোবল মারে, তারপর সেখান থেকে পালিয়ে যায়। কৈলাসের আঙুল বেয়ে টুপ্ টুপ্ করে রক্ত ঝরে

পড়ে। শক্ত হাতে সে আঙুল চেপে ধরে, তারপর নিজের ঘরের দিকে দৌড়য়। ঘরে টেবিলের দেরাজে একটা শেকড় রাখা ছিল, যা বেটে লাগালে নাকি ঘাতক বিষেও উপশম হয়। বন্ধুদের মধ্যে হৈ-চৈ কোলাহল দেখা দেয়। বাইরে আসরেও দ্রুত খবর পৌছয়। ডাক্তার সাহেব ব্যস্ত ত্রস্ত ছুটে আসেন। আঙুলের গোড়ায় শক্ত করে বাঁধন দেয়, তারপর শেকড়টাকে বাটার জন্য দেয়া হয়। ডাক্তার সাহেব শেকড়-টেকড়ে তেমন বিশ্বাসী ছিলেন না। সে আঙুলের দংশিত অংশটুকু ক্ষুর দিয়ে চিরে ফেলতে চান, কিন্তু কৈলাসের শেকড়ের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। মৃণালিনী তখন পিয়ানোয় বসেছে। খবর শুনতে পেয়েই সে ছুটে আসে, কৈলাসের আঙুল বেয়ে টুপ-টুপ ঝরা রক্ত রুমালে মোছে। এদিকে শেকড় বাটা চলতে থাকে, কিন্তু ঐ এক মিনিটে কৈলাসের চোখ টান টান হয়ে ওঠে, ঠোঁট ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে। এমন কি সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। মেঝের ওপর বসে পড়ে। সমস্ত অতিথিরা ঘরে এসে জড়ো হয়। কেউ কিছু বলে। এরি মধ্যে কেউ বাটা শেকড় এনে হাজির করে। মৃণালিনী সঙ্গে সঙ্গে তা আঙুলে প্রলেপ দেয়। মিনিটখানিক আরো কাটে। কৈলাসের চোখ বুজে আসে। সে শুয়ে পড়ে, হাতের ইশারায় পাখা নাড়তে বলে। মা ছুটে এসে ওর মাথা কোলের ওপর রাখে, ইলেকট্রিক ফ্যান চালিয়ে দেয়।

ডাক্তার সাহেব ঝুঁকে জিজ্ঞেস করেন—কৈলাস, কেমন বোধ করছো? কৈলাস খুব ধীরে হাত তুলে ধরে; কিন্তু কিছু বলতে পারে না। মৃণালিনী করুণ স্বরে বলে—শেকড়ে কোন কাজ হবে না। ডাক্তার নিজের মাথা চেপে ধরে—কি আর বলি, কেন যে ওর কথায় সায় দিলাম। এখন ক্ষুর চিরে দিয়েও কোন লাভ হবে না।

আধ ঘণ্টা ধরে এই অবস্থায় কাটলো। কৈলাসের অবস্থা প্রতি মুহূর্তে খারাপের দিকে যাচ্ছিল। এমন কি, ওর চোখ পাথরের মত হয়ে ওঠে, হাত-পা ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে আসে, চেহারার কান্তি মলিন হয়ে ওঠে, নাড়ীর গতি টের পাওয়া যায় না। মৃত্যুর যাবতীয় লক্ষণ ফুটে ওঠে। বাড়ীতে কোলাহল ছেয়ে যায়। মৃণালিনী এক ধারে মাথা কুটতে থাকে; অন্য দিকে মা লুটোপুটি খায়। ডাক্তার চড্ডাকে তার বন্ধুরা ধরে রাখে, নইলে ক্ষুর নিজের গলায় চালিয়ে দিত।

একজন বলে ওঠে—মন্ত্র ঝাড়ার কাউকে পাওয়া গেলে হয়তো এখনও বেঁচে উঠতে পারে।

একজন মুসলমান এটা সমর্থন করে বলে ওঠে—জনাব! কবরে চাপা পড়া লাশ ওব্দি বেঁচে উঠেছে। তেমন তেমন গুনীনও আছে।

ডাক্তার চট্টা বলে—হায়, হায়, আমার বুদ্ধিতে পাথর চাপা পড়েছিল বলেই আমি ওর কথায় সায় দিয়েছি। তখন যদি ক্ষুর চিরে দিতাম, তাহলে এই অবস্থায় এসে দাঁড়াতো না। বারবার ওকে বুঝিয়েছি, খোকা, সাপ পুষবে না, কিন্তু কে শোনে! ডাকুন, কোন ঝাঁড়-ফুক করার গুনীনকেই ডাকুন। আমার সব কিছু নিক, আমি আমার সব সম্পত্তি ওর পায়ের ওপর বিছিয়ে দেবো। তারপর কৌপীন পরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়বো, কিন্তু আমার কৈলাস, আমার আদরের কৈলাস উঠে বসুক। ভগবানের দিব্যি, কাউকে ডাকুন।

জনৈক ভদ্রলোকের সঙ্গে একজন গুনীনের পরিচয় ছিল। সে ছুটে গিয়ে তাকে ডেকে আনে, কিন্তু কৈলাসের চেহারা দেখে তার আর মন্ত্র চালানোর সাহস হয় না। বলে—এখন আর কি করার আছে, হুজুর? যা ঘটার, ঘটে গেছে।

ওরে মূর্খ, বলছো না কেন যা কিছু না ঘটার ছিল, তা ঘটে গেছে। যা ঘটার ছিল, তা আর কোথায় হল? মা-বাবা ছেলের বিয়ে কি আর দেখেছে? মৃণালিনীর কামনা-তরু কি পুষ্প-পল্লবে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে? মনের সেই স্বর্ণ-স্বপ্ন যাতে জীবন আনন্দের স্রোতে মুখর হয়ে ছিল, হায়, তা কি পূর্ণ হয়েছে?

জীবনের নৃত্যময় তারকা-মণ্ডিত সাগরে আমোদ-বসন্ত উপভোগ করতে করতে কি তাদের নৌকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে নি? যা না-ঘটার কথা, সেটাই ঘটে গেল।

সেই সবুজ-ঘন মাঠ, সেই রূপালী জ্যোৎস্না এক নিঃশব্দ সঙ্গীতের মত সমগ্র প্রকৃতিতে ছেয়ে আছে; সেই বন্ধু-বান্ধব সুহৃদবর্গ; সেই আমোদ-অনুষ্ঠানের সামগ্রী, সবই যথাযথ আছে। কিন্তু যেখানে হাসির তরঙ্গ ছিল, সেখানে এখন করুণ-ক্রন্দন এবং অশ্রু-প্রবাহ।

॥ ৩ ॥

শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে, ছোট্ট একটা ঘরে এক বুড়ো আর বুড়ী মালসার সামনে বসে শীতের রাত কাটায়। বুড়ো তামাক টানে, আর মাঝেমাঝে কাশে। বুড়ী দুটো হাঁটুর 'পরে মাথা ঠেকিয়ে আগুনের দিকে তাকিয়ে দেখে। একটা কেরোসিনের কুপি তাকের ওপর জ্বলে। ঘরে কোন খাটিয়া নেই, কোন বিছানাও নয়। এক ধারে কিছু খড় পড়ে আছে। কুঠরীতে শুধু একটা উনুন। বুড়ী সারাদিন ঘুরে বেড়িয়ে শুকনো কাঠ-পাতা জড়ো করে। আর বুড়ো রসি পাকিয়ে বাজারে বিক্রী করে আসে। এই তাদের জীবিকা। তাদের কেউ হাসতে দেখেনি, কাঁদতে দেখেনি। তাদের সারাটা সময় এই রকম বেঁচে থাকার

ব্যাপারে কাবার হয়। মৃত্যু দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে, কাঁদবার বা হাসবার সময় কোথায়! বুড়ী জিজ্ঞেস করে—কালকের জন্য শন নেই, কি কাজ করবে?

ঝগড়ু সাহ'র কাছ থেকে দশ সের ধার করে আনবো?

ওর আগের বকেয়া পয়সা দাও নি, বাকী দেবে কি?

না দিক্‌গে। ঘাসের অভাব তো হয়নি। দুপুর ওব্দি কি দু-আনার ঘাস কাটতে পারবো না?

এরি মধ্যে একজন লোক দোরগোড়ায় আওয়াজ দেয়—ভগত, ভগত, শুয়ে পড়েছো নাকি? একটু ঝাঁপটা খোলো।

ভগত উঠে ঝাঁপ খুলে দেয়। একজন লোক ভেতরে এসে বলে—শুনেছো, ডাক্তার চঢ্‌ঢা বাবুর ছেলেকে সাপে কামড়েছে।

ভগত চমকে ওঠে—চঢ্‌ঢা বাবুর ছেলে! ঐ যে ছাউনীর বাংলোয় যে থাকেন, সেই চঢ্‌ঢা বাবু?

হ্যাঁ-হ্যাঁ। শহরে বড় হৈ-চৈ। যাবার হলে যাও, মানুষ হয়ে যাবে।

বুড়ো কঠোর ভাবে মাথা নাড়িয়ে বলে—না, আমি যাবো না। আমার বয়ে গেছে। সেই চঢ্‌ঢা বাবুই তো। খুব জানি তাকে। হুঁ, ছেলেকে ওর কাছেই তো নিয়ে গেছিলাম। উনি তখন খেলতে যাচ্ছিলেন। পায়ে পড়ে বলেছিলাম, একবার দেখুন। কিন্তু একবারও মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েও দেখলেন না। ভগবান নিশ্চয়ই বসে শুনেছিলেন। এবার, এবার বুঝতে পারবেন ছেলের দুঃখ কেমন বাজে। কটা ছেলে তাঁর?

ঐ একটাই ছেলে। শুনেছি, সকলেই জবাব দিয়েছে।

ভগবানের দারুণ কারসাজ। ঐ সময় আমার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু তার একটুও দয়া হয়নি। আমি যদি আজ তার দরজার সামনে থাকতাম, তবুও কিছু জিজ্ঞেস করতাম না।

তা হলে যাবে না? আমি যা শুনেছি তোমায় বললাম।

ভালো করেছো—বেশ করেছো। বুক আমার ঠাণ্ডা হয়েছে, চোখ ঠাণ্ডা হয়েছে। ছেলের ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তুমি এখন যাও। আজ বড় শান্তিতে ঘুমুবো। (বুড়ীকে) একটু তামাক দে। এক ছিলিম আরও খাবো। হুঁ, এবার টের পাবেন মশাই। সব সাহেবিয়ানা বেরিয়ে পড়বে। আমার আর কি ক্ষতি করেছে? ছেলে মারা গেছে, রাজত্ব তো আর যায় নি; যেখানে ছ'টা ছেলে গেছে সেখানে না হয় আরও একটা গেলো, কিন্তু তোমার? তোমার তো রাজত্ব শূন্য হয়ে পড়বে। ওর জন্যই তো সকলের গলা টিপে-টিপে এতসব গড়ে তুলে

ছিলে। এবার? এবার কি করবে? হ্যাঁ, একবার দেখতে যাবো বটে; তবে দিনকতক বাদে। মেজাজ কেমন থাকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

লোকটা চলে যায়। ভগত ঝাঁপ ফেলে দেয়, ছিলিমে তামাক ভরে টানতে থাকে।

আরে দিনের বেলায় হলেও আমি যেতাম না। সওয়ারী দরজায় নিয়ে যেতে এলেও, আমি যেতাম না। হুঁ, আমি ভুলে যাইনি। পান্নার মুখ আজও আমার চোখে ভাসছে। এই অমানুষটা একবারও ওকে তাকিয়ে দেখলো না। আমি কি জানতাম না যে ও বাঁচবে না? ভাল করেই জানতাম। চড্ডা তো আর ভগবান নয়, ওর এক দৃষ্টি চেয়ে দেখলেই কি আর অমৃত ঝরে পড়বে? না, শুধু মনের ভ্রম! একটু আশ্বস্ত হতো মন। শুধু, এ জন্যই ওর কাছে ছুটে যাওয়া। এবার একদিন তাকে গিয়ে বলবো—কি সাহেব, বলুন রঙ কেমন? সকলেই খারাপ বলবে বটে, তা বলুক; কোন পরোয়া নেই। ছোটলোকদের মধ্যে নাকি সব বদগুণ থাকে। বড়লোকদের মধ্যে নাকি কোন বদগুণ থাকে না। তারা যে দেবতা।

ভগতের জীবনে এই প্রথম, এমন সংবাদ শুনেও সে বসে আছে। নব্বই বছরের জীবনে এমন কখনও হয়নি, সাপের সংবাদ শুনে সে ছুটে যায়নি। পৌষ মাসের অন্ধকার রাত, চোত-বোশেখের রোদ ও লু, শ্রাবণ-ভাদ্রে ভরা নদী-খাল—কারো সে তোয়াক্কা করেনি। সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ত—নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম। দেনা-পাওনার ভাবনা কখনও মনে জাগেনি। এটা একটা এমন তেমন কাজ নয়। প্রাণের মূল্য কে আর দিতে পারে? এটা একটা পুণ্য কাজ। শ'য়ে শ'য়ে আশাহীনেদের তার মন্ত্র জীবন-দান করেছে; কিন্তু আজ সে ঘর থেকে পা বার করতে পারে না। এ খবর শুনেও সে ঘুমোতে চলে যায়।

বুড়ী বলে—মালসার ধারে তামাক রাখা আছে। তেনের কাছে আজ আড়াই পয়সা হয়েছে। দিতে চায় না।

বুড়ী এই বলে শুয়ে পড়ে। বুড়ো কুপী নেভায়, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর আবার বসে পড়ে। শেষে শুয়ে পড়ে। কিন্তু এই খবরটা তার হৃদয়ে বোঝার মত চেপে থাকে। মনে হতে থাকে, তার কিছু একটা জিনিস হারিয়ে গেছে, যেন তার শরীরে কাপড় ভিজে গেছে, কিংবা পায়ে কাদা লেগে আছে, যেন কেউ তার মনের ভেতর বসে তাকে ঘর থেকে বেরোবার জন্য বার বার খোঁচা মারছে। বুড়ী কিছুক্ষণ পরে নাক ডাকতে শুরু করে। বুড়ো কথা বলতে বলতে শুয়ে পড়ে, সামান্য খট্‌কা বোধ হতেই জেগে ওঠে। অগত্যা ভগত উঠে পড়ে, তারপর লাঠি নেয়, খুব আস্তে আগল খোলে।

বুড়ী জিজ্ঞেস করে কোথায় যাচ্ছ ?

'কোথাও নয়, দেখছিলাম রাত কত হলো।'

'এখন অনেক রাত, শুয়ে পড়ো।'

'ঘুম আসছে না।'

'ঘুম আসবে কোত্থেকে ? মন যে পড়ে আছে চড্‌ঢার বাড়ীতে।'

'চড্‌ঢা আমার সঙ্গে কি এমন ভাল ব্যবহার করেছে, সেখানে যাবো ? সে যদি এসে পায়েও পড়ে, তবুও যাবো না।'

'উঠেছো তো এই ইচ্ছে নিয়ে ?'

'না—রে, এমন পাগল নই আমি। আমার জন্য সে কাঁটা পোঁতে, আমি কি তার জন্য ফুল লাগাবো।'

বুড়ী আবার শুয়ে পড়ে। ভগত ঝাঁপ ফেলে দেয়, আবার এসে বসে। কিন্তু তার মনের অবস্থা কিছুটা এমন, যেমন বাদ্যি-বাজনার শব্দ কানে পড়তেই উপদেশ-শ্রবণকারীর হয়ে থাকে। চোখ যদিও উপদেশ দাতার দিকে, কিন্তু কান বাজনার দিকে থাকে। মনেও বাদ্যির ধ্বনি অনুরণিত হয়। লজ্জায় সে জায়গা ছেড়ে ওঠে না। দয়াহীন প্রত্যাঘাতের ভাবনা ভগতের পক্ষে উপদেশ-দাতা; কিন্তু হৃদয় সেই হতভাগ্য যুবকের দিকে, যে এই সময় মৃত্যুর মুখে, যার কাছে প্রতিটি মুহূর্তের বিলম্ব ঘাতক-প্রায়।

সে আবার ঝাঁপ তোলে, এত আস্তে যে বুড়ী জানতেও পারে না। বাইরে বেরিয়ে আসে। সেই সময় গাঁয়ের চৌকিদার পাহারা দিচ্ছিল, বলে—উঠলে কি করে ভগত ? আজ যে বড় শীত। কোথাও যাচ্ছ নাকি ?

ভগত বলে—না, যাবো কোথায় ? দেখছিলাম, এখন কত রাত ? আচ্ছা, কটা বাজে বলতো ?

চৌকিদার বলে—এই একটা হয়তো বেজেছে, আর কত ? এক্ষুণি থানা থেকে আসছি, ডাক্তার চড্‌ঢাবাবুর বাংলোয় বেশ ভিড় জমেছে। ওর ছেলের অবস্থা তো তুমি শুনে থাকবে, লতা কামড়েছে। মরুক না কেন, তুমি চলে যাও, হয়তো বেঁচে উঠতে পারে। শুনেছি দশ হাজার দিতে রাজী।

ভগত—না, আমি যাবো না, দশ লাখ দিলেও যাবো না। দশ লাখ বলো আর দশ হাজার বলো, তা নিয়ে আমি কি করবো ? কাল হয়তো মরে যাবো, ভোগ করার জন্য কে আর বসে আছে ?

চৌকিদার চলে যায়। ভগত সামনে পা বাড়ায়। নেশায় যেমন লোকের শরীর নিজের আয়ত্তে থাকে না, পা ফেলে একদিকে, পড়ে অন্যত্র; বলে এক কথা,

মুখ দিয়ে বেরোয় আরেক—ভগতের অবস্থা এসময় কিছুটা এমন। মনে প্রতিকার আছে; কিন্তু কর্ম মনের অধীন নয়। যে কখনও তরবারী পরিচালন করেনি, ইচ্ছে থাকলেও সে কখনও তরবারী পরিচালন করতে পারবে না। তার হাত কাঁপবে, তুলতে পারবে না।

লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করে ভগত এগিয়ে যায়। চেতনা তাকে বাধা দেয়, কিন্তু উপচেতনা তাকে ঠেলে দেয়। সেবক মনিবের ওপর চেপে বসেছে।

মাঝরাত পেরিয়ে যাবার পর সহসা ভগত থেমে পড়ে। হিংসা অবশেষে কর্মে বিজয়ী হয়—আমি শুধ শুধু এতদূর চলে এসেছি। এই ঠাণ্ডা শীতে, আমার কি দরকার ছিল মরতে আসা? আরামে ঘুমিয়ে থাকিনি কেন? ঘুম না এলো, না আসুক, দু-চারটে ভজন গাইতাম। অনর্থক এতদূর ছুটে এসেছি। চড্ঢার ছেলে বাঁচুক বা মরুক, তাতে আমার কি! আমার সঙ্গে সে এমন কি ভাল ব্যবহার করেছে যে, তার জন্য আমি মরবো? দুনিয়ায় হাজার জন মরে, হাজার জন বাঁচে। কারো বেঁচে ওঠা—মরে যাওয়ায় আমার কি এসে যায়।

কিন্তু উপচেতনা এখন এক অন্যরূপ ধারণ করে, যার হিংসার সঙ্গে বেশ মিল আছে—সে ঝাড়-ফুঁক করতে যাচ্ছে না, সে গিয়ে দেখবে লোকেরা কি করছে। ডাক্তার সাহেবের কান্নাকাটি দেখবে—কি ভাবে সে মাথা চাপড়াচ্ছে, কি ভাবে লুটোপুটি যাচ্ছে। সে দেখবে, বড়লোকেরা ছোটলোকদের মত কাঁদে, নাকি চেপে যায়! তারা বিদ্বান, নিশ্চয়ই চেপে যায়। হিংসা-ভাবনাকে এভাবে ধৈর্য দিতে দিতে আবার সে এগিয়ে যায়।

এরি মধ্যে দুজন লোককে আসতে দেখা যায়। দুজনেই কথা বলতে বলতে আসছিল—চড্ঢাসাহেবের বাড়ী যে শ্মশান হয়ে গেল, সে-ই তো একমাত্র ছেলে! ভগতের কানে এই কথা কটি যায়। তার গতি আরও দ্রুত হয়ে ওঠে। ক্লান্তিতে পা আর উঠতে চায় না। শিরোভাগ এমন বেড়ে চলেছে, যেন এখনই মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে। এ ভাবে সে মিনিট দশেক হাঁটার পর ডাক্তার সাহেবের বাংলো নজরে পড়ে। বিদ্যুতের আলো জ্বলছে বটে, কিন্তু নৈঃশব্দ ছেয়ে আছে। কান্নাকাটির শব্দও শোনা যাচ্ছে না। ভগতের বুক ধড়াস-ধড়াস করতে শুরু করে। আমার দেরী হয়নি তো? সে ছুটতে শুরু করে। জীবনে সে এত দ্রুত কখনও ছোটেনি। মনে হয়, যেন তার পেছন পেছন যম তাড়া করে চলেছে।

॥ ৪ ॥

দুটো বেজে গেছে। অতিথি-অভ্যাগতরা বিদায় নিয়ে চলে গেছে। ক্রন্দনরতর মধ্যে কেবল আকাশের তারা রয়ে গেছে। আর সকলে কেঁদে-কেটে

এখন শ্রান্ত। গভীর ঔৎসুক্যে লোকেরা থেকে থেকে আকাশের দিকে চায়, ভোরের আলো ফুটে উঠলেই গঙ্গার কোলে লাশ ফেলে দিয়ে আসবে।

এমন সময় সহসা ভগত দরজায় পৌঁছে ডাক ছাড়ে। ডাক্তার সাহেব মনে করে, বুঝি কোন রোগী এসেছে। একদিন সে এই লোকটাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল; আজ সে বাইরে বেরিয়ে আসে। দেখে একটা বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে—তার কোমর বাঁকানো, ফোকলা মুখ, ভ্রূ ওব্দি সাদা। লাঠির সাহায্যে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। বিনীত নম্র স্বরে বলে—ভাই, আমার জীবনে আজ বড় বিপদ এসেছে, কিছু বলা যাবে না, তুমি পরে না হয় এসো। মাস খানিক হয়তো কোন রোগী দেখা সম্ভব হবে না।

ভগত বলে—সব শুনেছি ডাক্তারবাবু; এই জন্যই ত আমি এসেছি। খোকাবাবু কোথায়? আমায় একটু দেখতে দিন। বুঝলেন, ভগবানের বড় কারসাজ, মরা মানুষকেও বাঁচাতে পারে। কে জানে, এখনও যদি তার দয়া হয়।

চড্‌ঢা ব্যথিত স্বরে বলে—আচ্ছা, দেখো তাহলে; কিন্তু তিন-চার ঘণ্টা পার হয়েছে। যা হবার হয়ে গেছে। অনেক গুণীন ওঝা দেখে-টেখে ফিরে গেছে।

ডাক্তার সাহেবের আর আশা ছিল না। তবুও যাক, বুড়োর প্রতি দয়া হয়। ভেতরে নিয়ে যায়। ভগত মিনিট কয়েক লাশকে ভাল করে লক্ষ্য করে। তারপর স্মিত হেসে বলে—এখনও তেমন ক্ষতি হয়নি বাবু! যদি ভগবান চান, তাহলে আধঘণ্টার ভেতর খোকাবাবু উঠে বসবে। আপনি মিছিমিছি মন ছোট করবেন না। চাকরদের বলুন, জল ভরে দিক।

চাকরেরা জল ভরে ভরে কৈলাসকে স্নান করাতে শুরু করে। কল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সংখ্যায় চাকরেরা খুব বেশী ছিল না, তাই অভ্যাগতরা কম্পাউণ্ডের বাইরে কুঁয়ো থেকে জল ভরে চাকরদের দেয়, মৃণালিনী কলসি করে জল নিয়ে আসে। বুড়ো ভগত দাঁড়িয়ে মৃদু হাস্যে মন্ত্র পড়ছিল, যেন জয় তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মন্ত্র যেই শেষ হয়, অমনি সে একটা শেকড় কৈলাসকে শুঁকিয়ে দেয়। এভাবে না জানি, কত ঘড়া জল কৈলাসের মাথায় ঢালা হয়, না জানি কতবার ভগত মন্ত্র পড়ে। অবশেষে উমা যখন লাল-রক্তিম চোখ খোলে, কৈলাসও তখন লাল-লাল চোখ মেলে তাকায়। মুহূর্তে সে আড়মোড়া ভাঙ্গে, তারপর জল খেতে চায়। ডাক্তার চড্‌ঢা ছুটে গিয়ে নারায়নীকে আলিঙ্গন করে। নারায়নী ছুটে গিয়ে ভগতের পায়ের ওপর পড়ে। মৃণালিনী কৈলাসের সামনে অশ্রুভরা চোখে জিজ্ঞেস করে—এখন শরীর কেমন আছে।

মুহূর্তে চারিদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ে। বন্ধুরা অভিনন্দন জানাতে আসতে থাকে। ডাক্তার সাহেব বেশ শ্রদ্ধাভরে সকলকে ভগতের প্রশংসা করে। ভগতকে দেখার জন্য সকলেই উৎসুক ; কিন্তু ভেতরে গিয়ে দেখে ভগতের কোন পাত্তা নেই। চাকরেরা বলে—এই তো এখানে বসেই তামাক টানছিল। আমরা তামাক দিতে, সে নিল না। নিজের তামাকি বার করে হুকোয় ভরে।

চারিদিকে ভগতের যখন খোঁজ চলছে, ভগত তখন হন্ হন্ করে বাসায় ফিরছে যাতে বুড়ী জেগে ওঠার আগেই সে পৌঁছে যায়।

অতিথিরা চলে যাবার পর ডাক্তার সাহেব নারায়ণীকে বলে—কে জানে বুড়ো কোথায় চলে গেল। এক ছিলিম তামাকের জন্যও ঋণী করেনি।

নারায়ণী—আমি ভেবেছিলাম, ওকে বেশ কিছু টাকা দেবো।

চড্ঢা—জানো, রাত্রে ওকে আমি চিনতে পারিনি, কিন্তু একটু ফর্সা হতেই চিনতে পেরেছি। হ্যাঁ, একবার সে একটা রোগী নিয়ে এসেছিল। আমার এখন মনে পড়ছে, আমি তখন খেলতে বেরোচ্ছিলাম, রোগী দেখতে রাজী হইনি। সেদিনের কথা মনে করে আজ আমার যা গ্লানি হচ্ছে, আমি তা প্রকাশ করতে পারছি না। আমি এখন তাকে খুঁজে বার করবো, পায়ে পড়ে নিজের কৃত অপরাধের ক্ষমা আদায় করবো। সে যে কিছু নেবে না, তা জানি। তার জন্ম প্রশংসার জন্য হয়েছে। তার মহত্ত্ব আমায় এমন আদর্শ দিয়েছে, যা আজ থেকে আজীবন আমার সামনে জ্বল-জ্বল করবে।

বিষম সমস্যা

আমাদের দপ্তরে চারজন চাপরাশি ছিল, তাদের মাঝে একজনের নাম গরীব। খুবই সরল, দারুণ আজ্ঞাবহ, নিজের কাজে সদা তৎপর, বকুনি খেয়েও চুপ থাকে, যেমন নাম তেমন তার গুণ, বস্তুত সে গরীব লোক ছিল। বছর খানেক হলো আমি এ দপ্তরে এসেছি, কিন্তু ওকে আমি একদিনও গর-হাজির হতে দেখিনি। ন'টার সময় দপ্তরে সতরঞ্চির ওপর ওকে বসে থাকতে দেখে এমন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম, যেন সেও এই বাড়ীর কোন একটা অংশ। এত সরল, কারো কথায় সে না করতে পারত না। আর একজন চাপরাশি মুসলমান। তাকে দপ্তর শুদ্ধ, লোক ভয় পেত, জানি না কেন? ওর বড়-বড় বাগাড়ম্বর ছাড়া আমি অন্য কোন কারণ খুঁজে পাই নি। ওর কথনানুসারে ওর চাচাতো ভাই রামপুর রিয়াসতের কোতোয়াল। সবসম্মতি মতে ওকে 'কাজী' উপাধি দেয়া হয়েছিল। অন্য দুজন জাতে ব্রাহ্মণ। তাদের আশীর্বাদের মূল্য তাদের কাজের চেয়েও বেশী মহত্ত্বপূর্ণ ছিল। এই তিনজন চাপরাশি ছিল অকর্মণ্য, দর্বিনয়ী এবং কুঁড়ে। সামান্য কোন কাজ করতে বললেও নাক-ভুরু না-কুঁচকে তা করে না। ক্লার্কদের কিছুই মনে করতো না। শুধু বড়বাবুকে যা ভয় পেত, তাও মাঝে-মাঝে তার সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করে বসত। এতসব দুর্গুণ থাকা সত্ত্বেও তাদের ভিত তত খারাপ নয়, যতটা বেচারা গরীবের। প্রমোশনের সুযোগ এলে এই তিনজন টপকে যেত, গরীবকে কেউ জিজ্ঞেস করতো না। ওরা দশ টাকা করে পেত, অথচ বেচারা গরীব সাত টাকায় থেকে আছে। সকাল থেকে সন্ধ্যে অব্দি তার পা এক মিনিটও সুস্থির থাকতো না। এমন কি, ঐ তিনজন চাপরাশিও ওর ওপর মেজাজ নিত, উপরি আয়ের কোন ভাগ দিত না। উপরন্তু, দপ্তরের সব কর্মচারী এমন কি বড়বাবুও ওর ওপর রেগে উঠতো। বেশ কয়েকবার ওর জরিমানা হয়েছে, গালাগাল-বকুনি রোজকার বাঁধা ব্যবহার ছিল। এর রহস্য আমার মগজে কিছুতেই ঢুকতো না। ওর প্রতি আমার করুণা জাগত, এবং আমার ব্যবহারে ওকে বোঝাতে চেষ্টা করতাম, আমার দৃষ্টিতে ওর প্রতি যে ধারণা তা অপর তিন চাপরাশি থেকে কম নয়। এমন কি কয়েকবার ওর হয়ে কর্মচারীদের সঙ্গে ঝগড়া পর্যন্ত করেছি।

একদিন বড়বাবু গরীবকে তার টেবিল পরিষ্কার করতে বলে। সেও সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার করতে লাগে। দৈবযোগে, ঝাড়নের ঝাপটায় দোয়াত উল্টে যায়, এবং টেবিলের ওপর কালি গড়িয়ে যায়। এই দেখে বড়বাবু রাগে আর স্থির থাকতে পারে না। ওর কান দুটো ধরে পাক করে মলে দেয়, সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রচলিত ভাষার কর্কশ শব্দ বেছে বেছে তাকে শোনাতে থাকে. বেচারা গরীব চোখে অশ্রু নিয়ে চুপচাপ প্রস্তরবৎ শুনতে থাকে, যেন সে কোন খুন করে বসেছে। সামান্য একটা ব্যাপারে বড়বাবুর এমন ভয়ঙ্কর-রুদ্ররূপ ধারণ করাটা খুব খারাপ মনে হয় আমার। অন্য কোন চাপরাশি যদি এর চেয়ে বেশী অপরাধ করতো, তবু তাদের প্রতি এত কঠোর বজ্র-প্রহার হতো না। আমি ইংরেজীতে বলি—বড়বাবু, আপনি বড় অন্যায় করছেন, সে তো আর জেনে-শুনে কালি ফেলে নি। এতখানি গুরুদণ্ড দেওয়াটা অনৌচিত্যের পরাকাষ্ঠা।

বড়বাবু নরম হয়ে বলে—একে আপনি চেনেন না, এক নম্বরের বদমাইশ।

'আমি কিন্তু ওর বদমায়শী দেখি না।'

'আপনি একে এখনও চেনেন নি। এক নম্বরের পাজী। এর বাড়ীতে একজোড়া বলদের চাষ হয়, হাজার হাজার টাকার লেন-দেন হয়, কতগুলি গরু-মোষ আছে, এসবের জন্য সাংঘাতিক দেমাক।'

'বাড়ীর অবস্থা এমন হলে এখানে এসে চাপরাশিগিরি করবে কেন?'

বড়বাবু গম্ভীর গলায় বলে—বিশ্বাস করুন, ভয়ানক পাজীর পা-ঝাড়া এবং হাড়-কেপ্পনও বটে।

'যদি এমন হয়েও থাকে, তাতেও কোন অপরাধ নেই।'

'আপনি আরও কিছুদিন এখানে থাকুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন কেমন নচ্ছার লোক।'

অন্য একজন বলে ওঠে—ভাই সাহেব, এর বাড়ীতে মণে-মণে দুধ ওঠে, মণে-মণে জোয়ার, বাজরা, ছোলা, মটর, কিন্তু কখনও কি মনে হয়েছে দপ্তরের লোকেদেরও কিছু দেয়া উচিত। এসব জিনিসের জন্য এখানে আমরা হা-পিত্যেশ করে বসে থাকি। বলুন তাহলে রাগ হবে না কেন। আর সব কিছুই চাকরির দৌলতে হয়েছে, নইলে এর বাড়ীতে খুদ-কুটো পর্যন্ত জুটতো না।

বড়বাবু সঙ্কুচিত হয়ে বলে—এটা এমন কোন ব্যাপার নয়। তার জিনিস ইচ্ছে হলে দেবে নইলে দেবে না।

আমি এর মর্ম কিছুটা ধরতে পারি। বলে উঠি—সত্যি, যদি সে এমন সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের মানুষ হয়ে থাকে, তাহলে পশু ছাড়া আর কিছু নয়। আমি এটা জানতাম না।

এবার বড়বাবুও গলা ঝেড়ে কাশে, যাবতীয় সঙ্কোচ দূরে সরিয়ে ফেলে। বলে—সামান্য উপহারে কোন কিছু যায় আসে না, কিন্তু এতে দাতার সহৃদয়তা প্রকাশ পায়, তাছাড়া, তার কাছ থেকেই আশা করা চলে, যে এ ব্যাপারে যোগ্য। যার মাঝে সামর্থ্য নেই তার কাছ থেকে কেউ আশাও করে না। হা-ঘরের কাছ থেকে কি পাবে?

রহস্যের জট খুলে যায়। বড়বাবু অতি সরলভাবে সমস্ত অবস্থা জানায়। সমৃদ্ধির শত্রু সকলেই হয়, শুধু ছোট নয়, বড়রাও। আমাদের শ্বশুরবাড়ী বা বাপের বাড়ীর অবস্থা যদি গরীব হয়, তাহলে তাদের কাছ থেকে কোন প্রত্যাশা থাকে না। আমরাও তাদের ভুলে যাই। কিন্তু, অবস্থাপন্ন হয়েও যদি আমাদের খোঁজ-খবর না নেয়, পুজোপার্বণে যদি কিছু না পাঠায়, তাহলে যে বুকের ওপর সাপ গরজাতে থাকে।

কোন গরীব বন্ধুর বাড়াতে গেলে, সে যদি শুধু বিড়ি দিয়ে খাতির করে, তাও সন্তুষ্ট মনে মেনে নিই, কিন্তু এমন কে আছে যে অবস্থাপন্ন বন্ধুর বাড়ী থেকে জল-খাবার না পেয়ে উঠলে, সদা-সবদা তাকে গালাগাল না দিয়ে জল স্পর্শ করে না। সুদামা যদি কৃষ্ণের বাড়া থেকে নিরাশ হয়ে ফিরত, তাহলে হয়তো সে শিশুপাল কিংবা জরাসন্ধের চেয়েও বড় শত্রু হয়ে উঠত।

॥ ৩ ॥

দিন কয়েক পরে আমি গরীবকে জিজ্ঞেস করি—তোমার বাড়ীতে কোন চাষ-আবাদ হয় নাকি?

গরীব খুব দীনভাবে বলে—হ্যাঁ হুজুর। হয় বটে। আপনার দুটি গোলাম আছে—তারাই করে।

আমি প্রশ্ন করি—গরুমোষ আছে নাকি?

'হ্যাঁ, হুজুর, দুটো মোষ আছে। গরুটা এখন গাভিন হয়েছে। আপনাদের দয়ায় পেট চলে যায় কোন রকমে।'

'দপ্তরের বাবুদের মাঝে মাঝে খাতির করো ত?'

গরীব করুণভাবে বিস্মিত হয়ে বলে—হুজুর, বাবুদের আমি কতটুকু আর খাতির করতে পারি! মাঠে যব, ছোলা, ভুট্টা, জোয়ার আর ঘাস-পাতা ছাড়া

কিই বা হয়। আপনারা রাজা মানুষ, এই মোটা ভারী জিনিস কোন মুখে আপনাদের ভেট করি। ভয় হয়, পাছে আবার ধমক না খাই, যত বড় মানুষ না ততবড় মেজাজ! এই জন্যই কখনও সাহস করতে পারিনি। নইলে, দুধ-দইয়ের কিবা অভাব। কিন্তু মুখের মত জিনিস হওয়া চাইতো।

"একদিন বরং কিছু এনে দাও; দেখো ওরা কি বলে। শহরে এসব জিনিস মেলে কোথায়? এদেরও মাঝে-মাঝে মনে ইচ্ছে হয় মোটা-ভাড়ি জিনিসের দিকে।"

"হুজুর, যদি কেউ কিছু বলে? যদি সাহেবকে আমার বিরুদ্ধে লাগায়, তাহলে যে আমি আর কোথাও দাঁড়াতে পারবো না।"

"তার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি, তোমাকে কেউ কিছু বলবে না। যদি কেউ কিছু বলে, আমি দেখবো, বুঝলে।"

"হুজুর, আজকাল মটরের ফসল উঠেছে, কোলু চলছে। এ ছাড়া আর কিছু নেই।"

"ব্যস, ব্যস, ঐ এনো।"

"যদি কোন গোলমাল হয় আপনাকে সামলাতে হবে।"

পরদিন গরীব আসে, সঙ্গে তিনজন হৃষ্টপুষ্ট যুবক। দুজনের মাথায় দুটো ঝুড়ি। তাতে মটরের ফসল ভরা। একজনের মাথায় একটা মটকা, তাতে আখের রস। যুবক তিনজন আখের গাট কাঁধে চেপে আছে। গরীব এসে চুপচাপ বারান্দার সামনে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকে। দপ্তরে ঢুকতে সাহস হয় না, যেন কোন অপরাধ করেছে। গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ছিল, এরি মধ্যে দপ্তরের চাপরাশি এবং অন্যান্য কর্মচারীরা তাকে ঘিরে ধরে। কেউ আখ নিয়ে চিবোতে শুরু করে। কেউ বা ঝুড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এমন সময় বড়বাবুও দপ্তরে এসে হাজির হয়। ভিড় দেখে উঁচু গলায় বলে ওঠে—ওখানে এত ভিড় কিসের। যাও, নিজের নিজের কাজ করোগে।

আমি গিয়ে তার কানে-কানে বলি—গরীব বাড়ী থেকে এই সওগাত এনেছে, আপনি কিছু নিন, আমাদের কিছু বিলি করে দিন।

বড়বাবু কৃত্রিম রোষ ধারণ করে বলে—গরীব, তুমি এসব জিনিস এখানে এনেছো যে? এক্ষুনি ফিরিয়ে নিয়ে যাও, নইলে আমি এক্ষুনি সাহেবের কাছে রিপোর্ট করবো। আমাদের কি হাড়-হাভাতে মনে করেছো?

গরীবের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। সে থরথর করে কাঁপতে থাকে। মুখ থেকে একটা শব্দও বেরোয় না। আমার দিকে অপরাধী চোখে তাকিয়ে থাকে।

আমি ওর হয়ে বড়বাবুর কাছে ক্ষমা চাই। অনেক বলা-টলার পর বড়বাবু রাজী হয়। জিনিসগুলোর দু'ভাগ করে অর্ধেক নিজের বাড়ীতে পাঠায়, বাকী অর্ধেক অন্যদের ভাগ করে দেয়। এভাবে সে অভিনয় সমাপ্ত হয়।

॥ ৪ ॥

এখন দপ্তরে গরীবের সম্মান হতে থাকে। রোজকার মত এখন আর ধমক খেতে হয় না। সারাদিন আর দৌড়-ঝাঁপ করতে হয় না। কর্মচারীদের ব্যঙ্গ এবং সমশ্রেণীদের কটু-কুবাক্য আর শুনতে হয় না। চাপরাশিরা নিজে থেকে তার কাজ করে দেয়। তার নামেও সামান্য পরিবর্তন ঘটেছে। সে গরীব থেকে গরীব দাস হয়ে উঠেছে। স্বভাবেও কিছুটা বদল হয়েছে। করুণভাবের স্থানে আত্ম-গৌরবের উদ্ভব হয়। তৎপরতার স্থান আলস্য গ্রহণ করে। এখন সে মাঝে-মাঝে দেরী করে দপ্তরে ঢোকে। মাঝে-মাঝে শরীর খারাপের অজুহাতে বাড়ীতে বসে কাটায়। তার সব অপরাধ এখন ক্ষমার্হ্য। এখন সে নিজের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সচেতন। সে এখন দশদিন পাঁচদিন পর পর বড়বাবুকে দুধ-দই ভেট করে। দেবতাকে সন্তুষ্ট করা সে শিখে গেছে। সরলতার পরিবর্তে এখন তার মাঝে কুটিলতা এসে জমেছে। একদিন বড়বাবু তাকে সরকারী ফর্মের পার্শেল ছাড়াবার জন্য স্টেশনে পাঠায়। বেশ কিছু বড়-বড় প্যাকেট ছিল, ঠেলায় চাপিয়ে নিয়ে আসে। ঠেলাঅলার সঙ্গে বারোআনা মজুরী ঠিক হয়। কাগজ দপ্তরে এলে, সে বড়বাবুর কাছ থেকে বারো আনা পয়সা ঠেলাঅলার জন্য আদায় করে। কিন্তু, দপ্তরের কিছুটা দূরে গিয়ে তার মনোভাব পাল্টে যায়, ঠেলাঅলার কাছ থেকে দস্তুরি চাইতে থাকে। ঠেলাঅলা রাজী হয় না। রেগে গিয়ে গরীব সব পয়সা পকেটে পুরে নেয়, তারপর ধমক দিয়ে বলে—একটা কানা-কড়িও আর দেবো না. যাও যেখানে ইচ্ছে ফরিয়াদ করো গে। দেখি, আমার কি করতে পারো।

ঠেলাঅলা যখন দেখল, দস্তুরি না দিলে সব পয়সাই মার যায়, তখন সে কেঁদে কেটে চার আনা পয়সা দিতে রাজী হয়। গরীব তাকে আধুলি দেয় এবং বারো আনার রসিদ লিখিয়ে তার বুড়ো আঙুলের ছাপ নিয়ে নেয়। রসিদটা দপ্তরে এনে দাখিল করে।

এই অত্যাদ্ভুত কাণ্ড দেখে সকলে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। হ্যাঁ, এই সেই গরীব, মাস কয়েক আগে যে সততা এবং সরলতার প্রতিচ্ছবি ছিল। যে কখনও অন্য চাপরাশির কাছ থেকে নিজের ভাগের পয়সা চাইতেও সাহস পেত না। অন্যদের

খাওয়াতেও জানতো না, নিজের খাবার প্রশ্নই ওঠে না। ওর এই স্বভাব পরিবর্তন দেখে আমার প্রচণ্ড দুঃখ হয়। এর উত্তর দায়িত্ব কার মাথায় ?—নিশ্চিত আমারই মাথায়। আমি ওকে প্রথম ধূর্ততার পাঠ দিই। সঙ্গে সঙ্গে মনে একটা প্রশ্ন জাগে—এই যে কুটিলতা যা অপরের গলা চেপে ধরে, তার চেয়ে সেই সরলতা কি এমন খারাপ ছিল যা অপরের অন্যায় সইতো। সত্যিই, সেটা ছিল একটা অশুভ মুহূর্ত, যেদিন ওকে আমি প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির উপায় দেখিয়েছিলাম ; বাস্তবে সেটা ছিল তার পতনের ভয়ঙ্কর পথ। আমি বাহ্য-প্রতিষ্ঠায় তার আত্ম-প্রতিষ্ঠার বলিদান করেছি।

বিধ্বংস

বেনারস জেলায় বীরা নামে একটি গাঁ আছে। সেখানে এক বিধবা বৃদ্ধা নিঃসন্তান গোঁড়-রমনী বাস করতো, তার নাম ভুনগী। তার কাছে এক কাচ্চাও জমি ছিল না, বাস করার জন্য ঘরও ছিল না। তার জীবনের একমাত্র আশ্রয় ছিল একটি ভাটি! গাঁয়ের লোকেরা প্রায় একবেলা চর্ব্য বা ছাতু খেয়ে অতিবাহিত করে থাকে, তাই ভুনগীর ভাটিতে রোজই ভিড় থাকত। সে যা-কিছু ভাজতে পারত, ভেজে অথবা পিষে খেয়ে নিত, তারপর ভাটির ঝুপড়ির এককোণে পড়ে থাকত। ভোরবেলায় সে উঠে পড়ত, তারপর ভাটিতে আগুন ধরানোর জন্য চারপাশ থেকে শুকনো ঘাস-পাতা কুড়িয়ে আনত। ভাটির কাছেই ডাঁই করা থাকত ঘাস-পাতার বিরাট ঢিবি। সচরাচর দুপুরের পর ভাটি ধরত। একাদশী বা পূর্ণিমার দিন প্রথানুসারে যখন ভাটি ধরত না, কিংবা গাঁয়ের জমিদার পণ্ডিত উদয়ভানু পাণ্ডের তণ্ডুল ভাজতে হতো, সেদিন ভুনগীকে অভুক্ত অবস্থায় শুয়ে কাটাতে হতো। পণ্ডিত উদয়ভানু তাকে দিয়ে শুধু যে বেগারী ছোলা ভাজিয়ে নিত, তা নয়, উপরন্তু তার বাড়িতে জল ভরতেও হতো। মাঝে মাঝে এ-কারণেও তার ভাটি বন্ধ থাকত। যেহেতু সে পণ্ডিতের গাঁয়ে বাস করত, তাই তার কাছ থেকে সব রকমের বেগার নেয়ার অধিকার পণ্ডিতের ছিল। এটাকে কোনমতে অন্যায় বলা চলে না। অন্যায় কেবল এটুকু যে, বেগার শুখা নেয়া হতো। জমিদারের ধারণা, খাবারই যখন দেয়া হলো, তাহলে আর বেগার কিসের! সারাদিন বলদগুলোকে ক্ষেতে জোতার পর, এ ব্যাপারে কৃষকের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। সাঁঝবেলায় তাদের খুঁটির সঙ্গে অভুক্ত বেঁধে রেঁখে যদি কৃষক এমনটি না করে, তাহলে ধরে নিতে হবে সেটা তার দয়া নয়, বরং নিজের হিত চিন্তা মনে কাজ করে। যাহোক, পণ্ডিতের অবশ্য এ ব্যাপারে খুব একটা বেশী চিন্তা ছিল না, কেননা একে তো ভুনগী দু-একদিন না খেয়ে থাকলে মরে যাবে না, আর যদি বা দৈবযোগে মারা যায়, তাহলে তার জায়গায় অন্য গোঁড় খুব সহজেই রাখা যায়। বরং বলা চলে, পণ্ডিতের কম অনুগ্রহ নয়, সে ভুনগীকে তার গাঁয়ে বাস করতে দিয়েছে।

॥ ২ ॥

চৈত্র মাস, সংক্রান্তি পর্ব। আজকের দিনে নতুন শস্যের ছাতু খাওয়া হয় এবং দান করা হয়। ঘরে এদিন উনুন ধরানো হয় না। ভুনগীর ভাটি আজ গনগনে।

তার সামনে যেন মেলার মত বসেছে। নিঃশ্বাস ফেলার অবসর নেই। খদ্দেরদের তাড়াতাড়ির জন্য মাঝে মাঝে সে ঝাঁঝিয়ে উঠছিল, এরি মধ্যে জমিদারের বাড়ি থেকে দুটো বড় বড় ঝুড়ি ভর্তি শস্য এসে হাজির। সেই সঙ্গে তার প্রতি হুকুম হয়—এক্ষুনি যেন ভেজে দেয়। দু ঝুড়ি শস্য দেখে ভূনগী থ' মেরে যায়। এখন দুপুর, সূর্যাস্তের আগে এত শস্য ভাজা অসম্ভব ব্যাপার। ঘন্টা দুয়েক সময় যদি পেত, তাহলে সপ্তাহ খানেকের খাবার মত শস্য ভাজা যেত। ঠাকুর কি চোখেও দেখে না, এই যমদূতদের পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন প্রহর রাত ধরে মিছিমিছি এই ভাটি ধরিয়ে রাখতে হবে। এক নৈরাশ্য ভাবনায় সে ঝুড়ি দুটো তুলে নেয়।

চাপরাশি ধমক দিয়ে বলে—দেখিস, দেরী যেন না হয়, নইলে টের পাবি।

ভূনগী—বেশ, তাহলে এখানে বসে থাকো। ভাজা হলে নিয়ে যেও। অন্য কারো দানা ছুঁলে হাত কেটে নিও।

চাপরাশি—বসার আমার সময় নেই। তিন-প্রহরে যেন সব ভাজা হয়ে যায়।

চাপরাশি হুকুম করে চলে যায়। ভূনগী শস্য ভাজতে শুরু করে। কিন্তু মণ-খানিক শস্য ভাজা তো আর মুখের কথা নয়, উপরন্তু মাঝে-মাঝে ভাজা থামিয়ে ভাটায় আগুন উসকাতে হয়। তিন প্রহর গড়িয়ে যায়, অথচ অর্দ্ধেক ভাজাও শেষ হয় না। তার ভয় হতে থাকে, বুঝি বা জমিদারের লোক আসছে। সে আরও দ্রুত হাত চালাতে শুরু করে। পথের দিকে চায়, মাটির পাতিলে বালি ছড়াতে থাকে। বালিও একসময় ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে, খই ফুটে বেরোতে শুরু করে। তার বুদ্ধিতে কুলোয় না, সে এবার করবে কি। ভাজা হয় না, অথচ ফেলে রাখাও যায় না। ভাবতে থাকে, কি যে বিপদ! পণ্ডিত কি আমার খোরাকি চালায়, নাকি আমার চোখের জল মুছে দেয়! নিজের রক্ত শুকিয়ে মরি, তবে গিয়ে আমার খাবার জোটে। অথচ, যখনি দেখো অমনি মাথার ওপর চেয়ে থাকে। কারণ, তার ঐ চার-হাত জমিতে আমার নিস্তার। ঐ সামান্য জমির এত দাম? এ রকম কত টুকরো জমি গাঁয়ে অযথা পড়ে আছে, কত খামার খালি পড়ে আছে। সেখানে সামান্যতম দাঁত বসাতে পারে না। তাহলে কেনই বা আমার ওপর আট প্রহর এত চোটপাট। কোন কিছু হলেই ভয় দেখায়—তোর ভাটি ভেঙে ফেলবো, ধ্বংস করে ফেলবো! মাথার ওপর আজ কেউ থাকলে এতসব কথা কি আর সহ্য করতে হতো!

এসব কুৎসিত ভাবনায় সে মগ্ন ছিল, এরি মধ্যে দুজন চাপরাশি এসে রুক্ষ-কর্কশ স্বরে বলে—কি রে, দানা ভাজা হয়েছে।

ভুনগী নির্ভীক কণ্ঠে বলে—ভাজছি। চোখে দেখতে পাচ্ছ না।

চাপরাশি—সারাটা দিন কাবার হলো; অথচ তোর দ্বারা এটুকু শস্য ভাজা হয় নি? এ তুই কি ভেজেছিস, নাকি বারোটা বাজিয়েছিস! এ যে খই ফুটে বেরিয়েছে, এ দিয়ে ছাতু হবে কি করে। হা-হা, আমার সর্বনাশ করে ফেললি। দেখিস জমিদারবাবু আজ তোর কি অবস্থা করে।'

পরিণামস্বরূপ, সেই রাতে ভাটি ভেঙ্গে ফেলে দেয়া হয়। হতভাগিনী বিধবা সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়ে।

॥ ৩ ॥

ভুনগীর এখন খাবারের কোন আশ্রয় থাকে না, ভাটি ধ্বংস হওয়ার ফলে গাঁয়ের লোকেদেরও বেশ অসুবিধে হয়। কয়েক ঘরে দুপুরে খাবার জোটে না। লোকেরা পণ্ডিতের কাছে গিয়ে বলে, বুড়িকে ভাটি পাতার আজ্ঞা দিন হুজুর। কিন্তু পণ্ডিত তাদের কথায় ভ্রুক্ষেপ করে না। সে নিজের মেজাজ হ্রাস করতে চায় না। জনা কয়েক শুভাকাঙ্ক্ষী বুড়িকে অনুরোধ করে, তুমি বরং ভিন গাঁয়ে গিয়ে বাস করো। কিন্তু, বুড়ির হৃদয় এই প্রস্তাব স্বীকার করে না। এই গাঁয়েই তার দুর্দিনের পঞ্চাশ বছর কেটেছে। এখানকার প্রতিটি গাছ-পালার সঙ্গে তার ভালবাসা জন্মেছে। জীবনের সুখ-দুঃখ সব কিছু সে এই গাঁয়েই পেয়েছে। এখন জীবনের শেষ সময়ে সে কি করে ত্যাগ করে। এই কল্পনাই তার কাছে মারাত্মক সংকটময়। ভিন-গাঁয়ে সুখের চেয়ে এখানকার দুঃখও তার প্রিয়।

এভাবে একটা মাস পেরিয়ে যায়। সকাল বেলা। পণ্ডিত উদয়ভানু তার দু-চারজন চাপরাশী সঙ্গে নিয়ে খাজনা আদায় করতে বেরিয়েছে। কর্মচারীদের ওপর তার বিশ্বাস নেই। নজরানা,. জরিমানা আদায়. তোলা আদায়—এসব ব্যাপারে অন্য কাউকে সে দায়িত্ব দেয় না। বুড়ির ভাটির দিকে চোখ পড়তেই তার শরীরে যেন আগুন ধরে যায়। ভাটির তখন পুনরুদ্ধার চলছে। বুড়ি ক্ষিপ্র হাতে মাটির দলা লেপছে। সামান্য রাত থাকতেই সে কাজে হাত দিয়েছে, সূর্য ওঠার আগে তা সম্পূর্ণ করতে চায়। মনে বিন্দুমাত্র শঙ্কা নেই—সে যে জমিদারের বিরুদ্ধে কোন কাজ করছে। ক্রোধ যে চিরজীবী হতে পারে, এর সমাধানও তার জানা নেই। একজন প্রতিভাশালী পুরুষ কোন দীনা-অসহায়া নারীর প্রতি এত দ্বেষ পুষে রাখতে পারে, এমন ধারণাও তার মনে ছিল না। সম্ভবতঃ মানব চরিত্রকে সে এসবের উর্দ্ধে মনে করত। কিন্তু, হা হতভাগিনী! তুই যে মিছিমিছি রোদে চুল পাকিয়েছিস!

সহসা উদয়ভানু গর্জে ওঠে—কার হুকুমে ?

ভুনগী ত্যাবাচ্যাকা খেয়ে দেখে, সামনে জমিদার মহাশয় দাঁড়িয়ে।

উদয়ভানু আবার জিজ্ঞেস করে—কার হুকুমে তৈরী করছিস ?

ভয়ে ভয়ে ভুনগী বলে—গাঁয়ের সবাই বললো পাততে, তাই পাতছি।

উদয়ভানু—বটে ! আমি এক্ষুনি এটাকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে ফেলবো।

বলেই সে ভাটিতে একটা লাথি কষায়। মাটি কাদা সব শুদ্ধ একজোটে থপ করে পড়ে যায়। তারপর, হাড়ির ওপর লাথি মারে। সহসা বুড়ি সামনে এসে পড়ায়, লাথির আঘাতটা তার কোমরে গিয়ে পড়ে। এবার বুড়ির প্রচণ্ড রাগ ধরে ওঠে। কোমরে হাত বুলোতে বুলোতে বলে—তোমার যদি মানুষের ভয় না থাকে, অন্ততঃ ভগবানের ভয় থাকা দরকার। আমায় এভাবে উচ্ছেদ করে তুমি পাবে কি ? এই চার হাত মাটি থেকে কি সোনা ফুঁড়ে উঠবে ? তোমার ভালর জন্য বলছি, গরীবের হা-হুতাশ নিওনা। আমার আত্মা দুখী করো না।

উদয়ভানু—আর এখানে ভাটি পাতবি না।

ভুনগী—ভাটি না করলে খাবো কি ?

উদয়ভানু—তোর পেটের ঠিকে আমি নিই নি।

ভুনগী—বারে, টহল যখন তোমার দিই, যাই কোথায় ?

উদয়ভানু—গাঁয়ে বাস করতে হলে টহল দিতে হবে।

ভুনগী—বেশ ! ভাটি পাতলেই আমি টহল দেবো। গাঁয়ে বাস করার জন্য টহল দিতে পারবো না।

উদয়ভানু—তাহলে গাঁ ছেড়ে বেরিয়ে যা।

ভুনগী—কেন ? কেন বেরিয়ে যাবো ? বারো বছর নাগাড়ে খেত চাষ করলে চাষীও ভাগচাষী হয়ে পড়ে। আর আমি কিনা এই ঝুপড়িতে বুড়ি হয়ে গেছি। আমার শ্বশুর-শাশুরি, আর বাপ-ঠাকুদ্দাও এই ঝুপড়িতে কাটিয়েছে। যম ছাড়া কেউ আমার কাছ থেকে নিতে পারবে না।

উদয়ভানু—বটে ! খুব যে আইনের বুলি দেখছি। হাতে-পায়ে ধরলে না হয় থাকতে দিতাম। এখন তোকে বার করে তবে আমি জল খাবো। (চাপরাশিদের) ওর ডাঁই করা পাতায় এক্ষুনি আগুন ধরিয়ে দে, দেখি, ও কি করে আবার ভাটি পাতে।

॥ ৪ ॥

মুহূর্তে হাহাকার ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের লেলিহান শিখা যেন আকাশের সঙ্গে

কথা কইতে শুরু করে। উন্মত্তের মত ইতঃস্তত ছোটাছুটি করতে থাকে। ভুলনী তার ভাটির পাশে দাঁড়িয়ে উদাসীন ভাবে এই লঙ্কা-দহন দেখতে থাকে। তারপর সহসা সে ক্ষীপ্রগতিতে দৌড়ে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে। চারদিক থেকে গ্রাম-বাসীরা ছুটে আসে, কিন্তু কারো সাহস হয় না আগুনের মুখে গিয়ে দাঁড়ায়। মুহূর্তে, ভূনগীর কৃশ শরীর আগুনে ডুবে যায়।

ঠিক তখন, সহসা বাতাসও দ্রুত বেগে বইতে শুরু করে। ঊর্ধ্বগামী শিখা পূব দিকে ছুটতে থাকে। ভাটির কাছের চাষীদের কয়েকটা ঝুপড়ি ছিল, সব উন্মত্ত শিখার গ্রাসে গিয়ে পড়ে। উৎসাহ পেয়ে অগ্নিশিখা আরও এগিয়ে চলে। অদূরেই পণ্ডিত উদয়ভানুর খামার, তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এবার গাঁয়ে হৈচৈ পড়ে যায়। আগুন নেভানোর চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু, জলের ছিঁটে তেলের কাজ করে। আগুন আরও লক্ লক্ করে ওঠে, তারপর, পণ্ডিতের বিশাল প্রাসাদ গ্রাস করে ফেলে। দেখতে দেখতে সেই প্রাসাদ—উন্মত্ত তরঙ্গে টলোমলো নৌকার মত—অগ্নি সাগরে বিলীন হয়ে পড়ে। ভস্মাবশেষ থেকে প্রস্ফুটিত ক্রন্দনধ্বনি ভূনগীব শোকময় বিলাপের চেয়েও বেশী করুণাউদ্রেককারী মনে হয়।

সন্তান

গজুকে লোকেরা ব্রাহ্মণ বলে, এবং সে নিজেকে ব্রাহ্মণ মনেও করে।

আমার সঙ্গীস ও খিদমতগার আমাকে দূর থেকে সেলাম করে। গজু কখনও আমাকে সেলাম করে নি। সে সম্ভবতঃ আমার কাছ থেকে প্রণামের আশা রাখে। আমার এঁটো গ্লাস কখনও হাতে ছোঁয় না, তাছাড়া আমারও কখনও এতটা সাহস হয়নি যে ওকে পাখা টানতে বলি। যদিবা কখনও আমি ঘামে জবজবে হয়ে পড়ি এবং সেখানে অন্য কেউ হাজির না থাকে, গজু নিজেই পাখা তুলে নেয়; কিন্তু তার ভঙ্গিতে এমন একটা ভাব স্পষ্ট ফুটে ওঠে যেন সে আমায় অনুকম্পা করছে। আমিও, জানিনা কেন, সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে পাখা কেড়ে নিই। উগ্র স্বভাবের লোক। কারো কথা সহ্য করতে পারে না। খুব কম লোক আছে—যার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব আছে। সঙ্গীস ও খিদমতগারদের সঙ্গে ওঠা-বসা করাটা সে সম্ভবতঃ অপমানজনক মনে করে। আমি তাকে কারো সঙ্গে মেলামেশা করতে দেখিনি। আশ্চর্যের ব্যাপাব, গাঁজা-ভাঙ বা কোন মাদক দ্রব্যে তার আসক্তি নেই—যা এই শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে অসাধারণ গুণ। আমি তাকে কখনও পুজোপাঠ বা নদীতে স্নান করতে যেতে দেখিনি। একেবারে অশিক্ষিত; তবুও সে ব্রাহ্মণ। এবং সে চাইতো সকলে তার প্রতিষ্ঠা ও সেবা করুক। কেনই বা চাইবে না? পূর্বপুরুষের সঞ্চিত সম্পত্তি লোকেরা যেমন অধিকার ভোগ করে—বেশ দাপটেই, যেন তার স্ব-উপার্জিত—তবে সে-ই বা কেন প্রতিষ্ঠা ও সম্মান ত্যাগ করবে—যা তার পূর্বপুরুষেরা সঞ্চয় করেছিল? এটা তার পৈত্রিক সম্পত্তি!

আমাব স্বভাব কিছুটা অন্য ধরণের। চাকর-বাকরদের সঙ্গে আমি কম কথা বলি। আমি চাই, যতক্ষণ না তাদের নিজে থেকে ডাকি, কেউ যেন আমার কাছে না আসে। সামান্য ব্যাপারে চাকরদের ডাকাডাকি করাটা আমার ভাল লাগে না। নিজে হাতে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে নেয়া, লম্ফ জ্বালানো, পায়ে জুতো পরা বা আলমারি থেকে বই নামানো—আমার কাছে হিংগন বা ম্যাকুকে ডাকার চেয়ে সরল মনে হয়। এসব কাজে আমার স্বেচ্ছা ও আত্মবিশ্বাসের বোধ হয়। চাকর-বাকরেরাও আমার স্বভাবে পরিচিত হয়ে উঠেছিল, ফলে তারা অদরকারে আমার কাছে বড় একটা আসতো না।...একদিন সকালে গজু আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াতে, আমার খুব খারাপ লাগে। এরা আসে, হয় অগ্রিম হিসেবে কিছু চাইতে

নয় অন্য কোন চাকরের নামে অভিযোগ জানাতে। এ দুটো ব্যাপারই আমার কাছে অত্যন্ত অপ্রিয়। পয়লা তারিখেই আমি প্রত্যেককে বেতন দিয়ে দিই। মাঝ-মাসে কেউ কিছু চাইলে আমার রাগ ধরে ওঠে। কে আর অত দু-পাঁচ টাকার হিসেব রাখে? তাছাড়া মাসের পুরো বেতন যখন কেউ পায়, তার কি অধিকার আছে পনেরো দিনে সে সব খরচ করে ফেলা? তারপর আগাম বা ঋণের ওপর নির্ভর? এ ছাড়া কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করাটা আমি বস্তুতঃ ঘৃণা করি। কারণ, অভিযোগ করাটাকে আমি দুর্বলতার প্রমাণ মনে করি, কিংবা বলা চলে খোশামোদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

আমি মাথা নাড়িয়ে জিজ্ঞেস করি—কি ব্যাপার? আমি তো তোমায় ডাকিনি?

গঙ্গুর তাম্র অভিমানী মুখে আজ এমন এক ধরণের নম্রতা, এমন এক আবেদন এমন এক দ্বিধা-সংকোচ—যা দেখে আমি চমকে উঠি। মনে হলো, সে কিছু জবাব দিতে চায়, কিন্তু শব্দ খুঁজে পাচ্ছে না।

কিছুটা নরম হয়ে বলি—ব্যাপার কি, কথা বলছো না কেন? তুমি জানো, এখন আমার বেড়ানোর সময়। আমার দেরী হচ্ছে।

গঙ্গু নিরাশা-স্বরে বলে ওঠে—তাহলে আপনি হাওয়া খেয়ে আসুন, আমি পরে আসবো।

এ-অবস্থা আরও চিন্তার। তাড়াতাড়িতে সে এক নিঃশ্বাসে নিজের বৃত্তান্ত বলে যাবে। আমার বেশী সময় নেই—সেটা সে জানে। তাই অন্য সময়ে সে অনেক কাঁদুনি গাইবে। আমার পড়া-লেখার ব্যাপারটা সে হয়তো কিছুই বোঝে না, কিন্তু চিন্তা-ভাবনার—যা আমাব সবচেয়ে কঠিন সাধনা, আমার বিশ্রামের সময়কে সে উপযুক্ত মনে করে। হয়তো ঐ সময়ে সে এসে আমাব মাথায় চেপে বসবে।

কিছুটা নির্মমভাবে আমি বলি—আগাম টাকা চাইতে এসেছো? আমি আগাম দিই না।

"আজ্ঞে না হুজুর, আমি তো কখনও আগাম চাইনি।"

"তাহলে, কারো বিরুদ্ধে কিছু বলার আছে? আমি অভিযোগ ঘৃণা করি।"

"আজ্ঞে না হুজুর, আমি তো কখনও কারো নামে কিছু বলিনি।"

গঙ্গু মন শক্ত করে। তার চোখেমুখে স্পষ্ট ঝিলিক দেয়, যেন সে লাফ মারার জন্য সমস্ত শক্তি একত্র করছে, কাঁপাকাঁপা স্বরে বলে—আপনি আমাকে বিদায় দিন হুজুর। আমি এখন আর আপনার চাকরি করতে পারবো না।

এটা এমন এক ধরণের প্রথম প্রস্তাব—যা আমার কানে এসে বাজে। আমার আত্মাভিমানে ঘা লাগে। নিজেকে আমি মনুষ্যত্বের প্রতিমূর্তি ভাবি, চাকর-বাকরদের সঙ্গে কখনও কটু কথা বলি না, প্রভুত্বকে যথাসাধ্য খাপে রাখার চেষ্টা করি—এই প্রস্তাবে বিস্মিত না হয়ে যাই? রুদ্ধ স্বরে বলি—কেন, অভিযোগ কি?

"হুজুর, আপনার যেমন ভাল স্বভাব, তেমন কি আর কারোর! কিন্তু, ব্যাপার এমন হয়ে উঠেছে যে আমি আর আপনার কাছে থাকতে পারবো না। এমন যেন না হয়, পরে এ নিয়ে কোন কথা ওঠে এবং আপনার বদনাম হয়। আমি চাইনা, আমার জন্য আপনার সম্মানে দাগ ধরে।"

আমার বুকে ধড়পড়ানি শুরু হয়। কৌতুহলের আগুন আরও প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। বারান্দায় রাখা কেদারায় আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বসে আমি বলে উঠি—তুমি দেখছি ধাঁধা খেলছো। স্পষ্ট করে বলছো না কেন, ব্যাপারটা কি?

গজু খুব বিনীতভাবে বলে—আজ্ঞে, সেই মহিলা—মানে—যাকে দিন কয়েক হলো বিধবা আশ্রম থেকে বার করে দিয়েছে—সেই গোমতী দেবী…

সে চুপ করে। আমি অধীর হয়ে বলি—হ্যাঁ, বার করে দিয়েছে, তাতে কি? তোমার চাকরির সঙ্গেই বা তার কিসের সম্পর্ক?

গজু যেন মাথা-ভারি বোঝা মেঝের ওপর ফেলে দেয়—

"আমি ওকে বিয়ে করতে চাই, বাবু!"

বিস্ময়ে আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকি। প্রাচীন-সংস্কারের ব্রাহ্মণ, নবসভ্যতার সামান্য আলো যাকে স্পর্শ করে নি—সে ঐ কুলটা রমনীকে বিয়ে করতে যাচ্ছে! কোন ভদ্র গেরস্থ নিজের বাড়িতে যাকে পা রাখতেও দেয় না। গোমতী পাড়ার শান্ত পরিবেশে কিছুটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বছর কয়েক আগে সে বিধবা আশ্রমে এসেছিল। তিনবার আশ্রমের কর্মচারীরা তার বিয়ে দিয়েছিল; কিন্তু প্রতিবারই সে একমাস-পনরো দিনের মাথায় পালিয়ে এসেছে। আশ্রমের মন্ত্রী এবার তাকে আশ্রম থেকে বার করে দিয়েছে। তারপর থেকে সে এ-পাড়ায় একটা বাসা নিয়ে থাকে, পাড়ার লম্পটদের কাছে মনোরঞ্জনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

গজুর সারল্যে আমার রাগ হয় এবং দয়াও। এই গদ্দভটা কোন মেয়ে পেল না, শেষে একে বিয়ে করতে যাচ্ছে। আর, যে তিন-তিনবার স্বামীর কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে, গজুর কাছে ক'দিন আর থাকবে? শক্ত-সমর্থ চৌকস মানুষ হলে, না হয় একটা কথা ছিল। মাস ছয় কি বছর খানেক কোন রকমে টিঁকে যেত। এ তো একেবারে চোখে অন্ধ। একটা সপ্তাহও যে টিঁকবে না।

আমি সতর্কীকরণের ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করি—ঐ মেয়েটার জীবন-কাহিনী তোমার জানা ?

গঙ্গু প্রত্যক্ষদর্শী ঘটনার মত বলে ওঠে—সব মিথ্যে কথা হুজুর। লোকেরা না-হক ওর দুর্নাম করছে।

'কি বলছো তুমি! তিন-তিনবার স্বামীর কাছ থেকে ও পালিয়ে আসে নি ?'

'ওরা ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে, কি আর করে ?

'আচ্ছা বোকা লোক তো! হাজার হাজার টাকা খরচ করে কেউ কি বিয়ে করে বৌকে তাড়িয়ে দেবার জন্য ?'

গঙ্গু আবেগভরে বলে—হুজুর, প্রেম যেখানে নেই, সেখানে কোন মেয়ে থাকতে পারে না। মেয়েরা শুধু ভাত-কাপড়ই চায় না, কিছু প্রেমও তারা আশা করে। আসলে লোকগুলো ভেবেছিল, বিধবাকে বিয়ে করে আমি খুব উপকার করেছি। চেয়েছিল, মনে-প্রাণে ও যেন তাদের হয়ে থাকে! কিন্তু হুজুর, অপরকে আপন করার আগে নিজেকে যে তার হতে হয়। এটাই আসল ব্যাপার। তাছাড়া, ওর একটা রোগও আছে। ভূতে ধরেছে ওকে। মাঝে মাঝে খুব বক্ বক্ করে, অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

আর তুমি কিনা এমন মেয়েকে বিয়ে করবে ?—এবার আমি সন্দিগ্ধ ভঙ্গিতে মাথা নাড়িয়ে বলি—বুঝলে, তোমার জীবন একেবারে ছারখার হয়ে পড়বে।

গঙ্গু কিছুটা শহীদের মত আবেগে বলে—আমি মনে করি জীবন আমার গড়ে উঠবে কর্তা! তারপর ভগবানের ইচ্ছে।

আমি এবার জোর দিয়ে জিজ্ঞেস করি—তাহলে, তুমি ঠিক করে ফেলেছো ?

"হ্যাঁ হুজুর।"

"বেশ, তোমার ইস্তিফা আমি মঞ্জুর করছি।"

আমি অবশ্য অর্থহীন সংস্কারগ্রস্ত বা ব্যর্থ বিজ্ঞানের দাস নই, কিন্তু যে লোক একজন দুষ্ট রমনীকে বিয়ে করে, তাকে নিজের কাছে রাখা বস্তুতঃ জটিল সমস্যা। ভবিষ্যতে এনিয়ে হয়তো ঝুট-ঝামেলা হবে, নতুন-নতুন সমস্যা দেখা দেবে, কখনও পুলিশ ছুটে আসবে, কখনও বা মামলা দাঁড়াবে। কে জানে, চুরির দায়েও দাঙ্গা-ফ্যাসাদে পড়তে পারে। এই পাঁক থেকে দূরে সরে থাকাই ভালো। গঙ্গু এখন ক্ষুধা-পীড়িত প্রাণীর মত রুটির টুকরো দেখে তার দিকে দৌড়ুচ্ছে। কিন্তু রুটিটা যে এঁটো, শুকনো, খাবার যোগ্য নয়—তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই; যুক্তি-বিচারে কাজ করা অসম্ভব। তাকে পৃথক করে দেয়াটাই আমার পক্ষে হিত মনে করি।

॥ ২ ॥

পাঁচ মাস পার হয়েছে। গঙ্গু-গোমতীকে বিয়ে করেছে এবং এ পাড়ায় একচা খাপরার ঘর নিয়ে থাকে। এখন সে ভাজা-ভুজির টাট সাজিয়ে দিন গুজরান করে। আমার সঙ্গে যখনি বাজারে দেখা হয়, আমি তার কুশল সংবাদ নিই। তার জীবনের প্রতি আমার বিশেষ অনুরাগ জন্মেছিল। এটা অবশ্য এক ধরণের সামাজিক প্রশ্নের পরীক্ষা—কেবল সামাজিক নয়, মনোবৈজ্ঞানিকও বটে। আমি দেখতে চাই, এর পরিণাম কি ঘটে। গঙ্গুকে আমি সবসময় হাসি-খুশীই দেখি। সমৃদ্ধি ও চিন্তাহীনতার ফলে চোখে-মুখে যে ছটা, স্বভাবে যে আত্মসম্মান উৎপন্ন হয়—তা এখানে প্রত্যক্ষ দেখা যেতে থাকে। দৈনিক টাকা-পাঁচসিকের বিক্রী হয়ে থাকে। তা থেকে পুঁজি সরিয়ে আট-দশ আনা হাতে থাকে। এই ছিল তার জীবিকা। গঙ্গুর মাথায় নিশ্চিত্ত কোন দেবতার আশীর্বাদ ছিল, নইলে এই শ্রেণীর লোকেদের মাঝে যে নির্লজ্জতা ও বিপন্নতা পাওয়া যায়—গঙ্গুর মাঝে তার কোন চিহ্নও নেই। তার মুখে চেহারায় আত্মবিকাশ ও আনন্দের ঔজ্জ্বল্য— যা মানসিক শান্তির কারণেই একমাত্র ফুটে বেরোয়।

একদিন আমি শুনতে পাই, গোমতী গঙ্গুর ঘর থেকে পালিয়ে গেছে। কেন জানিনা, এ খবর শুনে আমার মনে বিচিত্র উল্লাস হয়। গঙ্গুর সন্তুষ্ট ও সুখী জীবনের প্রতি আমার এক ধরণের ঈর্ষা জাগত। তার সম্পর্কে কোন অনিষ্ট, কোন ঘাতক অনর্থ বা কোন লজ্জাকর ঘটনার আমি প্রতীক্ষা করতাম। এই সংবাদে আমি মনে ঈর্ষাজনিত সান্ত্বনা পাই। হ্যাঁ, শেষাবধি সেটাই ঘটলো, যা আমি বিশ্বাস করেছিলাম। এবার বাছাধনকে নিজের অদূরদর্শিতার ফল ভোগ করতেই হলো। দেখা যাক, বাছাধন কি করে মুখ দেখায়। এবার চোখ খুলবে, বুঝতে পারবে—যারা যারা তাকে বিয়ে করতে বারণ করেছিল, তাঁরা সকলেই তার শুভাকাঙ্খী ছিল। সে সময় তার মনে হয়েছিল, যেন কোন দুর্লভ বস্তু লাভ করছে। মুক্তির দরজা খুলে গেছে যেন। লোকেরা কত করে বারণ করেছে—ঐ মেয়েটি বিশ্বস্ত নয়, কতজনকে দাগা দিয়ে গেছে, তোমাকেও দাগা দেবে; কিন্তু তার কানে একটুও জল ঢুকলো না। এবার দেখা হলে তার মেজাজ জিজ্ঞেস করবো। বলবো—কিহে, দেবীর বর পেয়ে প্রসন্ন হয়েছো তো? তুমি তো বলেছিলে, সে এমন সে তেমন, লোকেরা মিছিমিছি দুর্ভাবনার জন্য দোষ আরোপিত করছে। এখন বলো, কার ভুল ছিলো?

সেদিন হঠাৎ-ই গঙ্গুর সঙ্গে বাজারে দেখা হয়ে গেল। বিভ্রান্ত দিশেহারা,

একেবারে ভুলো ভুলো। আমায় দেখতে পেয়েই তার চোখে অশ্রু ভরে ওঠে—লজ্জায় নয়—ব্যথায় আমার কাছে এসে বলে—বাবু, গোমতী আমার সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

আমি কুটিল উল্লাসে, কিন্তু কৃত্রিম সহানুভূতি দেখিয়ে বলি—তোমাকে আমি আগেই বলেছিলাম ; কিন্তু তুমি তো কথা শুনলে না। এখন অপেক্ষা করো। এ ছাড়া আর কি উপায় আছে ? টাকা-পয়সা নিয়ে পালিয়েছে, না কি ফেলে গেছে ?

কর্তা, এমন কথা বলবেন না, সে এক কানা-কড়ির জিনিসও ছোঁয়নি। নিজের যা কিছু ছিল, তাও ফেলে গেছে। কি জানি, আমার মাঝে কি খারাপ দেখেছে সে। আমি হয়তো ওর যোগ্য ছিলাম না, এছাড়া আর কিইবা বলি। লেখা-পড়া জানা মেয়ে অথচ আমি ক' অক্ষর গোমাংস। আমার সঙ্গে এতদিন ছিল—এটাই যথেষ্ট। আরও কিছুদিন ওর সঙ্গে থাকলে, আমিও মানুষ হয়ে যেতাম। আপনাকে ওসব কত আর বলবো হুজুর। অন্যদের কাছে সে যাই হোক, আমার পক্ষে সে যেন দেবতার আশীর্বাদ। কি জানি, আমার দ্বারা এমন কি দুষ্কর্ম হয়েছে ! কিন্তু আমি শপথ করে বলছি, তার মনে এতটুকুও ময়লা জমেনি। আমার সামর্থ্যই বা কতটুকু কর্তা ? দশ-বারো আনার মজুর বৈ তো নয় ; কিন্তু এতেই তার হাত জোড়া উপচে উঠতো, কখনও কিছু টান পড়েনি।

এ সব কথায় আমার গভীর হতাশা হয়। ভেবেছিলাম, সে ওর বিশ্বাস-হীনতার কথা বলবে, এবং আমি তার অন্ধ-ভক্তি সম্পর্কে সহানুভূতি প্রকাশ করবো ; কিন্তু দেখছি, মূর্খের চোখ এখনও খোলেনি। এখনও সে ওর মন্ত্র আউড়ে চলেছে। অবশ্য তার মন কিছুটা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

আমি কুটিল পরিহাস শুরু করি—তা, তোমার ঘর থেকে কিছু নিয়ে যায়নি ?

"কিছু নয়, কর্তা, কানাকড়ি দামের জিনিসও নয়।'

"তোমাকে ভালবাসতো খুব ?

"আপনাকে কি আর বলবো হুজুর, সে ভালবাসা আমৃত্যু আমার মনে থাকবে।'

"তবুও তোমায় ছেড়ে চলে গেছে ?".

"এটাই আশ্চর্য লাগে, কর্তা !"

"স্ত্রী-চরিত্রের নাম শুনছো ?

"কর্তা, অমন কথা আর বলবেন না। আমার ঘাড়ে কেউ যদি দা রাখে, তবুও আমি ওর প্রশংসা করবো।"

"তাহলে খুঁজে বার করো।"

"হ্যাঁ, কর্তা! যতদিন না ওকে খুঁজে বার করে আনি, আমি কিছুতেই শান্তি পাবো না। শুধু এটুকু জানতে পারলে হয়, ও কোথায় আছে, তাহলে ওকে নিয়ে ফিরে আসবো। আমার মন বলছে ও নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। দেখবেন। ও আমার ওপর রাগ করে যায় নি; কিন্তু মন যে আমার মানে না। যাচ্ছি, মাস-দু মাস মাঠে-জঙ্গলে ছেঁকে বেড়াবো। বেঁচে থাকলে আপনার সঙ্গে দেখা করবো।"

বলেই সে উদ্‌ভ্রান্তের মত একদিকে চলে যায়।

॥ ৩ ॥

এরপর একটা দরকারী কাজে আমাকে নৈনিতাল যেতে হয়। বেড়াবার জন্য নয়। ফিরে আসি একমাস পরে। তখনও পোষাক ছাড়া হয়নি, দেখি—গঙ্গু একটা নবজাত শিশু কোলে দাঁড়িয়ে আছে। কৃষ্ণকে পেয়েও নন্দগোপ সম্ভবতঃ এতটা পুলকিত হয়নি। মনে হয়, তার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেয়ে আনন্দ ফেটে পড়ছে। চেহারায়, চোখে মুখে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা ফুটে বেরোতে থাকে। কিছুটা সেই ধরণের অভিব্যক্তি—যা কোন ক্ষুধার্ত ভিক্ষুকের চেহারায় ভর-পেট খাবারের পর চোখে পড়ে।

আমি জিজ্ঞেস করি—কি হে গঙ্গু, গোমতী দেবীর কোনো খোঁজ পেলে? তুমি তো বাইরে গিয়েছিলে?

গঙ্গু বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত না হয়ে বলে—হ্যাঁ কর্তা, আপনার আশীর্বাদে খুঁজে এনেছি। লক্ষ্ণৌয় জেনানা হাসপাতালে ওকে পাই। এখানে ওর এক বন্ধুকে বলে গিয়েছিল, আমি যদি খুব ঘাবড়াই, তাহলে বলে দিস। শুনতে পেয়েই আমি লক্ষ্ণৌ ছুটে গেছি, তারপর ওকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। উপরন্তু এই বাচ্চাটিও পেয়েছি।

সে শিশুকে তুলে আমার দিকে এগিয়ে দেয়। যেন কোন খেলোয়াড় পদক পেয়ে দেখাচ্ছে।

আমি উপহাস করে বলি—আচ্ছা, এই ছেলেটিকেও পেয়েছো? এর জন্যই বুঝি ও এখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। তোমারই ছেলে তো?

"আমার কেন হবে কর্তা, এ আপনার ভগবানের ছেলে।"

"লক্ষ্ণৌয়ে জন্মেছে?"

"হ্যাঁ কর্তা, সবে এক মাসের।"

"তোমার বিয়ে হয়েছে কদ্দিন হলো?"

"সাত মাস চলছে।"

"তাহলে বিয়ের ছ'মাসেই ছেলে হয়েছে ?"

"তাছাড়া আর কি কর্তা !"

"তবুও তোমার ছেলে ?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ !"

"কি মাথামুণ্ডু কথা বলছো ?"

জানিনা, সে আমার কথার গূঢ়ার্থ বুঝতে পেরেছে কিনা, নাকি ভাণ করছে ! সেই রকম অকপটেই বলে—মরতে মরতে কোনক্রমে বেঁচে উঠেছে। নতুন জন্ম হয়েছে ওর। তিনদিন—তিনরাত্ত সে কি ছটফটানি। বলা যায় না।

আমি এবার একটু ব্যঙ্গ-শ্লেষের ভঙ্গিতে বলি—কিন্তু ছ মাসে ছেলে হওয়া যে আজই শুনলাম রে।

চোস্ত ঘা সঠিক জায়গায় গিয়ে লাগে।

হেসে বলে ওঠে—ওহ্, এই ব্যাপার ! আমি সেটা ধরতে পারিনি। আজ্ঞে, এই ভয়েই তো গোমতী পালিয়ে গিয়েছিল। আমি ওকে বললাম, গোমতী, আমার সঙ্গে যদি তোমার মিল না খায়, তাহলে তুমি আমায় ছেড়ে দাও। আমি এক্ষুনি ফিরে যাবো, আর কখনও তোমার কাছে আসবো না। তোমার যখনি কোন দরকার বা কাজ পড়বে, আমায় লিখো, আমি যথাসম্ভব তোমায় সাহায্য করবো। তোমার ওপর আমার কোন রাগ-অভিমান নেই। আমার চোখে তুমি আজও তেমনি প্রিয়। এখনও আমি তোমায় তেমনি ভালবাসি। না, এখন আমি তোমায় আরও বেশী ভালবাসি। যদি তোমার মন আমার কাছ থেকে দূরে সরে না গিয়ে থাকে, তাহলে আমার সঙ্গে চলো। গঙ্গু বেঁচে থাকতে তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। তোমাকে এজন্য বিয়ে করিনি যে তুমি দেবী ; বরং এজন্য করেছি যে আমি তোমাকে ভালবাসি। আমার ইচ্ছে, তুমিও আমাকে ভালবাসো। এই ছেলে আমার ছেলে। আমার আপন সন্তান। আমি একটা চষা ক্ষেত নিয়েছি, অন্য কেউ চাষ করেছিল বলে কি তার ফসল ফেলে দেবো ?

বলেই সে সশব্দে হেসে ওঠে।

আমি পোষাক পাল্টাতে ভুলে যাই। বলতে পারবো না, কেন জানি আমার চোখ জোড়া সজল হয়ে ওঠে। জানি না কি সে শক্তি, যা আমার মনোগত ঘৃণাকে থামিয়ে দিয়ে হাত জোড়া এগিয়ে দেয় ! সেই নিষ্কলঙ্ক শিশুকে কোলে তুলে নিই ; তারপর এমন স্নেহাকর্ষণে তাকে চুমু খাই, নিজের ছেলেকেও তেমন ভাবে খাইনি।

গঙ্গু বলে—কর্তা, আপনি মহৎ লোক। গোমতীর কাছে বার বার আপনার সুখ্যাতি করেছি। বলেছি, একবার গিয়ে দর্শন করে আয়; কিন্তু লজ্জায় ও আসতে চায় না।

আমি এবং মহৎ। নিজের মহানতার আড়াল আজ আমার চোখ থেকে সরে যায়। ভক্তিরসে আপ্লুত কণ্ঠস্বরে বলে উঠি—না, না, আমার মত কলুষিত মানুষের কাছে কেন সে আসবে? চলো, আমিই তার দর্শন করে আসি। তুমি আমায় মহৎ মনে করো? আমি ওপরে যতটা ভদ্র, মনে-মনে ততটাই কুটিল। প্রকৃত মহত্ত্ব তোমার মাঝেই আছে। এই শিশু সেই ফুল—যা থেকে তোমার মহানতার সৌরভ ছড়িয়ে পড়ছে।

আমি শিশুটিকে বুকে আঁকড়ে গঙ্গুর সঙ্গে রওনা দিই।

কলঙ্ক

মুন্সী শ্যামকিশোরের দোরগোড়ায় মুন্নু ধাঙড় ঝাঁট দেয়, কলঘর ধুয়ে পরিষ্কার করে, তারপর দোরের কাছে এসে গিন্নীকে বলে—মা, দেখে নিন, সব পরিষ্কার করে দিয়েছি। আজ কিছু খাবার আশা করি গিন্নী-মা।

দেবীরাণী দোরের কাছে এসে বলে—ওমা, দশ দিনও পেরোয়নি মাইনে পেয়েছিস। এরি মধ্যে আবার চাওয়া শুরু করেছিস?

মুন্নু—কি আর করি গিন্নী-মা, খরচ চলে না। একা লোক, ঘর দেখি না কাজ করি?

দেবী—কেন? বিয়ে করলেই তা পাবিস?

মুন্নু—নগদ চায় যে। এদিকে খেয়ে-পরে হাতে কিছুই থাকে না, টাকা পাই কোত্থেকে?

দেবী—এখনও আইবুড়ো আছিস! কিন্তু, কতদিন আর একা থাকবি?

মুন্নু—গিন্নী-মার যখন এত লক্ষ্য, কোথাও না কোথাও ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ঠাকরুণ কিছু সাহায্য করবেন তো?

দেবী—হ্যাঁ, করবো। তুই ব্যবস্থা কর। আমার পক্ষে যতটা সম্ভব, আমি দেবো।

মুন্নু—আহা, ঠাকরুণের মন-মেজাজ কত ভালো। কত খেয়াল রাখেন আমার। অন্য বাড়ির গিন্নী-মা'রা কথা পর্যন্ত বলেন না। ঠাকরুণকে ভগবান যেমন রূপ শ্রী দিয়েছেন, তেমনি মন খানাও দিয়েছেন। ভগবান জানেন, ঠাকরুণকে দেখে খিদে-তেষ্টা ভুলে যাই। বড় ঘরের মেয়ে-বৌদেরও দেখেছি, কিন্তু তারা আপনার নখের যুগ্যিও নয়।

দেবী—যাঃ মিথ্যুক কোথাকার! আমি আর এমন কি সুন্দরী!

মুন্নু—কি করে যে বোঝাই আপনাকে। বড়-বড় ঘরের উঁচু জাতের বৌ-ঝিদের দেখি, শুধু ফর্সা রঙ ছাড়া আর কিছু নেই। ওদের মুখে সেই লালিত্য কোথায়!

দেবী—এক টাকায় তোর কাজ চলবে?

মুন্নু—ঠাকরুণ, দুটো টাকা দিন না।

দেবী—আচ্ছা, এই নে। এবার যা!

মুন্নু—যাই ঠাকরুণ! যদি রাগ না করেন একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

দেবী—কিসের আবার কথা? তাড়াতাড়ি কর, আমায় উনুন ধরাতে হবে।

মুন্নু—তাহলে আজ যাই ঠাকরুণ; পরে বলবো।

দেবী—না-না, বল, কি কথা? এমন কিছু তাড়াতাড়ি নেই।

মুন্নু—দালমণ্ডীতে কর্তাবাবুর কেউ থাকেন নাকি?

দেবী—না, সেখানে কোন আত্মীয় নেই তো।

মুন্নু—তাহলে হয়তো বন্ধু থাকেন। কর্তাবাবুকে প্রায় একটা বাড়ি থেকে নাবতে দেখি।

দেবী—দালমণ্ডী তো বেশ্যাদেব পাড়া?

মুন্নু—আজ্ঞে হ্যাঁ ঠাকরুণ, বেশ্যা অনেক আছে সেখানে, কিন্তু কর্তাবাবু তো সোজা-সরল মানুষ। উনি দেরী করে বাড়ি ফেরেন নাকি?

দেবী—না-না, সন্ধ্যে হবার আগেই ঘরে ফিরে আসে, তারপর আর বেরোয় না। তবে, হ্যাঁ, মাঝে-মাঝে লাইব্রেরীতে যায়।

মুন্নু—ঠিক-ঠিক। ধরতে পেরেছেন ঠাকরুণ। সুযোগ পেলে, ইশারায় বুঝিয়ে দেবেন—রাতে যেন সেদিকে যাতায়াত না করেন। মানুষের মন যতই পরিষ্কার হোক না কেন, যারা দেখে তারা কিছু একটা সন্দেহ করে।

এরি মধ্যে বাবু শ্যামকিশোব এসে পড়ে। মুন্নু তাকে সেলাম করে, তারপর বালতি তুলে রওনা দেয়।

শ্যামকিশোব জিজ্ঞেস করে—মুন্নু কি বলছিল?

দেবী—কিছু না, নিজের দুঃখের কাঁদুনি গাইছিল। খেতে চাইছিল। দুটো টাকা দিয়েছি। কথাবার্তার ধরণ-ধারণ কিন্তু বেশ।

শ্যাম—তোমার তো কথা বলার রোগ। কেউ না জুটুক ধাঙড়ের সঙ্গেও বলা চাই। এই ভূতটার সঙ্গে তুমি যে কি কথা বল।

দেবী—ওর চেহারা দিয়ে আমার দরকার কি। বেচারা গরীব লোক। নিজের দুঃখের কাহিনী শোনাচ্ছিল, না শুনে থাকি কি করে?

শ্যামবাবু রুমাল থেকে বেল ফুলের মালা বার করে দেবীর গলায় পরিয়ে দেয়, কিন্তু দেবীর মুখে খুশীর সামান্যতম চিহ্ন ফুটে ওঠে না। তীর্যক দৃষ্টিতে চেয়ে বলে—তুমি ইদানীং দালমণ্ডীর দিকে খুব ঘোরাঘুরি করছো?

শ্যাম—কে? আমি?

দেবী—আজ্ঞে হ্যাঁ, তুমি। লাইব্রেরী যাবার অজুহাত করে বেরিয়ে যাও, আর ওদিকে জলসা হয়।

শ্যাম—ভাঁহা মিছে কথা। ষোল আনা মিছে কথা। কে বলেছে তোমায়? মুন্নু বুঝি?

দেবী—মুন্নু আমায় কিছু বলে নি; কিন্তু তোমার খবরাখবর পেয়ে থাকি।

শ্যাম—তুমি আমার খবরাখবর নিও না। সন্দেহ করলে লোক সন্দেহ-বাতিক হয়ে পড়ে, তারপর বড়-বড় অনর্থ সংঘটিত হয়। আচ্ছা, তুমিই বলো—আমি দালমণ্ডীতে যাবো কেন? তোমার চেয়ে বড় আর কেউ আছে নাকি দালমণ্ডীতে? তোমার ঐ মাতাল চোখের আমি তুরন্ত প্রেমিক। সুন্দরী অপ্সরাও আমার সামনে এসে দাঁড়ালে, আমি চোখ তুলে দেখবো না, বুঝলে! শারদাকে দেখছি না যে, কোথায়?

দেবী—নীচে খেলতে গেছে।

শ্যাম—উহুঁ, নীচে যেতে দিও না। সবসময় মোটর, একাগাড়ি, ফিটন যাতায়াত করে। কখন যে কি ঘটে যাবে বলা যায় না। আজই আরদালী বাজারে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। তিনটে ছেলে একসঙ্গে মারা গেছে।

দেবী—তিনটে ছেলে! আহা, কি সাংঘাতিক ঘটনা। কার মোটরগাড়ি ছিল?

শ্যাম—এখনও খোঁজ পাওয়া যায় নি। ঈশ্বর জানেন, তোমায় কিন্তু এই মালায় দারুণ মানিয়েছে।

দেবী (স্মিত হেসে)—আর খোসামোদ করতে হবে না।

॥ ২ ॥

তৃতীয় দিবসে মুন্নু এসে দেবীকে বলে—ঠাকরুণ, এক জায়গায় বিয়ের কথা-বার্তা চলছে, যা বলেছেন তা যেন পাই। আপনার ওপর ভরসা করে আছি।

দেবী—তা মেয়ে দেখেছিস। কেমন!

মুন্নু—কপালে যা আছে, তাই হবে। অন্ততঃ ঘরের রুটি খেতে পাবো, নইলে নিজের হাত পুড়িয়ে খেতে হয়। তবে, মেজাজ খুব শান্ত। আমাদের জাতের মেয়েরা বড় চঞ্চল স্বভাবের হয়ে থাকে। হাজারে একটা শান্ত মেয়ে মেলে।

দেবী—কেন? তোদের পরিবারকে তোরা কিছু বলিস না।

মুন্নু—বলবো কি ঠাকরুণ। ভয়ে-ভয়ে থাকি, পাছে আশনাইয়ের কাছে চুগলি খেয়ে চাকরিটা না যায়। বাবুসাহেবদের আবার ধাঙড়-মেয়েদের ওপর ভয়ানক নজর থাকে।

দেবী—(হেসে) যাঃ মিথ্যুক কোথাকার! বাবুসাহেবদের পরিবাররা ধাঙড়-বৌদের চেয়েও খারাপ হয় নাকি!

মুন্নু—আর কিছু বলাবেন না ঠাকরুণ। আপনি ছাড়া আর কোন মানব-গিন্নীকে দেখিনি, যার সুখ্যাত করা যায়। আমি খুব ছোট·মাপের লোক, কিন্তু গিন্নীদের মত যদি আমার পরিবার·হয়, কথা বলতেও ইচ্ছে করবে না। ঠাকরুণের মত সুন্দরী-শান্ত কোন মেয়েলোক আমি দেখিনি।

দেবী—যাঃ মিথ্যুক কোথাকার! এত খোসামোদ করা শিখেছিস কোত্থেকে?

মুন্নু—খোসামোদ নয় ঠাকরুণ; সত্যি কথাই বলছি। একদিন আপনি জানালার ধারে দাঁড়িয়েছিলেন। রজা মিঞার চোখ আপনার ওপর পড়ে। ঐ যে বড় জুতোর দোকান যার। আল্লা যেমন টাকা পয়সা দিয়েছে, তেমন হৃদয়ও। আপনাকে দেখেই চোখ নামিয়ে নেয়। আজ কথায়-কথায় ঠাকরুণের রূপ-চেহারার প্রশংসা করতে শুরু করে। আমি বললাম—যেমন রূপ, তেমনি আল্লা তাঁকে হৃদয়ও দিয়েছে।

দেবী—ঐ যে, লম্বাটে শ্যামবর্ণের ছেলে?

মুন্নু—হ্যাঁ, হুজুর, সেই। আমায় বলতে থাকে, কোন রকমে একবার যদি তাঁকে দেখতে পেতাম, কিন্তু আমি ধমকে দিয়ে বলি—খবরদার মিঞা, আমাকে এমন কথা বললে। সেখানে তোমার জারিজুরি খাটবে না।

দেবী—খুব ভাল করেছিস তুই। হতচ্ছাড়ার চোখ যেন কানা হয়। যখনই এদিক দিয়ে যায়, জানালার দিকে চোখ যেন জুড়ে থাকে। বলে দিস, এদিকে যেন ভুলেও না তাকায়।

মুন্নু—বলে দিয়েছি ঠাকরুণ, এখন আজ্ঞা করুন যাই। আর কিছু পরিষ্কার করতে হবে না তো? কর্তাবাবুর ফেরার সময় হয়ে এসেছে। আমায় দেখলে আবার বলে বসবেন—এখানে আমি কি কথা বলছি।

দেবী—এই রুটিগুলো নিয়ে যা। আজ আর উনুন ধরাতে হবে না।

মুন্নু—আল্লা, আপনাকে সালামত রাখেন। জানেন, আমার মনেও ইচ্ছে হয়, এই দোরগোড়ায় পড়ে থাকি, যা পাবো খাবো। সত্যি বলছি ঠাকরুণ, আপনাকে দেখে আমার ক্ষিধে-তেষ্টা সব মরে যায়।

মুন্নু বেরোচ্ছিল, এরি মধ্যে বাবু শ্যামকিশোর ওপরে উঠে আসে। মুন্নুর শেষ কথা ক'টি তার কানে যায়। মুন্নু নীচে নেবে যেতেই, শ্যামকিশোর বলে—তোমায় আমি বলেছি না, মুন্নুর সঙ্গে বেশী কথা বলো না। তুমি মোটেই কথা শোনো না। ছোট-লোকেরা এক ঘরের কথা অন্য ঘরে চালান করে দেয়, এদের সঙ্গে কখনও বেশী কথা বলতে নেই। ক্ষিধে-তেষ্টা নষ্ট হবার কি কথা বলছিল?

দেবী—কি জানি, কিসের ক্ষিধে-তেষ্টা? এমন কোন কথা ওঠেনি তো।

শ্যাম—ওঠেনি মানে! আমি নিজে স্পষ্ট শুনলাম।

দেবী—আমার মনে পড়ছে না। হবে কোন কথা। ওর সব কথা আমি শুনি নাকি!

শ্যাম—ও কি তাহলে দেয়ালের সঙ্গে বসে কথা বলে? ঐ দেখো, একজন লোক তলায় জানালার দিকে নজর দিতে-দিতে যাচ্ছে। এ পাড়ার মুসলমান ছোঁড়া। জুতোর দোকান আছে। তুমি এই জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকো কেন?

দেবী—চিক ঝোলানো রয়েছে।

শ্যাম—থাকলেই বা। চিকের পাশে দাঁড়ালে বাইরের লোকেরা তোমায় স্পষ্ট দেখতে পায়।

দেবী—আমার তা জানা ছিল না। এরপর আর কখনও জানালা খুলবো না।

শ্যাম—ঠিক আছে। খুলে লাভ কি? মুন্নুকে আর ভেতরে আসতে দেবে না।

দেবী—কলঘর পরিষ্কার করবে কে?

শ্যাম—বেশ, আসুক তাহলে। কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলো না। জানো, আজ একটা নতুন থিয়েটার এসেছে। চলো দেখে আসি। শুনেছি, এ থিয়েটারে অভিনেতারা নাকি ভাল অভিনয় করে।

এরি মধ্যে শারদা তলা থেকে মিষ্টির ঠোঙা নিয়ে ছুটে আসে। দেবী জিজ্ঞেস করে—একি, এ মিষ্টি তোকে দিল কে?

শারদা—রাজা কাকু দিয়েছে। বলছিল, আমায় ভাল-ভাল খেলনা এনে দেবে।

শ্যাম—রাজা কাকুটা কে?

শারদা—ঐ তো সেই লোকটা, এক্ষুণি এদিক দিয়ে গেল।

শ্যাম—কে? ঐ যে লম্বাটে কালো রঙের লোকটি?

শারদা—হ্যাঁ, সেই। আমি এবার ওর বাড়িতে রোজ যাব।

দেবী—তুই ওর বাড়িতে গিয়েছিলি নাকি?

শারদা—আমায় কোলে করে নিয়ে গেল যে।

শ্যাম—এবার থেকে তলায় আর খেলতে যাবি না। কোনদিন না মোটরের তলায় চাপা পড়িস। দেখিস্ না, কত মোটর গাড়ি যাওয়া আসা করে।

শারদা—রাজা কাকু বলছিল, আমায় মোটরে করে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যাবে।

শ্যাম—বাড়িতে বসে-বসে তুমি কর কি? এঁ্যা? একটা মেয়েকে চোখে চোখে রাখতে পার না?

দেবী—এত বড় মেয়েকে তো আর বাক্সে বন্ধ করে রাখা যায় না।

শ্যাম—কথার জবাব দিতে যে তুমি পটু, তা আমার জানা আছে। আসলে, গপ্পো করে আর সময় পাওনা।

দেবী—গপ্পো করবো কার সঙ্গে? এখানে কি আশে-পাশে কেউ থাকে?

শ্যাম—কেন, মুন্নু রয়েছে।

দেবী—(ঠোঁট কামড়ে) মুন্নু কি আমার বন্ধু, তার সঙ্গে বসে বসে গপ্পো করবো? গরীব লোক, নিজের দুঃখ গায়—কি আর করবো? দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিতে পারি না।

শ্যাম—যাক্‌গে। তাড়াতাড়ি রান্না করে ফেল। ন'টার সময় নাটক শুরু হবে, এখন সাতটা।

দেবী—তুমি যাও, দেখে এসো, আমি যাবো না।

শ্যাম—কেন? কি হলো আবার? তুমি তো দুমাস ধরে নামতা আওড়াচ্ছিলে নাটক দেখা হয় না—নাটক দেখা হয় না। তুমি কি মনে মনে ঠিক করেছো, আমি যা বলবো তা কখনও পালন করবে না?

দেবী—কে জানে, তোমার মনে যে কি ভাবনার উদয় হয়। তোমার কথা মতই আমি সব কাজ করি। আমি গেলে তোমার বেশী খরচ হবে, টাকায় কম পড়বে—এই ভেবেই আমি বলেছি। তুমি যখন বলছো, বেশ আমি যাবো। নাটক দেখতে কার বা খারাপ লাগে।

॥ ৩ ॥

ন'টার সময় শ্যামকিশোর একটা টাঙ্গা ভাড়া করে দেবী এবং শারদাকে সঙ্গে নিয়ে নাটক দেখতে বেরোয়। রাস্তার কিছুদূর যাবার পর, পেছনে-পেছনে আরেকটা টাঙ্গা এসে হাজির হয়। এই টাঙ্গায় রাজা মিশ্রা বসে আছে এবং তার পাশে—হ্যাঁ, তার পাশে—বসে আছে মুন্নু ধাঙড়—শ্যামকিশোরের বাড়ী যে ধোয়-পরিষ্কার করে। ওদের দুজনকে একসঙ্গে দেখে দেবী মাথা নীচু করে নেয়। বিস্মিত হয় এই ভেবে, রাজা এবং মুন্নুর মাঝে এত গভীর বন্ধুত্ব যে রাজা তাকে টাঙ্গায় নিয়ে বেড়াতে বের হয়। শারদা রাজাকে দেখতে পেয়ে বলে ওঠে—বাবা, ঐ ছাখো, রাজাকাকু আসছে। (হাততালি দিয়ে) রাজাকাকু! এই যে এদিকে, আমরাও নাটক দেখতে যাচ্ছি।

রাজা মিঞা হেসে ফেলে। শ্যামকিশোর রাগে কাঁপতে থাকে। তার মনে হয়, লম্পটটা শুধু তাদের অনুসরণ করার জন্যই আসছে। দুজনের মধ্যে নিশ্চয়ই সাঁট আছে নইলে রাজা মিঞা মুন্নুকে সঙ্গে নেবে কেন? ওদের কাছ থেকে দূরে সরার জন্য সে টাঙ্গাঅলাকে বলে—একটু তাড়াতাড়ি চলো, দেরী হয়ে গেছে। টাঙ্গা ক্ষীপ্রগতিতে চলতে শুরু করে। রাজাও তার টাঙ্গার গতি বাড়িয়ে দেয়। শ্যামকিশোর যখন তার টাঙ্গাকে আস্তে যেতে বলে রাজার টাঙ্গার গতিও কম হয়। শেষে শ্যামকিশোর বিরক্তি স্বরে বলে ওঠে, টাঙ্গাকে স্ট্যাণ্ডে নিয়ে চলো, থিয়েটারে আর যাবো না। টাঙ্গাঅলা তার দিকে কৌতুহলে দেখে, তারপর টাঙ্গার মুখ ঘুরিয়ে নেয়। রাজার টাঙ্গাও সেদিকে ঘোরে। শ্যামকিশোরের মনে প্রচণ্ড রাগ চর্চর করতে থাকে, ইচ্ছে হয় রাজাকে গালাগাল দিয়ে ওঠে; কিন্তু ভয় পায় পাছে আবার ঝগড়া-বিবাদ না শুরু হয়; তাহলে অনেকেই জড়ো হবে এবং লজ্জায় তার মাথা কাটা যাবে। মনে-মনেই সমস্ত ক্রোধ সে ঢোঁক গিলে ফেলে। নিজের ওপর রাগ গিয়ে পড়ে। কে জানতো, এই শয়তান দুটো তার মাথার ওপর চেপে বসবে। মুন্নু হারামজাদাকে কালই তাড়িয়ে দেবো। কিছুদূর এগিয়ে রাজার টাঙ্গা একদিকে বাঁক নেয়; শ্যামকিশোরের রাগ তখন কিছুটা শান্ত হয়, কিন্তু নাটক দেখার আর সময় নেই। স্ট্যাণ্ড থেকে তারা বাসায় ফিরে আসে।

দেবী ঘরে ঢুকে বলে—মিছিমিছি টাঙ্গাঅলাকে দু'টো টাকা গচ্চা দিতে হলো।

শ্যামকিশোর তার দিকে রক্তপিপাসু দৃষ্টিতে চেয়ে বলে—মুন্নুর সঙ্গে আরও কথা বলো, জানালায় দাঁড়িয়ে রাজাকে ভাল করে নিজের রূপ দেখাও। তুমি যে কি করতে চাও, তুমি জানো।

দেবী—এমন কথা উচ্চারণ করতে তোমার লজ্জা হয় না? আমায় তুমি অকারণে অপমান করছো, এর ফল কিন্তু ভাল হবে না। অন্য কোন পুরুষকে আমি তোমার নখের যুগ্যি মনে করি না; ঐ হতভাগা ধাঙড়ের সাহস কি আমায় কাবু করে। তুমি আমায় এত নীচ মনে করো?

শ্যাম—না, তোমায় আমি নীচ মনে করি না। কিন্তু, অবুঝ মনে করি। এই বদমাইশটার সঙ্গে তোমার অত কথা বলা উচিত ছিল না। এখন তো বুঝতে পারছো; ব্যাটা এক নম্বরের ধূর্ত-শয়তান। নাকি, এখনও সন্দেহ আছে।

শ্যামকিশোর শুয়ে পড়ে, কিন্তু মন তার অশান্ত। সারাটা দিন সে দপ্তরে থাকে। তার অনুপস্থিতিতে দেবী কি করে, কে জানে। সে এটুকু জানে, দেবী পতিব্রতা এবং সে এও জানে সুন্দরী রমণী তার রূপ দেখাবার জন্য লালায়িত

থাকে। দেবী নিশ্চয়ই সেজেগুজে জানলার ধারে দাঁড়ায়, পাড়ার ছেলে-ছোকরারা ওকে দেখে না জানি মনে মনে কতসব কল্পনা করে। এই ব্যাপারটা বন্ধ করা তার কাছে অসম্ভব মনে হয়। প্রেমিকেরা বশীকরণ ছলাকলায় নিপুণ হয়ে থাকে। ঈশ্বর না করুক, এসব বদমাইশের পাল্লায় কোন ভদ্রঘরের বৌ-মেয়েরা পড়ে। কিন্তু, এদের পিণ্ডি ছাড়াই কি করে?

অনেক ভেবেচিন্তে অবশেষে এই বাড়ি ছেড়ে দেয়া ঠিক করে। এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ও নেই। দেবীকে বলে—এই বাড়িটাই তাহলে ছেড়ে দিই, কি বল। এসব বাজে লোকেদের মাঝে থাকলে শালীনতা নষ্ট হবার ভয় আছে।

দেবী—কিছুটা আপত্তির স্বরে বলে—তোমার যা ইচ্ছা!

শ্যাম—তুমি কোন উপায় বার করো!

দেবী—আমি আবার কি উপায় বার করবো, তাছাড়া কিসের উপায়? বাড়ি ছাড়ার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। দুটো-একটা নয়, লাখ-লাখ বাজে লোক থাক না, তাতে কি! কুকুরের ঘেউ-ঘেউ ডাকে কি কেউ বাড়ি ছেড়ে পালায়।

শ্যাম—কুকুরের কামড়ানোর ভয় থাকে তো!

দেবী এ কথার কোন জবাব দেয় না। তর্ক করলে স্বামীর দুশ্চিন্তা বেড়ে যাওয়ার ভয় আছে। কিছুটা সন্দেহবাতিক মন, বললে কি আবার ভেবে বসে।

তৃতীয় দিবসে শ্যামবাবু বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়।

॥ ৪ ॥

নতুন বাড়ীতে আসার সপ্তাহ খানিক বাদে একদিন মুন্নু মাথায় পট্টি বাঁধা অবস্থায় লাঠি ধরে ঠক্ ঠক্ করতে করতে এসে হাজির। ভেতরে ডাক দেয়। দেবী তার গলার স্বর চিনতে পারে, কিন্তু দূর করে তাড়িয়ে দেয় না। এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। পুরনো বাড়ীর খবরাখবর জানার জন্য তার মন আকুল হয়ে ওঠে। মুন্নু ভেতরে ঢুকে বলে—ঠাকরুন, আপনি যেদিন থেকে বাড়ী ছেড়েছেন, দিব্যি গালছি, ওখানে যদি একবারও গিয়ে থাকি। ঐ বাড়ী দেখে সত্যি বলতে কি কান্না পায়। আমারও ইচ্ছে করে এই পাড়ায় চলে আসি। পাগলের মত এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াই, ঠাকরুন, কোন কাজে আর মন বসে না। সব সময় আপনার কথা মনে পড়ে। আপনি যেমন আমায় ভরণ-পোষণ করতেন, কে আর এখন তেমন করবে? এ বাড়ীটা বেশ ছোট!

দেবী—তোর জন্যই ঐ বাড়ী ছাড়তে হলো।

মুন্নু—আমার জন্য ! আমি কি অপরাধ করলাম ঠাকরুণ ?

দেবী—তুই তো সেদিন টাঙ্গায় করে রাজার পাশে বসে আমাদের পেছন-পেছন আসছিলি। এমন লোকের ওপর মানুষের সন্দেহ হয় না !

মুন্নু—ঠাকরুণ, সেদিনের কথা আর জিজ্ঞেস করবেন না। রাজা মিঞার এক উকিলের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। সে স্ট্যাণ্ডের কাছে থাকে। আমাকেও সঙ্গে তুলে নেয়। ওর সইস ছিল না। লজ্জায় সে আপনার টাঙ্গার সামনে এগিয়ে যেতে পারছিল না। কর্তাবাবু তাকে বাজে লোক ভেবে থাকেন। কিন্তু তার মত ভালো মানুষ গোটা পাড়ায় নেই। পাচ ওক্ত নমাজ পড়ে, ত্রিশ দিন রোজা করে। বাড়ীতে বিবি ছাওয়াল মৌজুদ আছে। সাহস কি, কারো দিকে বদ-নজরে দেখে।

দেবী—যাক্‌গে, তোর মাথায় পট্টি বাঁধা কেন রে ?

মুন্নু—আর জানতে চাইবেন না, ঠাকরুণ। আপনার সম্পর্কে কেউ কিছু খারাপ কথা বললে আমার শরীরে আগুন জলে ওঠে। বাইরের দিকে যে হালুইঅলা থাকে, বলতে থাকে—বাবুসাহেবের কাছে কিছু পয়সা বাকী আছে। আমি বললাম—উনি এমন লোক নন যে তোমার পয়সা হজম করবেন। ব্যাস, এই কথায় তকরার হয়ে গেল। আমি দোকানের নীচে নালা পরিষ্কার করছিলাম। সে ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে আমায় ঠেলে ফেলে দিল। তখন আমার অন্যদিকে মন ছিল, ধাক্কা খেয়ে রাস্তার ওপর চিৎ অবস্থায় পড়ে যাই। চোট লেগেছিল। আমিও দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাটাকে এমন গালাগাল দিয়েছি, সে ব্যাটাও মনে রাখবে। ঘা আস্তে আস্তে শুকিয়ে এসেছে।

দেবী—ছিঃ ছিঃ ! মিছিমিছি ঝগড়া করতে গেলি। সামান্য একটা ব্যাপার। বলে দিলেই হতো—পয়সা যদি বাকী থাকে, গিয়ে নিয়ে এলেই পারো। এই শহরেই ত আছি, নাকি অন্য দেশে পালিয়ে গেছি।

মুন্নু—ঠাকরুণ, আপনার সম্পর্কে বাজে কথা শুনতে পারি না, সে যত বড় লাট হোক না কেন, ঝাঁপিয়ে পড়বোই। সে যদি মহাজন হয়ে থাকে, তো নিজের বাড়ীতে। ওর কাছে কি আমি ধারি নাকি !

দেবী—হ্যাঁরে, ঐ বাসায় নতুন কেউ এসেছে নাকি ?

মুন্নু—অনেকে এসেছিল, কিন্তু ঠাকরুণ যে বাসায় আপনি বাস করে এসেছেন, সেখানে কে আর থাকতে পারে ? আমরা ওদের সরিয়ে দিয়েছি। এদিকে রাজা মিঞা সেদিন থেকে খাওয়া-দাওয়া প্রায় বন্ধ করে বসে আছে। মেয়েটার কথা মনে করে শুধু কাঁদে। ঠাকরুণের কি আমাদের কথা মনে পড়ে ?

দেবী—কেন মনে পড়বে না ? আমি কি রক্ত মাংসের মানুষ নই ? জন্তুরাও নিজের ডেরা থেকে সরে এলে দিন কতক খাওয়া-দাওয়ায় রুচি হয় না। এই নে পয়সা, বাজার থেকে কিছু এনে খেয়ে নে, উপোস আছিস।

মুন্নু—আপনার দয়ায় খাওয়া-দাওয়ায় তেমন কষ্ট নেই। মানুষের হৃদয়টাই বড়, পয়সা কি আর এমন ব্যাপার। আপনার দয়ায় তো খাচ্ছি। ঠাকরুণের মেজাজটাই এমন, মানুষ পয়সা ছাড়াই গোলাম হয়ে পড়ে। এখন যাচ্ছি ঠাকরুণ, কর্তাবাবু হয়তো আসছেন। দেখলেই বলবেন—শয়তানটা এখানে এসেও হাজির হয়েছে।

দেবী—ওঁর আসতে এখনও দেরী।

মুন্নু—ওহো, একটা কথা তো ভুলেই গেছি। বাজা মিঞা মেয়ের জন্য কিছু খেলনা দিয়েছে। কথায় কথায় ভুলেই গেছি, খেয়াল পর্যন্ত ছিল না। কই, মেয়ে কোথায় ?

দেবী—মাদ্রাসা থেকে এখনও ফেরে নি, কিন্তু এত খেলনা আনার কি দরকার ছিল ? ওমা ! বাজা মিঞা দেখছি আশ্চর্য কাণ্ড করেছে। দেয়ার ইচ্ছে যখন ছিল, দু-চার আনার খেলনা পাঠিয়ে দিলেই হত। এই মেমটার দামই তিন-চার টাকার চেয়ে কম হবে না। সব মিলিয়ে কম করেও ত্রিশ-পয়ত্রিশ টাকার খেলনা না হয়ে যায় না।

মুন্নু—জানিনা ঠাকরুণ, আমি তো কখনও খেলনা কিনি নি। ত্রিশ পয়ত্রিশ টাকার খেলনা যদিবা হয়, তার কাছে এমন কি আর বিরাট ব্যাপার ? একা দোকান থেকেই পঞ্চাশ টাকা রোজ আয় হয়।

দেবী—না-না, এসব ফেরৎ নিয়ে যা। এত খেলনা নিয়ে সে করবে কি ? আমি শুধু এই মেমটাকে রাখছি।

মুন্নু—ঠাকরুণ, বাজা মিঞা তাহলে আমার ওপর গোসা করবে। আমায় আর আস্ত রাখবে না। প্রাণে তার বড্ড দয়ামায়া আছে। দু-চারদিনের জন্য বিবি নাইওরে গেলে খুব অস্থির হয়ে পড়ে।

সহসা শারদা পাঠশালা থেকে ফিরে আসে, খেলনা দেখতে পেয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দেবী তাকে ধমক দিয়ে ওঠে—করছিস কি ? মেমটা নে, আর গুলো নিয়ে করবি কি ?

শারদা—না মা, আমি সব কটা নেবো। মেমটাকে মোটরগাড়ির পেছনে বসিয়ে চালাবো। পেছন-পেছন এই কুকুরটা দৌড়াবে। এই থালা বাটিতে পুতুলের রান্না করবো। কোত্থেকে এনেছ, মা ? বল না।

দেবী—কোত্থেকেও আনি নি ; দেখবো বলে আমি এগুলো আনিয়েছি। তুই এ থেকে একটা বেছে তুলে নে।

শারদা—আমি সব নেবো, মা সবগুলো নাও না। কেন এনেছো, মা ?

দেবী—মুন্নু, তুই খেলনাগুলো নিয়ে ফিরে যা। শুধু ঐ মেমটা থাকুক।

শারদা—কোত্থেকে এনেছো মুন্নু, বল না ?

মুন্নু—তোমার রাজাকাকু তোমার জন্য পাঠিয়েছে।

শারদা—রাজাকাকু পাঠিয়েছে। ও হো! (নৃত্য করে) রাজাকাকু খুব ভাল। কাল আমি বন্ধুদের দেখাবো, ওদের কারো কাছে এমন পুতুল, খেলনা নেই। কি মজা।

দেবী—আচ্ছা মুন্নু, তুই এখন যা। রাজা মিঞাকে বলে দিস, আর যেন এখানে খেলনা না পাঠায়।

মুন্নু চলে যেতেই দেবী শারদাকে বলে—খুকী, তোর খেলনাগুলোকে এখন তুলে রেখে দিই। বাবা দেখলে রাগ করবে, বকুনি দেবে—কেন রাজামিঞার কাছ থেকে খেলনা নিয়েছো? ছুঁড়ে ভেঙ্গে ফেলবে। ভুলেও তোর বাবার কাছে খেলনার কথা পাড়িস না!

শারদা—না, মা। এগুলো তুমি তুলে রাখো। নইলে বাবা ভেঙ্গে ফেলবে।

দেবী—বাবাকে কক্ষনো বলিস না খেলনাগুলো রাজাকাকু দিয়েছে, নইলে বাবা রাজাকাকুকে মারধোর করবে, তোর কান কেটে দেবে। বলবে, মেয়েটা একটা ভিখীরি বেহায়া, সবার কাছ থেকে খেলনা চেয়ে বেড়ায়।

শারদা—সত্যি কথা বলছো মা। এগুলো তুমি তুলে রাখো। নইলে বাবা সব ভেঙ্গে ফেলবে।

ইতিমধ্যে বাবু শ্যামকিশোর দপ্তর থেকে ফিরে আসে। ভ্রূ কুঞ্চিত ছিল। এসেই বলে ওঠে—শয়তানটা এই পাড়ায় আসা শুরু করেছে। আজ ওকে আমি দেখেছি। ওকি এখানেও এসেছিল ?

দেবী কিছুটা দ্বিধাজড়িত গলায় বলে—হ্যাঁ, এসেছিল।

শ্যাম—তুমি ওকে আসতে দিলে? আমি বারণ করেছিলাম না যে, মুন্নুকে কখনও বাসার ভেতর পা রাখতে দেবে না।

দেবী—এসে দরজার কড়া নাড়তে থাকে, কি করবো বলো ?

শ্যাম—ওর সঙ্গে ঐ লম্পটটাও ছিল নাকি ?

দেবী—না, ওর সঙ্গে কেউ ছিল না।

শ্যাম—তুমি নিশ্চয়ই আজও ওকে এখানে আসতে বারণ করোনি।

দেবী—আমার মনে ছিল না। কিন্তু, কি করতে আর আসবে এখানে?

শ্যাম—কেন? যা করতে আজ এসেছিল, তা করতেই আবার আসবে মুখে চুণ-কালি মাথার জন্য তুমি উঠে-পড়ে লেগেছো।

দেবী রাগে শক্ত গলায় বলে—এসব আজে-বাজে কথা তুমি আমায় বলবে না, বুঝেছো? এমন কথা মুখে উচ্চারণ করতে তোমার লজ্জা বোধ করে না! ছিঃ ছিঃ। এর আগেও তুমি একবার এমন কথা বলেছিলে। আজ আবার সেই কথা বলছো। এরপরও যদি আমি এমন কথা শুনি, এর ফল ভাল হবে না, আমি বলে দিচ্ছি। তুমি কি আমায় বেশ্যা ভেবেছো নাকি?

শ্যাম—আমি চাই না সে এ বাসায় আসে।

দেবী—তাহলে বারণ করে দিলেই পারো? আমি কি তোমায় বাধা দিচ্ছি?

শ্যাম—তুমি বারণ করে দাও না কেন?

দেবী—তোমার বলতে বুঝি লজ্জা করে?

শ্যাম—আমার বারণ করাটা বৃথা। বারণ করলে তোমার আস্কারা পেয়ে যাতায়াত করবে।

দেবী ঠোঁট কামড়ে বলে—যদি আসে, কি এমন ক্ষতি? সবার বাড়িতেই ধাঙড় আসে-যায়।

শ্যাম—এরপর মুন্নুকে যদি আমি দোরগোড়ায় দেখি, তাহলে তোমার ভাল হবে না—এ আমি বলে রাখলাম।

এই বলে শ্যামকিশোর নীচে নেমে যায়। দেবী স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অপমানে, লাঞ্ছনায় এবং অবিশ্বাসের আঘাতে তার হৃদয় পীড়িত হয়ে ওঠে। সে ডুকরে কেঁদে ওঠে। যে আঘাত তার মনে বেশী করে বাজে, তাহলো, আমার স্বামী আমাকে এত নীচ, এতখানি নির্লজ্জ মনে করে। যে কাজ বেশ্যাও করে না. সেই সন্দেহ সে আমাকে করছে।

॥ ৫ ॥

শ্যামকিশোর বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে শারদা তার খেলনা তুলে নিয়ে পালিয়ে যায়, পাছে বাবা ভেঙ্গে না ফেলে। নীচে গিয়ে সে ভাবতে থাকে, এগুলো কোথায় লুকিয়ে রাখি। সে ভাবতে থাকে, আর এরি মধ্যে ওর এক বন্ধু উঠোনে ঢোকে। শারদা ওকে খেলনা দেখাবার জন্য আকুল হয়ে ওঠে। কোন রকমেই সে

এই প্রলোভন এড়াতে পারে না। বাবা এখন ওপরে, এত তাড়াতাড়ি নীচে নামবে না। ততক্ষণ বন্ধুকে খেলনাগুলো দেখাতে আপত্তি কি? বন্ধুকে সে কাছে ডাকে, তারপর দুজনে খেলনা দেখতে এতদূর মগ্ন হয়ে পড়ে যে, শ্যামকিশোর নীচে নেমে এসেছে সে খেয়ালটুকুও নেই। খেলনা দেখতে পেয়েই শ্যামকিশোর প্রায় ঝাঁপিয়ে শারদার কাছে এসে হাজির হয়, জিজ্ঞেস করে—এই খেলনাগুলো কোত্থেকে পেয়েছিস?

শারদার ফোঁপানি শুরু হয়। ভয়ে সে থরথর করে কাঁপতে থাকে। মুখ থেকে একটাও শব্দ বেরোয় না।

শ্যামকিশোর আবার ধমকে জিজ্ঞেস করে—বলছিস না যে। বল, কে তোকে খেলনা দিয়েছে?

শারদা কেঁদে ফেলে। শ্যামকিশোর তখন তাকে আদর করে বলে—কাঁদিস না। তোকে মারবো না আমি। শুধু জানতে চাই, এত সুন্দর সুন্দর খেলনা কোত্থেকে পেয়েছিস তুই?

এভাবে দু-চারবার আশ্বাস দেয়ার পর শারদা কিছুটা সাহস পায়। সে সব কথা বলে ফেলে। হায়! এর চেয়ে শারদা যদি চুপ করে থাকত, অনেক ভাল হতো। বোবা হয়ে থাকাটাই তার ভাল ছিল। দেবী কিছু একটা কথা বলে ব্যাপারটা চাপা দিতে পারত, কিন্তু নিয়তির লিখন খণ্ডাবে কে? শ্যামকিশোরের শিরায়-শিরায় আগুন ধরে ওঠে। খেলনাগুলো সেখানেই ফেলে রেখে গট্ গট্ করে সে আবার ওপরে উঠে যায়, দেবীর দু-কাঁধ শক্ত হাতে ধরে নাড়া দিয়ে বলে ওঠে—এ বাড়িতে তুমি কি থাকতে চাও? স্পষ্ট করে বলো।

এতক্ষণ ধরে দেবী ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। এই নির্মম প্রশ্ন শুনে তার চোখ থেকে অশ্রু নিঃশেষ হয়ে যায়। বিশাল বিপদের আশংকায় তুচ্ছ আঘাত লুপ্ত হয়ে যায়—ঘাতকের হাতে তরবারি দেখে রোগগ্রস্ত প্রাণী যেমন রোগ-শয্যা থেকে উঠে পালিয়ে যায়—শ্যামকিশোরের দিকে সে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দেখতে থাকে, মুখে কোন শব্দ করে না। তার প্রতিটি রোম নীরব ভাষায় জানতে চায়—হঠাৎ, এই প্রশ্নের অর্থ?

শ্যামকিশোর আবার বলে উঠে—তোমার ইচ্ছাটা কি? আমায় স্পষ্ট করে বলো। আমার সঙ্গে বাস করতে করতে যদি তুমি হাঁপিয়ে উঠে থাকো, তাহলে চলে যাবার অধিকার তোমার আছে। আমি তোমায় বন্দী করে রাখতে চাই না। আমার সঙ্গে ছল-চাতুরী করার কোন প্রয়োজন নেই। খুশী মনেই আমি তোমায় বিদায় দিতে রাজী আছি। তুমি যখন মনে-মনে একটা ব্যাপার স্থির করে

ফেলেছো, আমিও স্থির করে ফেলেছি। এ ঘরে তুমি এখন থাকতে পারবে না। থাকার যোগ্যও নও।

দেবী কণ্ঠস্বর কিছুটা সামলে নিয়ে বলে—তোমার আজকাল কি হয়েছে বলোত, সব সময় গলা দিয়ে যেন বিষ ওগলাতে থাকো? আমায় যদি ভাল না লাগে, তাহলে বিষ এনে দাও, এভাবে জ্বালিয়ে মারছো কেন? ধাঙড়ের সঙ্গে কথা বলাটা কি এত অপরাধ! ও যখন এসে ডাকে, আমি গিয়ে দরজা খুলে দিয়েছি। যদি জানতাম, সামান্য তিল থেকে তাল হবে, তাহলে ওকে দূর করে তাড়িয়ে দিতাম।

শ্যাম—ইচ্ছে করছে, জিভ টেনে বার করে দিই। এদিকে কথা হচ্ছে, ইশারা চলছে, উপহার ভেট পাচ্ছো! বাকী আর কি রইলো?

দেবী—মিছিমিছি কাটা ঘায়ে আর নুন ছড়িও না? অসহায় মেয়ের প্রাণ নিয়ে তুমি কি পাবে?

শ্যাম—আমি কি তাহলে মিথ্যে কথা বলছি?

দেবী—হ্যাঁ, মিথ্যে কথা বলছো।

শ্যাম—খেলনাগুলো এলো কোত্থেকে?

দেবীর বুক কেঁপে ওঠে সাংঘাতিক। কাটলেও বুঝি শরীর থেকে রক্ত বার হবে না। বুঝতে পারে, এখন গ্রহ তার খারাপ, যাবতীয় সর্বনাশের এক জোট হয়েছে। হতচ্ছাড়া এই খেলনাগুলো কি দুভাগ্য বয়ে নিয়ে এসেছে! কেন যে আমি নিতে গেলাম, সেই মুহূর্তে ফেরৎ দিয়ে দিলাম না কেন! কথাটা ঘুরিয়ে সে বলে—চুলোয় যাক ঐ খেলনা! বাচ্চাদের দোষ কি, ওদের ধরে রাখবে কে, ওরা মানবে নাকি! যতই বলি নিস না; কিন্তু বারণ শোনেনা, তা আমি আর কি করি! যদি জানতাম এই খেলনার জন্য আমার এত হেনস্থা হবে, তাহলে জোর করে কেড়ে ফেলে দিতাম।

শ্যাম—বটে! এর সঙ্গে আর কি কি জিনিস এসেছে। ভাল যদি চাও, এক্ষুনি বার করে দাও।

দেবী—যদি এসেই থাকে, এ-ঘরেই আছে। দেখে নিচ্ছ না কেন? ঘর তো আর এমন বড় নয়, দু-চারদিন সময় লাগবে?

শ্যাম—আমার অত সময় নেই। ভাল চাও, যা-যা এসেছে আমার সামনে এনে রেখে দাও। শুধু মেয়ের জন্য খেলনা এসেছে, আর তোমার জন্য কোন সওগাত আসেনি—এতো আর হতে পারে না। গঙ্গায় গলাজলে নেবেও যদি দিব্যি কাটো, তবুও বিশ্বাস হবে না।

দেবী—তাহলে ঘরে খুঁজে দেখে নাও না কেন ?

শ্যামকিশোর ঘুঁষি বাগিয়ে বলে ওঠে—বলেছি না, আমার সময় নেই। যাও, সোজা কথায় সব জিনিস নিয়ে এসো, নইলে গলা টিপে মেরে ফেলবো বলছি।

দেবী—মারো, মেরে ফেলো আমায়, যে জিনিস আসেনি, আমি তা বার করি কোত্থেকে ?

রাগে শ্যামকিশোর উন্মত্ত হয়ে দেবীকে জোরে ধাক্কা দেয়, তাল সামলাতে না পেরে মেঝের ওপর চিৎ অবস্থায় পড়ে যায় দেবী। তারপর ওর গলায় হাত রেখে বলে—টিপে দিই, বল ! তাহলে তুই ওসব জিনিস দেখাবি না ?

দেবী—যা ইচ্ছে, করো তুমি !

শ্যাম—রক্ত চুষে খাবো ? তুই ভেবেছিস কি ?

দেবী—রক্ত খেলে যদি মনের তেষ্টা মেটে, খাও তাহলে।

শ্যাম—আর কখনও ঐ ধাঙড়টার সঙ্গে কথা বলবি না তো ? ফের যদি ঐ মুন্নু বা ওর লোকটাকে বাড়ির সামনে দেখি, তাহলে গলা টিপে মেরে ফেলবো।

এই বলে শ্যামকিশোর দেবীকে ছেড়ে দেয়, তারপর বাইরে বেরিয়ে যায়। দেবী বহুক্ষণ সেই অবস্থায় মেঝের ওপর পড়ে থাকে। তার মনে এখন স্বামী-প্রেমের মর্যাদা রক্ষার লেশমাত্র নেই। প্রতিকারের জন্য তার অন্তঃকরণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিল। এই মুহূর্তে সে যদি শুনতে পায়, শ্যামকিশোরকে বাজারে কেউ জুতো পেটা করেছে, তাহলে সে হয়তো খুশী হতো। কয়েকদিন বৃষ্টি ভেজার পর, আজ আঁধির প্রকোপে প্রেমের-প্রাচীর ভেঙ্গে পড়েছে, মন রক্ষার জন্য কোন সাধনাই অবশেষ নেই। আজ কেবল সংকোচ ও লোক-লজ্জার পলকা ধরনের সুতো ঝুলে রয়েছে, যা সামান্য টানে ছিঁড়ে যেতে পারে।

শ্যামকিশোর বাইরে চলে যেতে শারদা তার খেলনা নিয়ে বাড়ির বাইরে বেরোয়। বাবা যখন খেলনা দেখে কিছু বললো না, তাহলে আর কিসের চিন্তা, কিসের ভয়। এখন সে খেলনাগুলোকে তার বন্ধুদের দেখাবে না কেন ! রাস্তার ওপারে একটা মিষ্টির দোকান। মিষ্টিঅলার মেয়ে বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। শারদা তাকে খেলনা দেখাবার জন্য এগোয়। মাঝখানে রাস্তা, ঘন-ঘন গাড়ি-ঘোড়া, মোটরের যাতায়াত লেগেই আছে। শারদা নিজের আনন্দে মশগুল, অন্যদিকে তার আর কোন লক্ষ্য নেই। বালক-সুলভ ঔৎসুক্যে ভরা সে খেলনা

নিয়ে রাস্তায় দৌড়য়। কে জানতো পেছন-পেছন শমন সেরকম দৌড়ে আসছে প্রাণের খেলনা নেয়ার জন্য। সামনে একটা মোটর গাড়িকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। অন্যদিক থেকে একটা ঘোড়ার গাড়ি এগিয়ে আসছে। শারদা ভাবে, সে দৌড়ে পার হয়ে ওদিকে চলে যেতে পারবে। মোটর হর্ণ দেয়; শারদাও দৌড়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়; কিন্তু ভবিতব্য রুখবে কে! মোটর গাড়ি শারদাকে চাপা দিয়ে ঘষটাতে ঘষটাতে কিছুদূর এগিয়ে যায়। রাস্তার ওপরে একটা মাংসের পিণ্ড। পাশে খেলনাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে অক্ষত অবস্থায় পড়ে থাকে সেরকম। একটাও ভাঙ্গে নি! খেলনা পড়ে থাকে, কিন্তু যার খেলার কথা সে আর থাকে না। দুটোর মাঝে কোনটা স্থায়ী, কোনটা বা অস্থায়ী—কে তা নির্ণয় করবে!

চারিদিক থেকে লোকেরা ছুটে আসে। একি! এ যে শ্যামবাবুর মেয়ে—ও বাড়ির ওপর তলার ভাড়াটে। ইস্, মাংস-পিণ্ড কে তুলবে! একজন লোক ছুটে যায় তাদের বাড়ি, গিয়ে ডাকে—শ্যামবাবু! শ্যামবাবু! আপনার মেয়ে কি বাইরে খেলা করছিল? একটু নীচে নেবে আসুন, তাড়াতাড়ি।

দেবী ছাদের আলসেতে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে দৃষ্টি ফেলে, চোখের সামনে শারদার মাংস-পিণ্ড উঠে আসে। আর্ত-চিৎকারে সে বেসামাল, অস্থিরভাবে নীচে দৌড়ে আসে, রাস্তায় এসে শারদাকে কোলে তুলে নেয়। তার পা জোড়া থরথর কাঁপতে থাকে। এই বজ্রপাত তাকে পাথর করে ফেলে। চোখ ফেটে কান্নাও বেরোয় না।

পাড়ার কয়েকজন তাকে জিজ্ঞেস করে—শ্যামবাবু কোথায়! তাকে কিভাবে খবর দেয়া যায়?

কি উত্তর দেবে দেবী? সে সংজ্ঞাহীন হয়ে আছে। মেয়ের মৃতদেহ তার কোলের ওপর, রক্তে শাড়ি-কাপড় ভিজে চুবচুবে, আকাশের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। যেন, ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করছে—সব বিপদ কি আমারই মাথায়?

অন্ধকার হয়ে আসছে, অথচ শ্যামকিশোরের কোন পাত্তা নেই। জানেও না, সে গেছে কোথায়। ধীরে-ধীরে ন'টা বাজে; শ্যামকিশোরের দেখা নেই। এতক্ষণ সে বাইরে থাকে না কখনও। আজই কি তার এমন গায়েব হওয়া দরকার ছিল? হা ঈশ্বর! দশটা বাজে, দেবী এবার কেঁদে ফেলে। মেয়ের মৃত্যুতে দুঃখ যতটা না হয়, তার চেয়ে বেশী দুঃখ হয় তার নিজের অসামর্থ্যে। শবের দাহক্রিয়া করবে কি করে? কে যাবে তার সঙ্গে? এত রাত হয়েছে.

.কেউ কি রাজী হবে তার সঙ্গে যেতে? যদি কেউ সঙ্গে না যায়, তাহলে কি তাকে একা যেতে হবে? সারারাত কি মাংসপিণ্ড কোলে নিয়ে বসে কাটাতে হবে?

ক্রমশঃ নিস্তব্ধতা ঘিরে ধরতে থাকে, দেবীর ভয় হতে থাকে। সে পশ্চাত্তাপ করতে থাকে, হায়, হায়, কেন সে সন্ধেবেলায় মৃতদেহ নিয়ে বেরিয়ে পড়েনি।

বারোটা বাজে। সহসা দরজা খোলে কেউ। দেবী উঠে দাঁড়ায়। ভাবে, উনি এসেছেন। তার হৃদয় ফুলে ওঠে, কাঁদতে-কাঁদতে বাইরে আসে; কিন্তু, আহ! উনি নন, পুলিশের লোক—মামলার তদন্তে এসেছে। বেলা পাচটার ঘটনা। তদন্ত শুরু হয় রাত এগারোটার সময়। হবে না কেন, থানার বাবুও তো মানুষ; সন্ধ্যাবেলায় সেও বেড়াতে-টেড়াতে বেরোয় যে!

ঘণ্টাখানিক ধরে তদন্ত চলে। দেবী ভেবে দেখে এখন আর সঙ্কোচ করে কাজ এগোবে না। থানার বাবু তাকে যা জিজ্ঞেস করে, নিঃসঙ্কোচে সে তার জবাব দেয়। একটুও লজ্জাবোধ করে না, দ্বিধাও হয় না। থানার বাবুও বিস্মিত হয়।

সকলের বয়ান লিখে দারোগাবাবু যখন বেরোতে যায়, দেবী জিজ্ঞেস করে—আপনি কি সেই মোটর গাড়ীর খোঁজ করবেন?

দারোগা—এখন হয়তো খোঁজ পাওয়া যাবে না।

দেবী—তাহলে কি ওর কোন সাজা হবে না?

দারোগা—কি করে হবে? কেউ তার নম্বর জানে না।

দেবী—সরকারের তরফ থেকে কোন ব্যবস্থা হবে না? গরীবের ছেলেরা কি এভাবে পিষে-গুড়িয়ে মরবে?

দারোগা—এর কি ব্যবস্থা হতে পারে? মোটর গাড়ী তো আর বন্ধ করা যাবে না?

দেবী—অন্ততঃ পুলিশদের এটা দেখা উচিত, শহরে কেউ যেন জোরে গাড়ী না চালায়! কিন্তু আপনারা তা দেখবেন কেন? আপনাদের অফিসাররাও মোটরে চেপে যান। আপনি যদি তাদের গাড়ী থামান, তাহলে কি আপনার চাকরি আর থাকবে?

থানার বাবুরা লজ্জা পেয়ে চলে যায়। রাস্তায় নেমে একজন সেপাই বলে ওঠে—বউটা বড় ক্যাটকেটে কথা বলে হুজুর।

দারোগা—আরে, এ যে আমার দম ছাড়িয়ে দিয়েছে। কি ভয়ঙ্কর রূপ পেয়েছে, অ্যাঁ! কিন্তু সত্যি বলছি, একবারও ওর দিকে চেয়ে দেখিনি। চেয়ে দেখার সাহস পাইনি।

রাত বারোটার পর শ্যামকিশোর নেশায় চুর হয়ে বাড়ী ফেরে। মাঝপথেই সে এ দুঃসংবাদ পেয়েছে। কাঁদতে কাঁদতে বাড়ীতে ঢোকে। দেবী বসেছিল, ভেবে রেখেছিল—যাই হোক না কেন, আজ ঝগড়াঝাটি না করে ছাড়বো না। কিন্তু তাকে এমনভাবে কাঁদতে দেখে, সব রাগ জল হয়ে যায়। তার সঙ্গে নিজেও কাঁদতে শুরু করে। অনেকক্ষণ ধরে দুজনে একসঙ্গে কাঁদতে থাকে। এই বিপদ তাদের দুজনের হৃদয়কে পরস্পরের কাছাকাছি টেনে আনে। মনে হলো, তাদের আগেকার প্রেম যেন জাগরুক হয়েছে।

পরদিন সকালে সবাই দাহ-ক্রিয়া সেরে ফিরে আসে। শ্যামকিশোর দেবীর দিকে স্নেহভরে করুণ স্বরে বলে—একা একা তোমার কাটাতে কষ্ট হবে।

দেবী—তুমি কি দশ-পাচ দিনের ছুটি নিতে পারবে না ?

শ্যাম—আমিও তাই ভাবছি। পনেরো দিনের ছুটি নিই, কী বল।

শ্যামকিশোর ছুটি নেবার জন্য দপ্তরে রওনা দেয়। এই বিপদে দেবীর মন একদিকে যতটা অনাবিল হয়ে ওঠে, তা মাসাবধি কাল ছিল না। মেয়েকে হারিয়ে যে বিশ্বাস ও প্রেম সে পায়, তা তার অশ্রু মোছার পক্ষে নিতান্ত কম নয়।

আহ্! অভাগিনী! এত খুশী হয়ও না। তোমার জীবনের শেষ অঙ্ক এখনও বাকী, যা তুমি আজও কল্পনা করতে পারবে না।

॥ ৭ ॥

পরদিন শ্যামকিশোর বাড়ীতেই ছিল, এমন সময় মুন্নু এসে সেলাম জানায়। শ্যামকিশোর কিছুটা শক্ত গলায় জিজ্ঞেস করে—কি ব্যাপার! তুই বার বার এখানে আসিস যে বড় ?

মুন্নু করুণস্বরে বলে—কর্তা, কালকের কথা যে শোনে, তারই রাগ ধরে। আমি হলাম হুজুরের গোলাম। চাকর ছাড়া আর কি, কর্তার নেমক খেয়েছি যে। তা কি কখনও হাড়মাস থেকে আলাদা করা যায় ? মাঝে-মাঝে খোঁজ-খবর নিতে এসে পড়ি। কালকের কথা শোনার পর, হুজুর, মনের মধ্যে যা করছে তা কি করে বলি। আহা, কি সুন্দর মেয়ে! দেখলেই মনের সব দুঃখ দূর হয়ে যেত। আমাকে দেখলেই মুন্নু-মুন্নু করে ছুটে আসত ; পর-লোকের মনেই যখন এই অবস্থা, হুজুরের মনে যে কি বয়ে চলেছে তা একমাত্র হুজুরই জানেন।

শ্যামবাবু কিছুটা নরম হয়ে বলে—ঈশ্বরের ইচ্ছার বাইরে মানুষ আর কি করতে পারে ? আমার ঘর অন্ধকার হয়ে গেছে। এখন আর এখানে বাস করার ইচ্ছে নেই।

মুন্নু—ঠাকরুণের অবস্থা নিশ্চয়ই আরও খারাপ।

শ্যাম—তা তো হবেই। আমি ওকে সকাল-সন্ধ্যে খাওয়াতাম। আর সারাদিন মা ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকতো। আমি অবশ্য সারাদিন কাজকর্মে ভুলে থাকবো। কিন্তু সে কি করে ভুলে থাকবে? সারা জীবন তার কান্নায় কাটবে।

স্বামীকে মন্নুর সঙ্গে কথা বলতে শুনে দেবী ঘরের ফাঁক দিয়ে উঠোন দেখে। মুন্নুকে দেখতে পেয়েই তার চোখ বাধাহীন অশ্রুতে ভরে ওঠে। বলে—মুন্নু, আমার সব গেছে!

মুন্নু—ঠাকরুণ, ধৈর্য্য ধরেন, কেঁদে-কেটে আর লাভ কি? এই সব আঁধার দেখেই মাঝে মাঝে আল্লাকে বড় জালিম মনে হয়। যে বেইমান অন্যের গলা কাটার জন্য ঘোরাফেরা করে, আল্লা তাকেও ভয় পায়। যারা সরল, সৎ—তাদের ওপর বিপদ এসে পড়ে।

মুন্নু দেবীকে আশা ভরসা দিতে থাকে। শ্যামবাবুও তার কথায় সমর্থন জানাতে থাকে। সে চলে যাবার পর শ্যামবাবু বলে—লোকটাকে খারাপ বলে মনে হয় না।

দেবী বলে— মনটা খুব ভালো। দুঃখ না পেলে কি সে এখানে আসতো?

॥ ৮ ॥

পনেরো দিন পেরিয়ে যায়। শ্যামকিশোর আবার দপ্তরে যাতায়াত করে। এর মাঝে মুন্নু আর কখনও আসে নি। এতদিন দেবীর দিন কেটে যেত স্বামীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে, কিন্তু এখন সে চলে যেতেই বার বার শারদার কথা তার মনে পড়ে। সারাদিন প্রায় কেঁদে ভাসায়। পাড়ায় দু-চারজন নীচ জাতির মেয়ে-বৌ আসত; কিন্তু দেবীর সঙ্গে মনের মিল হতো না, ফলে তারা কপট সহানুভূতি দেখিয়ে দেবীর কাছ থেকে কিছু আদায় করতে চাইত।

একদিন বেলা চারটে নাগাদ মুন্নু আবার আসে, উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাকে—ঠাকরুণ, আমি মুন্নু, একটু নীচে আসবেন।

দেবী ওপর থেকেই জিজ্ঞেস করে—কি দরকার? ওখান থেকেই বল।

মুন্নু—একটু নীচে আসুন না।

দেবী নীচে নেমে আসে। মুন্নু বলে—রাজা মিঞা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। হুজুরের কাছে মাতমপুর্সী (শোকপ্রকাশ) করতে চায়।

দেবী বলে ওঠে—গিয়ে বলে দে, ভগবানের যা ইচ্ছে, তাই ঘটেছে।

রাজা মিঞা দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে কথাটা স্পষ্ট শুনতে পায়।

বাইরে থেকেই বলে ওঠে—খোদা জানেন, যখনই এ খবর পেয়েছি, আমার মন ভেঙ্গে টুকরো হয়ে গেছে। আমি দিল্লী গিয়েছিলাম। আজই ফিরে এসেছি। আমার থাকাতে যদি এই ঘটনা ঘটত, তাহলে আর যাই করি না কেন, অন্ততঃ গাড়ীঅলাকে সাজা না পাইয়ে ছাড়তাম না—তা, লাটসাহেবের মোটর গাড়ী হোক না কেন। গোটা শহর ছেঁকে তুলতাম। বাবুসাহেব চুপ করে বসে রইলেন, এ কি কোন কথা হলো। তা বলে মোটর গাড়ী চালিয়ে কেউ কারো প্রাণ নেবে নাকি! আহা, কুসুমের মত ফুটফুটে মেয়েটাকে জালিমেরা মেরে ফেলল। হায়! কে আর এসে আমায় রাজাকাকু বলে ডাকবে! খোদার কসম, ওর জন্ম দিল্লী থেকে ঝুড়িভর্তি খেলনা এনেছি। কে জানতো, এখানে সে সমস্ত খেলা শেষ করে চলে গেছে। মুন্নু, ত্যাখ. এই মাদুলিটা নিয়ে ভাবিজীকে দিয়ে আয়। এটা খোঁপার ভেতরে বেঁধে রাখবে। খোদা চাইলে তাঁর কোন রকম দুর্ভোগ বা খারাপ কিছু হবে না। উনি হয়তো নানান ধরনের দুঃস্বপ্ন দেখতে পারে, রাতে ভাল করে ঘুম নেই, বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করতে পারে। সব কিছু এই মাদুলির প্রভাবে নষ্ট হয়ে যায়। একটা বড় ফকিরের কাছ থেকে আমি এই মাদুলি পেয়েছি।

এভাবে রাজা মিঞা আর মুন্নু ততক্ষণ পর্যন্ত একটা না একটা অজুহাতে দোরগোড়া থেকে সরে না, যতক্ষণ না শ্যামবাবুকে ফিরে আসতে দেখা যায়। শ্যামকিশোর তাদের দুজনকে ফিরে যেতে দেখে। উপরে এসে গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করে—রাজা মিঞা কি জন্যে এসেছিল?

দেবী—এমনিই, মাতমপুর্সী করতে এসেছিল। আজই দিল্লী থেকে ফিরেছে। খবর শুনেই ছুটে এসেছে।

শ্যাম—পুরুষেরা পুরুষকে শোক প্রকাশ করে, নাকি মেয়েমানুষকে?

দেবী—তোমার দেখা পায়নি, তাই আমার কাছে শোক প্রকাশ করে ফিরে গেছে।

শ্যাম—তার অর্থ দাঁড়াল যে, লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে আমাকে না পেলে তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারে। এতে কোন ক্ষতি নেই, তাই তো?

দেবী—আমি কি সবার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি?

শ্যাম—তা, রাজা মিঞা কি আমার শালা, নাকি শ্বশুর?

দেবী—সামান্য ব্যাপারে তুমি বড় হৈচৈ বাঁধাও।

শ্যাম—বটে! এটা সামান্য হলো! একজন ভদ্রঘরের বৌ একটা লম্পটের সঙ্গে কথা বলবে, এটা সামান্য ব্যাপার, না! তাহলে অসামান্য ব্যাপার কোনটা? এও সামান্য ব্যাপার নয় যদি আমি তোমার গলা টিপে মেরে ফেলি, এমনকি এ

কাজে আমার পাপ হবে না। দেখছি তুমি আবার সেই আগেকার পথ ধরেছো। এত বড় সাজা পেয়েও তোমার চোখ খোলেনি। এবার কি আমায় খেতে চাইছো?

দেবী স্তব্ধ হয়ে পড়ে। একে মেয়ের শোক তদুপরি এই অপশব্দের বোঝা, সেই সঙ্গে ভীষণ আক্ষেপ। ওর মাথা ঘুরে ওঠে। সেখানেই বসে পড়ে কাঁদতে শুরু করে। এ জীবনের চেয়ে মরণও অনেক ভালো। শুধু এই শব্দ কটি তার মুখ থেকে বেরোয়।

শ্যামকিশোর গর্জে উঠে বলে—হ্যাঁ, তাই হবে, চিন্তা নেই, চিন্তা নেই, তাই হবে। তুমি মরতে চাও, আমারও আকাঙ্খা নেই তুমি অমর হয়ে থাকো। যত তাড়াতাড়ি তোমার জীবন শেষ হয়, ততই মঙ্গল। বংশে তাহলে চুণকালি পড়বে না।

দেবী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, বলে—অসহায় মেয়ে পেয়ে তুমি এত অন্যায় করছো কেন? তোমার কি একটুও দয়ামায়া নেই?

শ্যাম—চুপ কর, বলছি।

দেবী—কেন চুপ করবো। বলি, তুমি কি মুখ বন্ধ করতে চাও?

শ্যাম—আবারও কথা বলছো? এবার উঠে মাথা ফাটিয়ে দেবো?

দেবী—কি? মাথা ফাটাবে তুমি, জোরজবস্তি পেয়েছো নাকি?

শ্যাম—তাহলে ডাক তোর লোকজনকে। দেখি কে তোকে রক্ষে করে।

এই বলে শ্যামবাবু রেগে ওঠে, তারপর দেবীকে কয়েকটা চড় ও কিল মারে। মার খেয়েও দেবী কাঁদে না, চেঁচায় না, এমন কি মুখ দিয়ে একটা শব্দও বার করে না, শুধু অর্থহীন দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে, যেন সে নিশ্চিত হতে চায় এ কি মানুষ, না অন্য কিছু।

মার-ধোর করে শ্যামকিশোর যখন সরে দাঁড়ায়, দেবী শুধু বলে—মনের ঝাল এখনও যদি না মিটে থাকে, তাহলে মিটিয়ে নাও। পরে হয়তো সুযোগ নাও পেতে পারো।

শ্যামকিশোর জবাব দেয়—মাথা ফাটিয়ে দেবো, বুঝবি তুই কার পাল্লায় পড়েছিস?

বলতে বলতে সে নীচে নেমে যায়। এক ঝটকায় দরজা খোলে, সশব্দে বন্ধ করে সে বেরিয়ে পড়ে।

এবার দেবীর চোখ বেয়ে অশ্রুনদী গড়াতে শুরু করে।

রাত দশটা বেজে গেছে; তবুও শ্যামকিশোর বাসায় ফেরে নি। কাঁদতে

কাঁদতে দেবীর চোখ ফুলে উঠেছে। রাগের মাথায় স্বভাবতই মধুর স্মৃতি লোপ পেয়ে যায়। দেবীর এমন মনে হতে থাকে, শ্যামকিশোরের সঙ্গে তার কখনও প্রেম ঘটেনি। তবে, হ্যাঁ, কয়েকদিন অবশ্য তার মুখে—কিন্তু তা কৃত্রিম প্রেম ছিল। যৌবনের আনন্দ উপভোগের জন্য তার সঙ্গে মিষ্টি মধুর প্রেমালাপ করত। তাকে বুকের মাঝে আঁকড়ে ধরত, তাকে হৃদয়ের 'পরে শোয়াতো। হ্যাঁ, এসবই ছিল কৃত্রিম, শুধু দেখানো, অভিনয় মাত্র। তার মনেই পরে না কখনও কি তার সঙ্গে সত্যিকার প্রেম হয়েছিল! এখন সে রূপ নেই, যৌবনও নেই, সেই সজীবতাও নেই! তার সঙ্গে অত্যাচার করতে তাহলে বাধা কোথায়? সে ভাবল—কিছুই না! এখন তার মন আমার প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠেছে, নইলে সামান্য ব্যাপারে আমার ওপর এমন করে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যে কোন একটা কলঙ্ক দিয়ে আমার কাছ থেকে সরে পড়তে চায়। এই যদি হয়, আমি কেন তাহলে এর ভাত-কাপড় আর মার খাবার জন্য এই সংসারে পড়ে থাকি? প্রেমই যখন রইল না, আমার এখানে থাকাটাই ধিক্কার! বাপের বাড়িতে আর কিছু না হোক, এ রকম দুর্গতি তো হবে না। এর যদি এই ইচ্ছে; তাহলে এটাই হোক। আমিও মনে করবো, বিধবা হয়েছি।

রাত যত এগোতে থাকে, দেবীর প্রাণ শুকিয়ে আসতে থাকে। ওর মনে ভয় চেপেছিল, ফিরে এসে আবার না মারধোর শুরু করে। সাংঘাতিক রাগ নিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। কি ভাগ্য! আমি কি এত নীচ হয়ে গেছি যে ধাঙড়ের সঙ্গে, জুতোঅলার সঙ্গে আশনাই করে বেড়াবো। এমন কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতেও এই ভালো মানুষের সামান্য লজ্জা হয় না। কি করে যে তার মনে এমন কথা উদয় হয়! আর কিছু নয়, আসলে স্বভাবে নীচ, অনুদার অন্তঃকরণ, স্বার্থপর লোক ছাড়া সে আর কিছু নয়। নীচ-দের সঙ্গে থাকলে নীচ হতে হয়। আমারই ভুল, এতদিন ধরে এর মেজাজ সহ্য করে এসেছি। যেখানে সম্মান নেই, মর্যাদা নেই, প্রেম নেই, বিশ্বাস নেই, সেখানে বাস করা বেহায়াপনা ছাড়া আর কি! আমি তো এর কাছে ক্রীতদাসী হইনি, যা ইচ্ছে তাই করবে, মারধোর করবে আর আমি পড়ে-পড়ে সহ্য করবো। সীতার মত স্ত্রী যদি হয়, রামের মত স্বামীও হয়!

দেবীর ক্রমশঃ এমন আশঙ্কা হতে থাকে, শ্যামকিশোর ফিরে এসে সত্যি-সত্যি তার গলা টিপে মেরে ফেলবে, অথবা ছোরা বিঁধে দেবে। সে সংবাদপত্রে এ ধরণের বহু নিষ্ঠুর হত্যার খবর পড়েছে। শহরে এ ধরনের বহু ঘটনা ঘটেছে। ভয়ে সে কাঁপতে থাকে। এখানে থাকলে তার প্রাণ সুরক্ষিত থাকবে না।

দেবী তারপর কাপড়ের একটা ছোট পুঁটুলি বাঁধে, ভাবতে বসে—এখান থেকে বেরোব কি করে? তাছাড়া বেরিয়েই বা যাবো কোথায়? এখন যদি মুন্নুর খবর পাওয়া যেত, তাহলে কাজ হতো। ও কি আমাকে বাপের বাড়িতে পৌঁছে দিত না? একবার বাপের বাড়ি গিয়ে হাজির হই না। তারপর উনি মাথা খুঁড়ে মরলেও, ভুলেও কখনও আসবো না। সেও মনে রাখবে। টাকাগুলো রেখে যাই কেন, এ দিয়ে তো মজা ফুর্তি লুটবে! আমিই সংসার-খরচ থেকে কেটে-ছেঁটে জমিয়েছি। এর আর এমন কি আয়। খরচ করতে চাইলে, কানাকড়িও সঞ্চয় হতো না। নেহাৎ পয়সা-পয়সা করে জমিয়েছি।

দেবী নীচে নেমে দরজা বন্ধ করে আসে। তারপর বাক্স খুলে তার সমস্ত অলঙ্কার এবং টাকা বার করে পুঁটুলিতে বাঁধে। সব কটা কারেন্সি নোট, ফলে ভার বোধ হয় না।

সহসা কেউ সদর দরজায় সশব্দে ধাক্কা দেয়। দেবী আঁতকে ওঠে। ওপর থেকে উঁকি মেরে দেখে, শ্যামকিশোর! তার সাহস হয় না গিয়ে দরজা খুলে দেয়। উপরন্তু শ্যামবাবু এত জোরে-জোরে ধাক্কা মারতে শুরু করে, যেন দরজা ভেঙ্গে ফেলবে। এভাবে দরজা খোলার প্রয়াস তার মনের অবস্থা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করছিল। বাঘের মুখে যাওয়ার সাহস দেবীর হয় না।

অবশেষে শ্যামকিশোর চেঁচিয়ে বলে—ও ড্যাম! দরজা খোলো! ও ব্লাডি! দরজা খোলো, এক্ষুণি খোলো।

দেবীর মনে যাও বা সাহস ছিল, তাও লুপ্ত হতে থাকে। শ্যামকিশোর নেশায় চুর হয়ে এসেছে। হুঁশ থাকলে হয়তো বা দয়া জাগতো, তাই মদ খেয়ে এসেছে। দরজা আমি আর খুলছি না, ভেঙ্গে ফেললেও। এখন আর আমাকে এ বাড়িতে পাচ্ছো না, মারবে কোত্থেকে? তোমায় ভাল করে চিনেছি।

পনরো-কুড়ি মিনিট ধরে শ্যামকিশোর হৈ-হল্লা করে দরজা নাড়ার পর হাবি-জাবি বকতে-বকতে চলে যায়। দু-চারজন প্রতিবেশী তাকে ধিক্কার-ধমক দেয়। ছিঃ ছিঃ, শিক্ষিত লোক হয়ে আপনি মাঝরাতে বাড়ি ফেরেন। ঘুমিয়ে পড়েছে হয়তো, তাই খুলছে না, কি আর করবেন? বরং কোন বন্ধু-টন্ধুর বাড়িতে গিয়ে শুয়ে থাকুন, সকালে আসবেন।

শ্যামকিশোর চলে যাবার পর দেবী পুঁটুলি তোলে, তারপর ধীর পায়ে নীচে নামে। কিছুক্ষণ কান পেতে শব্দ শোনে, শ্যামকিশোর দাঁড়িয়ে নেই তো! যখন বিশ্বাস হয় যে চলে গেছে, সে আস্তে দরজা খোলে। তারপর বাইরে বেরিয়ে পড়ে। মনে তার সামান্যতম ক্ষোভ বা দুঃখ নেই। শুধু একমাত্র ইচ্ছে, এখান থেকে

কোন রকমে পালিয়ে যাই। এমন কোন পুরুষ নেই, যার ওপর ভরসা রাখা চলে, এই সংকটে যে তাকে সাহায্য করতে পারে! যদি থাকে, তা কেবল মুন্নু খাণ্ডড়। ওর সঙ্গে দেখা করার সমস্ত আশা তার এখনো রয়ে গেছে। ওর সঙ্গে দেখা করে সে ঠিক করবে—যাবে কোথায়, থাকবে কি করে। পিত্রালয়ে যাবার তার কোন ইচ্ছে নেই। তার ভয়, পিত্রালয়ে গিয়ে সে শ্যামকিশোরের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। এখানে তাকে না পেয়ে সে নিশ্চিত তার পিত্রালয়ে যাবে এবং তাকে জোর করে ধরে আনবে। সব যন্ত্রণা, সমস্ত অপমান সে সহ্য করার জন্য প্রস্তুত, শুধু শ্যামকিশোরের মুখ দেখতে চায় না। প্রেম অপমানিত হয়ে দ্বেষে পরিবর্তিত হয়।

কিছুদূরেই চৌরাস্তা, কয়েকটা টাঙ্গাঅলা দাঁড়িয়ে আছে! দেবী একটা টাঙ্গা ভাড়া করে তাকে স্টেশনে যাবার জন্য বলে।

॥ ১০ ॥

রাতটা দেবী স্টেশনেই কাটায়। ভোরবেলায় একটা টাঙ্গা ভাড়া করে পরদার আড়ালে বসে চৌক-এ হাজির হয়। তখনও দোকান-পাট খোলেনি, কিন্তু জিজ্ঞেস করে রাজা মিঞার ঠিকানা খুঁজে পায়। ওর দোকানের সামনে একটা ছোকরা ঝাঁট দিচ্ছিল। দেবী ওকে ডেকে বলে—রাজা মিঞাকে গিয়ে বল শারদার আম্মা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, এক্ষুনি চলুন।

মিনিট দশেক পরে রাজা আর মুন্নু এসে হাজির হয়।

দেবী সজল চোখে বলে—তোমাদের জন্য আমায় বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। কাল রাতে আমার বাড়িতে যাওয়াটাই 'কাল' হয়েছে। যা ঘটেছে, পরে বলব। এখন আমায় একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দাও। এমন ঘর, উনি যেন আমার খোঁজ না পান। নইলে, আমায় উনি আর আস্ত রাখবেন না।

রাজা মুন্নুর দিকে চায়, যেন সে বলে—দেখেছো, চাল একেবারে ঠিক দেয়া হয়েছে। দেবীকে বলে—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এমন ঘরের ব্যবস্থা করে দেবো, উনি কেন, ওনার আব্বাও খোঁজ পাবেন না। আপনার কোন রকমের কষ্ট হবে না। আপনার জন্য ঘামের বদলে রক্ত বইয়ে দেবো। সত্যি কথা বলতে কি ভাবীজী, উনি আপনার যোগ্য নন।

মুন্নু—ঠিক কথাই বলেছেন ভাইসাব, আপনি রাণী হবার মত। আমি গিন্নী-মাকে বলেছিলাম, কর্তাবাবুর দালমণ্ডির বাতাস গায়ে লেগেছে। কিন্তু আপনি বিশ্বাসই করতেন না। কাল রাতেই আমি তাকে গোলাপজান-এর ঘর থেকে বেরোতে দেখেছি। নেশায় একেবারে চুর।

দেবী—মিথ্যে কথা। তার এ ধরনের অভ্যেস নেই। অবশ্য উনি কিছুটা রগচটা, রাগের মাথায় ভাল-মন্দ'র খেয়াল থাকে না ; তা বলে তার নজর খারাপ নয়।

মুন্নু—হুজুর যখন বিশ্বাস করছেন না, আমার কিছু করার নেই। বেশ, পরে আমি দেখিয়ে দেবো তখন তো বিশ্বাস করবেন ?

রাজা—অ্যাই, পরে দেখাবি। এখন এঁকে আমার বাড়ীতে পৌছে দে। ওপরে নিয়ে যাস। ততক্ষণে আমি বাড়ি দেখতে যাচ্ছি। আপনার পছন্দমত একটা ভালো ঘর আছে।

দেবী—তোমার বাড়িতে কি অন্যান্য মেয়েমানুষ আছে ?

রাজা—কেউ নেই ভাবীজী, শুধু একজন বুড়ি আছে। সে আপনার জন্য একটা ঝি ডেকে দেবে। আপনার কোন অসুবিধে হবে না ! আমি বাড়ি দেখতে যাচ্ছি।

দেবী—ওদিকটাও একবার ঘুরে যেও। দেখো, উনি ঘরে ফিরেছেন কিনা ?

রাজা—উনি আমার ওপর ক্ষেপে আছেন। হয়তো, নজরে পড়লে ওনার সঙ্গে আমার ঝগড়া বেঁধে যাবে ! যে পুরুষ আপনার মত সৌন্দর্য্যের দেবীকে কদর করে না, সে মানুষ নয়।

মুন্নু—ঠিক কথা বলেছো ভাইসাব। এমন ভালো ভদ্র মহিলাকে কোন মুখে শাসন করে ! এতদিন ধরে আমি হুজুরের গোলামি করে কাটিয়েছি, কই, একদিনও কোন কথা শোনান নি।

রাজা বাড়ি দেখতে যায়, এবং টাঙ্গা রাজার বাড়ির দিকে এগোয়।

দেবীর মনে সহসা একটা আশঙ্কা জেগে ওঠে—সত্যি সত্যি এরা দুজনে লম্পট নয় তো ? কিন্তু জানবে কি ভাবে ? এটা সত্য, দেবী তার স্বামীকে জীবনের জন্য পরিত্যাগ করেছে ; কিন্তু ইতিমধ্যে তার মনে পশ্চাতাপ জেগে উঠেছে ! একা-একা ঘরে সে থাকবে কি করে। বসে-বসে করবে কি ;—এসব ভেবে সে কুলিয়ে উঠতে পারে না। মনে-মনে বলে—বাড় ফিরে যাই না কেন ? ঈশ্বর করুন, উনি এখনও বাড়ি ফিরে আসেন নি। মুন্নুকে বলে—তুই এক ছুটে দেখে আয়, উনি বাড়ি ফিরেছেন কিনা ?

মুন্নু—আপনি গিয়ে বিশ্রাম করুন, আমি দেখে আসছি।

দেবী—না, আমি ভেতরে যাবো না।

মুন্নু—খোদার কসম খেয়ে বলছি, বাড়ি ফাঁকা আছে, আপনি আমাদের মিথ্যে সন্দেহ করছেন। আমরা সেই লোক, আপনার হুকুম পেলে আগুনে ঝাঁপ দিতে পারি।

দেবী টাঙ্গা থেকে নেমে ভেতরে চলে যায়। পাখী একবার ধরা পড়লে পাখা ঝাপটায়; কিন্তু পায়ে জাল জড়িয়ে থাকার ফলে উড়তে পারে না এবং শিকারী ওকে থলের ভেতর পুরে ফেলে। হায়, সে অভাগিনী কি আর কখনও আকাশে উড়তে পারবে? আর কখনও কি শাখা-প্রশাখায় কূজন করার ভাগ্য হবে?

॥ ১১ ॥

শ্যামকিশোর সকালে বাড়ি ফিরে আসে, ওর মন এখন শান্ত হয়ে গেছে। তার আশঙ্কা হয়, দেবী বুঝি বাড়িতে নেই। দরজার দু-পাট খোলা দেখতে পেয়েই তার হৃদপিণ্ড হিম হয়ে পড়ে। এত সকালে দরজা খোলা থাকা অমঙ্গল-সূচক। মুহূর্ত কয়েক দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে ভেতরের শব্দ শোনে। কোন শব্দ শোনা যায় না। উঠোনে যায়. সেখানেও নৈঃশব্দ। ওপরে চারদিকে নিস্তব্ধতা। ঘর খাঁ-খাঁ করছে। শ্যামকিশোর এবার সতর্ক হয়ে দেখতে শুরু করে। বাক্সে টাকা-পয়সা পায়েব। গহনার বাক্স শূন্য। আর কি ভুল হতে পারে? গঙ্গা-স্নানের জন্য কেউ গেলে, বাড়ির টাকা-পয়সা নিয়ে যায় না। সে চলে গেছে। বিন্দুমাত্র আর সন্দেহ নেই। এও তার জানা, সে গেছে কোথায়। এখন যদি সে ছুটে যায়, তাহলে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে। কিন্তু লোকেরা কি বলবে?

শ্যামকিশোর খাটিয়ার ওপর বসে এখন ঠাণ্ডামাথায় ঘটনা পর্যালোচনা করতে শুরু করে। কোন সন্দেহ নেই, রাজা আর ওর চামচে মুন্নু, ওকে প্ররোচিত করেছে। সে-ই বা করবে কি? কর্তব্য বলতে গেলে—পুরনো বাসা ছেড়ে দিয়েছে, দেবীকে বার বার বুঝিয়েছে। এ ছাড়া সে আর কি করতে পারে? ওকে প্রহার করাটা কি অনুচিত ছিল? যদি তর্কের খাতিরে অনুচিত ধরে নিই, তাহলেও কি দেবীর এভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত ছিল? অন্য কোন মহিলা, যার হৃদয়ে প্রথম থেকে বিষ ভরে না দিয়ে থাকলে, শুধু প্রস্তুত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে পারে? দেবীর হৃদয় নিঃসন্দেহে কলুষিত হয়ে গেছিল।

শ্যামকিশোর আবার ভাবে—একটু পরেই ঝি আসবে। দেবীকে ঘরে না দেখে সে নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে, তখন কি জবাব দেবো? মুহূর্তে গোটা পাড়ায় এই খবর ছড়িয়ে পড়বে। হায় ঈশ্বর! এবার কি করি? শ্যামকিশোরের মনে এসময় সামান্যতম পশ্চাত্তাপ বা দয়া ছিল না। যদি এখন কোন রকমে দেবীর দেখা পায়, তাহলে ওকে খুন করতে সামান্য পেছপা হবে না। ওর এভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া—হোক না তা আবেগের কারণে—তা সত্ত্বেও তার দৃষ্টিতে ক্ষমাহীন। ক্রোধ অনেক সময় বিরক্তির রূপ নেয়। অচিরে শ্যামকিশোরের মনে

সংসারের প্রতি তীব্র ঘৃণা জমে ওঠে। নিজের স্ত্রী যখন এভাবে দাগা দিয়ে যায়, অপরের কাছ থেকে কি-ই বা আশা করা চলে? যে স্ত্রীর জন্য আমরা বেঁচে থাকি, মরে যাই, যাকে সুখী করার জন্য নিজের প্রাণপাত করি, যে-ই যখন আপন হয় না, তখন আর কেই বা আপন হতে পারে? এই স্ত্রীকে সুখী করার জন্য সে কি-না করেছে? বাড়ির লোকেদের সঙ্গে বিবাদ করেছে, ভাইদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়েছে, এমনকি তারা এখন তার মুখ দর্শনও করতে চায় না। তার এমন কোন ইচ্ছা ছিল না, যা সে পূরণ করে নি। সামান্য মাথায় যন্ত্রণা হলে, তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ত। রাতের পর রাত তার সেবা-শুশ্রূষায় বসে কাটাতো। সেই স্ত্রী আজ তাকে দাগা দিল! শুধু একটা গুণ্ডার প্ররোচনায় তার মুখে চুণকালি লেপে দিয়েছে। গুণ্ডার মাথায় দোষ চাপানো এক ধরণের নিজের মনকে সান্ত্বনা দেয়া ছাড়া আর কি? হৃদয় কুটিল না হলে, কেউ কি তাকে নষ্ট করতে পারে। এই স্ত্রী যখন বিশ্বাসঘাতকতা করল, তাহলে বোঝা উচিত সংসারে প্রেম এবং বিশ্বাসের কোন অস্তিত্বই নেই। এ শুধু ভাবুক লোকেদের কল্পনা মাত্র। এমন সংসারে থেকে দুঃখ ও নিরাশা ছাড়া আর কি পাবার থাকতে পারে? হায়, দুষ্ট রমনী। যা, আজ থেকে তুই স্বাধীন, যা ইচ্ছে কর, এখন আর কেউ তোর হাত ধরার নেই। যাকে তুই 'প্রিয়তম' উচ্চারণে ক্লান্ত হতিস না, তার সঙ্গে তুই এমন কুটিল ব্যবহার করলি। চাইলে, তোকে কোর্টে টানা-হ্যাচড়া করে এই পাপের সাজা দিতে পারি, কিন্তু তাতে লাভ! এর ফল তোকে ঈশ্বরই দেবে।

শ্যামকিশোর চুপচাপ নীচে নামে, কাউকে কিছু বলে না, দরজা খোলা রেখে বেরিয়ে সোজা গঙ্গার ঘাটের দিকে এগিয়ে যায়।

নির্ভরতা

সারা গাঁয়ে মথুরার মত স্বাস্থ্যবান জোয়ান ছেলে আর নেই। বয়স তার প্রায় কুড়ি। গোঁফের রেখা সবে ভিজে উঠেছে। গরু চড়ায়, দুধ খায়, ব্যায়াম করে, কুস্তি লড়ে—এ ছাড়া সারাটা দিন সে বাঁশি বাজিয়ে হাটে-বাটে ঘুরে বেড়ায়। বিয়ে হয়েছে, তবে এখনও কোন ছেলে-পুলে হয়নি। বাড়ীতে কয়েকটা লাঙলের চাষ হয়। ছোট-বড় কয়েকটা ভাই আছে। তারা সকলে মিলে-মিশে চাষ-বাস করে। মথুরাকে নিয়ে বাড়ীর লোকেদের মনে প্রচ্ছন্ন একটা গর্ব আছে, তাই তার ভাগে সর্বোৎকৃষ্ট ভোজন বাঁধা এবং সবচেয়ে কম কাজ করতে হয়। তার জাঙ্গিয়া-লেংটি, লাঠি বা মুগুরের জন্য যখনই টাকা-পয়সার দরকার হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাকে দেয়া হয়। বাড়ীর লোকেদের ইচ্ছে, মথুরা যেন নামকরা পালোয়ান হয়, আখড়ার অন্যান্য সকলকে তুলে আছাড় দিতে পারে। এই আদর-আহ্লাদে মথুরা কিছুটা উদ্ধত হয়ে ওঠে। দেখা গেল, তাদের গরু হয়তো অন্য কারো ক্ষেত ঢুকেছে, অথচ সে আখড়ায় ডন-বৈঠক নিয়ে ব্যস্ত। কেউ বলতে গেলে, অমনি তার মুখভঙ্গি পাল্টে যেত। রেগে বলে উঠতো, তোমাদের যা ইচ্ছে করো গে, আমি আখড়া ছেড়ে এখন গরু তাড়াতে যেতে পারবো না। তার ঐ ভাব-ভঙ্গি দেখে কেউ আর তাকে চটাতে সাহস করে না। ফলে, লোকেরা তাদের রাগ মনেই চেপে রাখে।

গরমকাল। পুকুর-ডোবা সব শুকিয়ে গেছে। সারাদিন প্রচণ্ড জোরে লু' বইতে থাকে। এরি মাঝে, একটা ষাঁড় কোত্থেকে এসে গাঁয়ে ঢুকেছে, ঢুকে গরুর দলে ভিড়ে গেছে। সারাটা দিন গরুগুলোর সঙ্গে কাটায়, কিন্তু রাত হলেই পাড়ায় ঢুকে পড়ে। তারপর, খুঁটোয় বাঁধা বলদগুলোকে শিং উঁচিয়ে মারতে থাকে। মাঝে-মাঝে কারো মাটির দেয়াল শিং উঁচিয়ে গর্ত করে ফেলে, কখনও বা ছাই-পাঁজার গুঁড়ো শিং দিয়ে উড়িয়ে দেয়। অনেকে শাক-সব্জীর চাষ করেছিল, সেই সব চাষীদের সারাটা দিন জল-সেচ করতে-করতে কাহিল অবস্থা হতো। আর ঐ ষাঁড় কিনা রাতে সেই সবুজ ভরন্ত ক্ষেতে হাজির হয়ে গোটা মাঠ ক্ষেত একেবারে তছনছ করে ফেলত। গাঁয়ের লোকেরা লাঠি নিয়ে ওর পেছনে তাড়া করত, মারত, গাঁয়ের বাইরে খেদিয়ে দিত ; কিন্তু, কিছুক্ষণ পরে দেখা যেত আবার ঐ গরুর দলে ভিড়ে আছে। কি করে যে এই সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়—কারোর বুদ্ধিতে কুলোয় না। মথুরার বাড়ি ঠিক গাঁয়ের মাঝখানে। ফলে, ষাঁড়টা ওর বলদের কোন ক্ষতি করতে পারত না। গাঁয়ে এমন উপদ্রব, অথচ মথুরার বিন্দুমাত্র মাথাব্যাথা নেই।

অবশেষে ধৈর্যের শেষ বন্ধন যখন ছিঁড়ে গেল, একদিন গাঁয়ের সব লোকেরা

মথুরাকে ঘিরে ধরে। তারা বলে—তুমি যদি বলো তাহলেই আমরা গাঁয়ে বাস করতে পারি, আর যদি অনিচ্ছে থাকে আমরা তাহলে বাস তুলে চলে যাই। চাষ-আবাদ-ই যদি না থাকে, মিছিমিছি থেকে কি করবো? তোমার গরুর জন্যই আমাদের এত সর্বনাশ, অথচ তুমি নিজের রঙ-তামাশা নিয়ে মশগুল। ঈশ্বর তোমায় যদি শক্তি দিয়ে থাকেন, তাহলে অন্যান্যদের রক্ষা করা উচিত। সকলকে নাজেহাল করাটা তো আর কোন কর্ম নয়। তোমার গরুগুলোর জন্যই ষাঁড়টা এখানে পড়ে আছে। ঐ ষাঁড়টাকে তাড়ানো তোমার কাজ; অথচ তুমি দিব্যি নাকে তেল দিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছ—যেন এ ব্যাপারে তোমার কোন দায়িত্ব নেই।

তাদের অবস্থা শুনে মথুরার মনে দয়া জাগে। বলশালী মানুষ প্রায়শঃ দয়ালু হয়ে থাকে। সে তাদের বলে—আচ্ছা যাও, আজ আমি ষাঁড় তাড়িয়ে দেবো।

একজন বলে ওঠে—দূরে তাড়িয়ে দিও, নইলে আবার ফিরে আসবে।

কাঁধের ওপর লাঠি রেখে মথুরা বলে—হুঁ, আর ফিরে আসতে হবে না।

॥ ২ ॥

ঝাঁঝালো দুপুর। মথুরা ষাঁড় তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। দুজনেই ঘামে ঘামে একেবারে মাখামাখি। ষাঁড় বার বার গাঁয়ের দিকে ফিরে যাবার চেষ্টা করে, মথুরা ওর ইচ্ছেয় বাধা দিয়ে দূর থেকেই ওর রাস্তা আগলে থাকে। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ষাঁড় মাঝে-মাঝে ঘুরে মথুরার ওপর আক্রমণ করতে যায়, মথুরা তখন তার সুমুখ থেকে সরে, পাশ দিয়ে বেদম লাঠি মারতে শুরু করে। ফলে, ষাঁড়কে লেজ উচিয়ে পালাতে হয়। কখনও দুজনেই অড়হরের ক্ষেতে দৌড়য়, কখনও বা ঝোপ-ঝাড়ে। অড়হরের খুঁটো লেগে মথুরার পা রক্তারক্তি হয়ে পড়ে, ঝোপ-ঝাড়ে কাপড় ছিঁড়ে যায়; কিন্তু ষাঁড়ের অনুসরণ করা ছাড়া এখন তার অন্য কোন লক্ষ্য নেই। গাঁ পেরিয়ে গাঁ আসে, আবার চলে যায়। মথুরা ঠিক করে ওকে নদীর ওপারে না পাঠিয়ে দম নেবে না। এদিকে গলা শুকিয়ে কাঠ, চোখ লাল হয়ে উঠেছে, রোমকূপ বেয়ে আগুনের হল্‌কা বেরোতে থাকে, নিঃশ্বাস যেন ফেটে পড়তে চায়। তবুও সে এক-মুহূর্তের জন্য জিরোয় না। দু-আড়াই ঘণ্টা দৌড় ঝাঁপ করার পর নদী নজরে পড়ে। এখানেই হারজিতের ফলাফল হওয়ার কথা, এখানেই দুই খেলোয়ারের নিজের নিজের মার-প্যাচের কসরৎ দেখানোর কথা। ষাঁড় ভাবে, যদি একবার নদীতে আমি নামি, তাহলে আমায় মেরেই ফেলবে; সুতরাং একবার জান-লড়িয়ে চেষ্টা করা উচিত। মথুরা ভাবে, যদি ও ফিরে আসে তাহলে এত পরিশ্রম-খাটুনি সব ব্যর্থ হবে। গাঁয়ের লোকেরা আমায় উপহাস করবে। দুজনেই নিজের-নিজের লড়াইয়ে প্রস্তুত। ষাঁড় বহুবার চেষ্টা করে, তেড়ে এগিয়ে যায়,

আবার সেখান থেকে পেছনে ফেরে। কিন্তু মথুরা ওকে পেছন ফেরার সুযোগটুকুও দেয় না। তার প্রাণ এই সময় ছুঁচের ডগায়, সামান্যতম ভুলচুক হলেই প্রাণ যাবার সম্ভাবনা ; যদি একটু পা হড়কায়, আর তাহলে ওঠার অবসর হবে না। শেষাবধি, মনুষ্যই পশুর ওপর জয় করে। ষাঁড়ের নদীতে নেমে পড়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। মথুরাও ওর পেছন-পেছন নদীতে নামে, তারপর লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার করতে থাকে, ফলে তার লাঠি ভেঙে যায়।

॥ ৩ ॥

প্রচণ্ড তেষ্টা পায় মথুরার। সে নদীতে মুখ ডুবিয়ে এমনভাবে হাঁক-হাঁক করে জল খেতে থাকে, যেন নদীর সব জল সে শুষে ফেলবে। তার জীবনে জল এত ভাল লাগেনি, এত জলও সে কখনও খায়নি জীবনে। পাঁচসের, নাকি দশ সের জল সে খেয়ে ফেলেছে, কিন্তু গরম জল, তেষ্টা মেটে না কিছুতেই। একটু পরে আবার জলে মুখ দেয়, চোঁ-চোঁ করে এত জল টানে যে বাতাস ঢোকার মত পেটে জায়গা থাকে না। তারপর, ভেজা ধুতি কাঁধে ফেলে বাড়ীর পথে রওনা হয়।

সবে পাঁচ-দশ পা হেঁটেছে, অমনি পেটের ভেতর হাল্কা চিনচিনে যন্ত্রণা শুরু হয়। ভাবে, দৌড়ে এসে জল খাওয়ার ফলেই যন্ত্রণা শুরু হয়েছে, একটু পরেই হয়তো সেরে যাবে। কিন্তু যন্ত্রণা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে, মথুরার পক্ষে এগিয়ে যাওয়া বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। সে একটা গাছের তলায় গিয়ে বসে, যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে মাটির ওপর গড়াগড়ি খেতে থাকে। কখনও পেট টিপে ধরে, কখনও বা উঠে দাঁড়ায়, কখনও বসে পড়ে, কিন্তু যন্ত্রণা কমে না। উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। শেষে সে কাতড়াতে শুরু করে, কাঁদতে থাকে ; কিন্তু সেই নির্জন জায়গায় কে বা বসে আছে যে ওর খবরাখবর নেবে। অনেক দূর ওব্দি কোন গাঁ নেই, কোন জন-মনিষ্যি নেই, কোন মনুষ্য সন্তানও নেই, বেচারা দুপুরের নিস্তব্ধতায় ছটফট করতে করতে মারা যায়। আমরা কঠিন, কঠিনতর আঘাত সহ্য করতে পারি, কিন্তু সামান্যতম ব্যতিক্রম বুঝি সহ্য করা যায় না। দেবতার মত সেই যুবক—যে ক্রোশাধিক রাস্তা ষাঁড় তাড়িয়ে এসেছিল, অথচ পিত্তের বিরোধ একেবারে সহ্য করতে পারল না। কে জানতো, এই দৌড় ছিল তার কাছে মৃত্যুর দৌড় ! কে জানতো, মৃত্যুই ষাঁড়ের রূপ ধরে তাকে এমন ভাবে নাচিয়ে তুলেছিল। কে জানতো, সেই জল—যার অভাবে তার প্রাণ ওষ্ঠে এসে থেমেছিল, তার কাছে বিষ হয়ে দাঁড়াবে।

সন্ধের সময় তার বাড়ীর লোকেরা তার খোঁজে বেরোয়। দেখে, সে তখন অনন্ত বিশ্রামে মগ্ন।

এক মাস অতিক্রম হয়। গাঁয়ের লোকেরা এবার কাজকর্মে মন দেয়। বাড়ীর লোকেরা কেঁদে-কেটে শান্ত হয়। কিন্তু অভাগিনী বিধবার চোখের জল মুছবে কি ভাবে। সব সময় কাঁদতে থাকে সে। চোখের পাতা বন্ধ থাকলেও হৃদয় প্রত্যহ কাঁদতে থাকে। এ ঘরে এখন তার কাটবে কি করে? কিসের আধারে বেঁচে থাকবে? একমাত্র মহাত্মারাই নিজের জন্য বেঁচে থাকতে পারে, নয়তো লম্পটেরা পারে। অনূপা কি এই প্রণালী জানে? তার জীবনের জন্য একটি আধারের প্রয়োজন, যাকে সে নিজের সর্বস্ব মনে করবে, যার জন্য সে বাঁচবে, যার জন্য সে গর্ববোধ করবে। বাড়ীর সায় ছিল না, সে অন্য সংসার করে। এতে দুর্নাম হবে। তাছাড়া এমন শান্ত, গৃহকাজে এমন পারদর্শী, দেয়া-থোয়ার ব্যাপারে এমন চতুর, এবং রূপ-সৌন্দর্যে এমন প্রশংসনীয় স্ত্রী অন্য কারো সংসারে যায়—এ তাদের কাছে অসহ্য। ওদিকে অনূপার পিত্রালয় থেকে এক জায়গায় বিয়ের কথাবার্তা চালায়। সব কিছু ঠিক হয়ে যেতে, একদিন অনূপার ভাই তাকে 'বিদায়' গ্রহণের জন্য নিয়ে যেতে এসে হাজির হয়।

এবার ঘরে হৈচৈ বেঁধে যায়। এ পক্ষ থেকে বলা হয়, আমরা 'বিদায়' করবো না। ভাই বলে, 'বিদায়' ছাড়া আমি রাজী হবো না। গাঁয়ের লোকেরা এসে জড়ো হয়, পঞ্চায়েত বসে। স্থির হয়, অনূপাকেই ভার দেয়া হোক। মন চাইলে সে থাকবে, না-চাইলে চলে যাবে। এ গাঁয়ের লোকেদের বিশ্বাস, অনূপা এত তাড়াতাড়ি অন্য ঘর করতে রাজী হবে না, দু-চারবার সে এমন কথা বলেও ছিল। কিন্তু, এখন জিজ্ঞেস করাতে জানালো—সে যাবার জন্য রাজী। অবশেষে তার 'বিদায়'-র গোছগাছ হতে থাকে। ডুলি আসে। গাঁয়ের সমস্ত বৌ-ঝিরা ওকে দেখতে আসে। অনূপা উঠে শাশুড়ির পায়ে পড়ে, তারপর হাত জোড় করে বলে—মা, আমার দোষগুণ ক্ষমা করে দিও। ইচ্ছে ছিল, এ সংসারেই থাকি, কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায় নেই। বলতে বলতে তার গলা বুজে আসে।

শাশুড়ি করুণায় বিহ্বল হয়ে ওঠে। বলে—বৌমা, যেখানেই যাও, আশীর্বাদ করি সুখে থেকো। আমাদের ভাগ্য খারাপ, নইলে কেনই বা তোমায় এ সংসার থেকে যেতে হচ্ছে। ঈশ্বরের দেয়া সব কিছুই আছে, কিন্তু যা দেয় নি তার ওপর আমার কিছু করার নেই! আজ যদি তোমার দেওর জোয়ান হতো, তাহলে এই অঘটন বদলে যেত। তোমার যদি ইচ্ছে হয়, তাহলে একেই আপন মনে করো, লালন-পালন করো, বড় হয়ে উঠলে তোমার সঙ্গে বিয়ে দেবো।

এই বলে সে কনিষ্ঠ ছেলে বাসুদেবকে জিজ্ঞেস করে—কিরে! বৌদির সঙ্গে বিয়ে বসবি নাকি?

বাসুদেবের বয়স পাঁচ বছরের বেশী নয়। এ বছর ওর বিয়ে হবার কথা। পাকা কথা হয়ে গেছে। সে বলে ওঠে—তাহলে তুমি অন্যের ঘরে যাবে না তো?

মা—নারে, তোর সঙ্গে যদি বিয়ে হয়, তাহলে যাবে কেন?

বাসুদেব—তাহলে আমি বিয়ে করবো।

মা—বেশ তো। এবার ওকে জিজ্ঞেস কর, তোর সঙ্গে বিয়ে করবে কি না।

বাসুদেব অনুপার কোলে গিয়ে বসে, তারপর লজ্জিত ভাবে বলে—আমায় বিয়ে করবে?

বলেই সে হাসতে থাকে; কিন্তু অনুপার চোখ জোড়া ছলছল করে ওঠে, বাসুদেবকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে বলে—মা, মন থেকে বলছো ত?

শাশুড়ি—ঈশ্বর জানেন!

অনুপা—তাহলে আজ থেকে ও আমার হলো?

শাশুড়ি—হ্যাঁ, গোটা গাঁ সাক্ষী।

অনুপা—বেশ! তাহলে দাদাকে বলে পাঠাও, আমি তার সঙ্গে যাবো না। সে বাড়ী ফিরে যাক।

অনুপার জীবনের জন্য একটি আধারের প্রয়োজন। আধার সে পেয়ে গেছে। সেবা মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি, সেবাই তার জীবনের আধার।

অনুপা এরপর বাসুদেবকে লালন-পালন করতে শুরু করে। ওকে তেল মাখিয়ে দেয়, শরীরে মালিশ করে: দুধ-রুটি ভাল করে কচলে মেখে খাওয়ায়। পুকুরে স্নান করতে গেলে ওকেও স্নান করিয়ে দেয়। মাঠে যাবার সময়, ওকেও সঙ্গে নিয়ে যায়। দিন কয়েকের মধ্যে সে ওর সঙ্গে এমন ভাবে মিলেমিশে যায় যে এক মুহূর্তের তরেও সে একে ছাড়ে না। মাকে, বলতে গেলে ভুলেই গেছে। খেতে ইচ্ছে হলে অনুপার কাছ থেকে চায়, খেলাধুলোয় মা'র খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে অনুপার কাছে এসে হাজির হয়। অনুপাই ওকে ঘুম পাড়ায়, অনুপাই ওকে জাগায়। জ্বর-টর হলে অনুপাই ওকে কোলে করে বদলু কবিরাজের বাড়িতে নিয়ে যায়, সেই ওষুধ খাওয়ায়।

গাঁয়ের স্ত্রী-পুরুষ সকলে তার এই প্রেম-তপস্যা দেখে বিস্মিত হয়। প্রথম দিকে তার ব্যাপারে কারো মনে রেখাপাত করেনি। ভেবেছিল, বছর দু-বছরে সে বিরক্ত হয়ে উঠবে, তারপর নিজের পথ নিজেই বুঝে নেবে। এই দুধের বাচ্চার নামে কতদিন আর প্রতীক্ষা করবে। কিন্তু, তাদের যাবতীয় আশঙ্কা ভুল প্রমাণিত হয়।

অনুপাকে কেউ তার ব্রত থেকে বিচলিত হতে দেখেনি। যে হৃদয়ে সেবার ব্রত বইতে থাকে—স্বাধীন সেবার—তাতে বাসনার স্থান কোথায়? নির্মল, আশাহীন, আধারহীন প্রাণীর ওপরেই বাসনার প্রকোপ ভর করে। চোরের কাজ অন্ধকারেই চলে, আলোয় নয়।

বাসুদেবেরও ব্যায়ামের শখ আছে। তার চেহারা-আকৃতি কিছুটা মথুরার সঙ্গে মিল। চালচলনও সেরকম। সে আবার 'আখড়া' চালু করে এবং তার বাঁশির সুর আবার ক্ষেতে-মাঠে গুঞ্জরিত হতে থাকে।

এভাবে তেরোটা বছর পার। বাসুদেব ও অনুপার বিয়ের প্রস্তুতি হতে থাকে।

॥ ৫ ॥

অনুপা এখন আর সেই অনুপা নেই, চোদ্দ বছর আগে বাসুদেবকে স্বামীর মত মেনে নিয়েছিল, এখন সে জায়গায় মাতৃভাব জুড়ে বসেছে। বিয়ের দিন যতই কাছে এগোতে থাকে, ততই তার মন নিঃশ্বাসে বন্ধ হয়ে আসতে থাকে। তার জীবনে এই বিশাল পরিবর্তনের কল্পনায় বুক ভয়ে কেঁপে ওঠে। সন্তানের মত যাকে লালন-পালন করেছে, তাকে স্বামী-রূপে বরণ করতে লজ্জায় মুখ লাল হয়ে ওঠে।

দেউড়িতে নাকাড়া বেজে ওঠে। আত্মীয়-স্বজনরা ক্রমে ক্রমে এসে জমায়েত হয়েছে। বাড়ির ভেতরে গান শুরু হয়েছে। আজ বিয়ের দিন।

সহসা অনুপা শাশুড়ির কাছে গিয়ে বলে—মা, আমি যে লজ্জায় মরে যাচ্ছি।

শাশুড়ি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলে—কেন বৌমা, কি হয়েছে?

অনুপা—মা, আমি বিয়ে করবো না।

শাশুড়ি—এ কি কথা বলছো বৌমা? সব কিছু তৈরী। লোকেরা শুনলে কি বলবে?

অনুপা—যা ইচ্ছে বলুক গে। যার নামে আমি এই চোদ্দ বছর কাটিয়েছি, না হয় আরও কয়েকটা বছর কাটিয়ে দেবো। ভেবেছিলাম, পুরুষ ছাড়া মেয়েদের বুঝি দিন কাটানো সম্ভব নয়। ঈশ্বর আমার ইজ্জৎ-লজ্জা নিয়ে দিন কাটিয়ে দিয়েছে। ভরা বয়স যখন পেরিয়ে এসেছি, এখন আর কিসের ভাবনা। মা, আপনি অন্য কোন মেয়ের খোঁজ করে বাসুদেবের বিয়ে দিন। এতদিন ওকে যে ভাবে লালন-পালন করেছি, সেইভাবে ওর ছেলেপিলেদেরও লালন-পালন করবো।